টপ্পা ঠুংরি

TAPPA THUNGRI
By. Abadhut

Rupees Seven only.

টপ্পা ঠুংরি

অবধূত
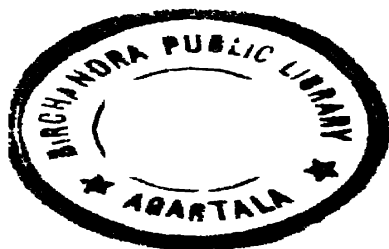
ক্লাসিক প্রেস
৩।১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

: প্রথম প্রকাশ :
সেপ্টেম্বর, ১৯৬১

: প্রকাশক :
শ্রীঅমলচন্দ্র সেনগুপ্ত
ক্লাসিক প্রেস
৩।১এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

: প্রচ্ছদ পট :
মনি মিত্র

• মুদ্রাকর •
শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

সাত টাকা

আমার একমাত্র ভাই

শ্রীমান মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু—

বন্ধুবর শ্রীশান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রচুর পরিশ্রম করলেন এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করার জন্যে। তাঁর এই অযাচিত সহৃদয়তার জন্য আমি চিরঋণী রইলাম।

—অবধূত

এই লেখকের অন্যান্য বই—

মরুতীর্থ হিংলাজ

উদ্ধারণপুরের ঘাট

কলিতীর্থ কালীঘাট

অনাহূত আহুতি

নীলকণ্ঠ হিমালয়

হিংলাজের পরে

বশীকরণ

ছুরি বৌদি

ইত্যাদি-

গল্প লিখতে হোলে নাকি ছোটবেলা থেকে সাধনা করা দরকার। ছুম করে হঠাৎ কেউ লেখক হোয়ে উঠতে পারে না। গল্প উপন্যাস লিখে যাঁরা নাম করেছেন তাঁরা নাকি হাতেখড়ির দিন থেকেই জানতেন যে একদা তাঁরা সাহিত্যিক হবেন। জানতেন বলে আদা ছোলা খেয়ে ঐ হাতেখড়ির দিন থেকেই লেখক হবার জন্যে ডন বৈঠক শুরু করে দিয়েছিলেন।

কবে কোথায় কত বয়েসে গল্প লেখার সাধনা শুরু করেছিলাম, এ প্রশ্নটি হামেশা শুনে থাকি। উঠতি বয়েসের ছেলেমেয়েরা বিশ্বাস করতে চায় না যে কোনও কালে আমি স্বপ্নও দেখিনি গল্প লেখার। ঝাড়া ত্রিশটা বছর বেওয়ারিস জীবন-যাপন করেছি, ঝুলি কাঁধে নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি। কাগজ কলম পুঁথি-পত্রের সঙ্গে ভাশুর ভাদ্রবউ সম্পর্কটা আমার সেই হাতে-খড়ির দিন থেকেই বজায় আছে। পথে পথে ঘুরে যার দিন গুজরান হয়, সে কোথায় বসে গল্প লেখার তালিম নেবে?

তবে এ কথাটা যদি না মানি যে এন্তার জলজ্যান্ত গল্প দিনের পর দিন চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি, তাহলে নিশ্চয়ই আমার সেই ত্রিশ বছরের মুসাফিরির সঙ্গে নিমকহারামি করা হবে। তেমনি নিমকহারামি করা হবে আমার পরমবন্ধু সহজিয়া রাইচাঁদ দাসের সঙ্গে, যে আমাকে চোখ মেলে জলজ্যান্ত গল্প দেখতে শিখিয়েছিল। রাইচাঁদ বলত—দেখ দেখ, ভবের হাটখানা চোখ মেলে দেখে নে। হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি নায়ক, নায়িকা; দিনের পর দিন অগুনতি গল্প ঘটে যাচ্ছে নাকের ডগায়। কি রগড়! এখানে আজ যে গল্পটি ঘটল সেটিকে মনে গেঁথে নিয়ে এগিয়ে চল। কাল

যেখানে পৌঁছব সেখানে আরও মজাদার আর একটি গল্প ঘটবার জন্যে মুখিয়ে বসে আছে। কালকের পর পরশু যেমন আসবেই তেমনি পরশু দিনের গল্প পরশু দিন ঘটবেই। যেখানে ঘটবে, ঠিক সময় সেখানে গিয়ে হাজির হওয়া চাই। আজ কাল পরশু এক একজন রাহী, আসছে আর চলে যাচ্ছে। আজ কাল পরশুদের সঙ্গে পা ফেলে চলতে থাক, জলজ্যান্ত গল্প দেখতে দেখতে মনটা উদাস উদাস হয়ে যাবে।

উদাস উদাস মন নিয়ে বন্ধুবর রাইচাঁদের কাঁধে হাত দিয়ে টহল দিতে দিতে গল্প দেখতে শিখি আমি, অকপটে এ কথাটা মানতেই হবে। দীনদুনিয়ার মালিক ছিল রাইচাঁদ। অঙ্গে চার হাত লম্বা আর দেড় হাত চওড়া দু টুকরো টেন ছাড়া আর কিছুই বহে বেড়াত না। আকাশ পানে আঙ্গুল উঁচিয়ে হাক ছাড়ত—রাধে রাধে ব্রজসুন্দরী। হাঁক ছেড়েই গান ধরত—শুধু মুখের কথায় হয় না, ব্রজগোপীর প্রেম না হোলে সে ধন মেলে না। সে ধন কি তা বুঝিয়ে দিত নিজের বুকে চাপড় মেরে—ঐ যে আকাশ-খানা, ওর মালিক কে জান? আমি আমি, এই আমি। ঐ আকাশের নিচে যা কিছু দেখছ সব আমার সম্পত্তি, আলো হাওয়া জল মাটি বিলকুল আমার। বসুন্ধরার বুকের ওপর দড়ি ফেলে বসুন্ধরাকে যারা মেপে নিজের জন্যে এক টুকরো আলাদা করে নিয়ে বাকীটার ওপর থেকে দাবী তুলে নেয়, তারা গাড়ল। আমি বাবা গাড়ল নই, নিজের হক ছাড়ছি না। ষোল আনা সবটাই আমার, এর আবার ভাগাভাগি মাপামাপি কি?

দীনদুনিয়ার মালিক রাইচাঁদ হরদম টহল দিয়ে ফিরত তার দুনিয়া জোড়া জমিদারিতে। এক জায়গায় বসে থাকলে চলবে কেমন করে, জমিদারি যে পঞ্চভূতে লুটে খাবে।

নিকেতন যার নেই সে অনিকেত। অনিকেত হওয়ার মহিমা গীতায় আছে। ইংরেজীতে একটি বচন আছে যার বাঙলা হোল

গড়ানে পাথরের গায়ে শ্যাওলা ধরে না। চলতা পানি রমতা ফকির। জল যেমন বহে যায় ফকিরও তেমনি ঘুরে বেড়ায়। এক জায়গায় গেড়ে বসে থাকলে মনের গায়ে শ্যাওলা ধরে যাবে। ঘুরে বেড়াও গায়ে ফুঁ লাগিয়ে, ঝুট-ঝামেলায় মাথা গলিও না। যার প্রতিবেশী নেই সে সন্ন্যাসী। পরশুরামের বাবার আশ্রমের পাশে এক প্রতিবেশী গজিয়ে উঠল। প্রতিবেশীর রাজৈশ্বর্য দেখে পরশুরামের জননী হুঁশ হারিয়ে ফেললেন। তাই পিতার আদেশে পরশুরামকে মাতৃহত্যা করতে হোল। প্রতিবেশী থাকা যে কতখানি বিড়ম্বনা তার প্রমাণ বেদ-পুরাণ কোরান ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থে ভাল করে দেওয়া আছে। ঐ বিড়ম্বনার হাত থেকে রেহাই পেতে চাও তো রাহী হও। রাহী যদি হোতে পার, যদি থেমে না যাও, বসে না পড়, তাহলে নিত্যি নতুন জলজ্যান্ত গল্প চোখের ওপর ঘটতে দেখবে। নয়ত সাদা কাগজের গায়ে কালো কালো মরা অক্ষর সাজানো সাত বাসটে মরা গল্প পড়ে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হবে।

আজ আমি বসে পড়েছি। বসে পড়ার দারুণ সত্যিকারের জ্যান্ত গল্প পড়ার পাঠ একদম চুকে গেছে। আজ কাল পরশুরা আসছে আর চলে যাচ্ছে। আজ কাল পরশুদের সাক্ষী রেখে কত জায়গায় কত গল্প ঘটে যাচ্ছে, আমি তাদের নাগাল পাচ্ছি না। এক জায়গায় আটকে গিয়ে মনে মনে টহল দিতে দিতে মনের মানুষ খুঁজে মরছি। সেই মনগড়া মনের মানুষদের মনরক্ষা করার গরজে খুব সাবধানে ঢেকেঢুকে সাজিয়ে গুছিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করছি। তারপর সেই মাল উগরে দিচ্ছি সাদা কাগজের ওপর। সে চিজ এমনই সরেস যে নিজেই চাখতে পারি না, ঠেলে বমি উঠে আসে। মড়া যে, সাত বাসটে মড়া, পচা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। মড়া ঘাঁটতে ঘাঁটতে মনটাই মরে গেছে। মরা মনকে তোয়াজ করার জন্যে সংস্কৃত শোক শোনাই।

তদামুক্তি র্যদা চিত্তং ন বাঞ্ছতি ন শোচতি।
ন মুঞ্চতি ন গৃহ্ণাতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি॥

চিত্ত অর্থাৎ মন আর বুদ্ধি যখন বাসনা করে না, শোক করে না, ত্যাগ করে না, গ্রহণ করে না, পুলকিত হয় না, কুপিতও হয় না তখন সেই মন বুদ্ধির মালিক মুক্ত পুরুষ।

একদম মিলে যাচ্ছে।

আমার-মন বুদ্ধি থেকে যারা এখন জন্মাচ্ছে তাদের কাছ থেকে আমি কিছুই চাই না, তাদের জন্যে আমার মন বুদ্ধিতে এতটুকু শোক দুঃখ নেই, তাদের জন্যে কয়েকখানি সাদা কাগজ আর একটু কালি ছাড়া কিছুই আমি ত্যাগ করি না, তেমনি কিছুই আমি পাই না তাদের কাছ থেকে। তাদের জন্যে আহ্লাদে আটখানা হবার বা রেগে কাঁই হবার প্রশ্নই ওঠে না। আমার চেয়ে ভাল ভাবে আর কে জানবে যে একমাত্র আমার মন-বুদ্ধি ছাড়া দুনিয়ার কোথাও তাদের অস্তিত্ব নেই। যাদের অস্তিত্বই নেই তাদের জন্যে হৃষ্যতি কুপ্যতি হয় কোন পাগলছাগলে। যাকে দিয়ে আমি খুন করাব বা বলাৎকার করাব বলে ঠিক করেছি মনে মনে, সে সঠিক সময়ে খুন বা বলাৎকার করবেই। যাকে দিয়ে পরের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করাব বলে মতলব ভেজে রেখেছি, সে হাড়হাভাতে ঠগ বা জোচ্চর হলেও শেষ পর্যন্ত বিশ্বমানবের হিতার্থে জানটা পর্যন্ত দান করে ফেলবে। ঠাণ্ডা মেজাজে ঠিকঠাক মতলবটি ভেঁজে গল্পের চরম মুহূর্তে সাংঘাতিক একটি অপকর্ম বা পিলে চমকানো একটি সুকর্ম করে ফেলবেই আমার মানস সন্তানরা। রোগ শোক প্রেম ভক্তি ভালবাসা এ সব হচ্ছে রঙ, নানা জাতের রঙ ভাঁড় খুরিতে সাজিয়ে নিয়ে বসে আছি আমি। যখন যে রঙটি যার মুখে খাপ খায় তখন সেই রঙটি কাজে লাগাই। বেশ ফলাও করে মাখাতে পারলেই হল, যা দেখে মানুষের চোখ ঝলসে যাবে।

এর পরেও কি কেউ বলতে সাহস করবে যে আমি মুক্তির আস্বাদ পাইনি ?

তবে আপদ হচ্ছে ঐ প্রতিবেশীগুলো। বসে পড়েছি বলে কতকগুলো হাড়বজ্জাত পড়শী জুটেছে এখন। কিছু না কিছু ঘটছেই তাদের সংসারে, ফলে আমার মন-বুদ্ধির গায়ে খামকা জ্বালা ধরে যাচ্ছে।

যেমন সেদিন ঘটল।

আমার একটি অতি নিরীহ পড়শী রঘুদয়াল লাহিড়ীর বড় মেয়েটি পরনের নাইলন শাড়িখানা পাকিয়ে গলায় বেঁধে ঝুলে পড়ল। পাড়াশুদ্ধ মানুষ ভেঙে পড়ল লাহিড়ীদের দরজায়। আমাকেও যেতে হল। না গিয়ে উপায় কি! এখন তো আর রাহী নই, রাত পোহালে যাদের সঙ্গে চোখাচোখি হবেই, তাদের একজনের মেয়ে যদি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে থাকে তাহলে সেখানে গিয়ে কাচুমাচু মুখ করে দাড়াতেই হবে।

গিয়ে দেখি মহাসমারোহে শোক আর সহানুভূতির তুফান উঠেছে। হাউ-মাউ করে কাঁদছেন রঘুদয়াল, বাড়ির ভেতর থেকে এমন চিৎকার উঠছে যে পাড়ার কোনও ছাতে কাক চিল বসতে পারছে না। পড়শীরা কেউ ওঁদের বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করছেন, কেউ বা হায় হায় করছেন কপালে হাত দিয়ে। জল অনেকের চোখেই, সবায়ের মুখেই এক বুলি—কি সব্বনাশ হোল। হ্যাঁ, তা সব্বনাশ কিছু হোল বৈকি! একমাত্র রোজগেরে মেয়ে বাপের সংসার ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল। মোটের ওপর সে সময় সহৃদয় প্রতিবেশীদের যা বলা উচিৎ যা করা উচিৎ যে ভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলা উচিৎ যে জাতের শোকাবহ দৃষ্টিতে তাকানো উচিৎ, সবাই তাই নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করছেন। বেশ একটি মর্মভেদী করুণ পরিবেশ তৈরী হোয়েছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে একটা যাকে বলে অনির্বচনীয়

তৃপ্তি লাভ করলাম। মনে মনে গুছিয়ে রাখলাম টুকরো টুকরো দৃশ্যগুলো।' ভবিষ্যতে যদি কখনও এমন গল্প ফাঁদি, যে গল্পে দেখাতে হবে সংসারের একমাত্র রোজগেরে মেয়ে গলায় ফাঁসি লাগিয়ে আত্মহত্যা করলে, তখন, এই সব মাল মশলা নিখুঁত ভাবে সাজিয়ে দোব। পড়ে পাঠক পাঠিকাদের বুক নিঙড়ে নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসবে। রঘুদয়াল লাহিড়ীর কন্যাটি সত্যিকারের একটা উপকার করে গেল আমার। গলায় দড়ি দেওয়া ব্যাপারটা ঘটে গেলে পরিস্থিতিটা কি রকম দাঁড়ায় জানা হয়ে গেল। কিন্তু আসল দৃশ্যটা দেখা হলো না। ঝুলে পড়বার পর মেয়েটার মুখখানার অবস্থা কেমন হয়েছে দেখতে পারলে হত।

শাস্ত্রে আছে হৃদিস্থীত হৃষীকেশ হচ্ছেন ভাবগ্রাহী জানাদন। প্রভুর কি মহিমা! ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু আমার হৃদয়ে বসেই আমার বাসনাটুকু টের পেয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুরণ, দেরি হবার কি জো আছে। বাড়ির ভেতর থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন রঘুদয়ালের বড় শালা বদনবাবু। ভদ্রলোক সাহিত্যরসিক, আমার লেখার একজন উঁচুদরের সমঝদার।

"ভেতরে আসুন তো দাদা, একটা পরামর্শ আছে।"

পরামর্শ!

খুবই ঘাবড়ে গেলাম। যে কোনও ব্যাপারেই হোক ঐ পরামর্শ কার্যটিকে প্রাণপণে এড়িয়ে চলি। পরামর্শ করতে গেলেই মতামত দিতে হয়। কিংবা মতামত নিতে হয়। দুনিয়ার সব থেকে বড় বড় সর্বনাশগুলো ঘটে গেছে ঐ মতামত দ্রব্যটি দিতে গিয়ে বা নিতে গিয়ে। যদি মানুষ পরামর্শ করার সুযোগ না পেত তাহলে বড় বড় কুরুক্ষেত্র কাণ্ডগুলো পৃথিবীতে ঘটতে পেত না। ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে আমাদের নবনীবাবু যদি অপরের পরামর্শ কানে না তুলতেন তাহলে সেদিন ও ভাবে হেরে ঢোল হয়ে ফিরতেন না। টিপ তাঁর জানা ছিল, সোজা একশ'খানা টিকিট সেই ঘোড়াটির ওপর

ধরবেন বলেই সেদিন মাঠে গিয়েছিলেন, মাঝখান থেকে সব গুবলেট করে দিলে কালীঘাটের নকুল চক্কোত্তি। পরামর্শ দিলে পাঁচ নম্বর বাজিতে সাত নম্বর ধরবার জন্যে। স্বয়ং সাক্ষাৎ ঘোড়াটিই নাকি নকুলের কানে মুখ ঠেকিয়ে বলেছিল যে সেদিন সে জিতবেই। নবনীবাবু ঘোড়ার মুখের টিপ শুনে এক'শ খানা টিকিটই সেই ঘোড়ার খুরে অঞ্জলি দিয়ে চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে ঘরে ফিরলেন। যে টিপটি তার জানা ছিল সেই ঘোড়াই সটান জিতে গেল।

যাক গে, বদনবাবুর আহ্বান এড়িয়ে যেতে পারলাম না। আপদে বিপদে পড়লে পরামর্শ করবেই মানুষ। নিজের ভাগনী গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েছে এ হেন বিপদে মামা হয়ে বদনবাবু পরামর্শ করবেন না কেন। করুন পরামর্শ, মতামত না দিলেই হোল।

"আসুন আমার সঙ্গে। রান্নাঘরের পাশে ঘুঁটে কয়লা রাখবার ছোট্ট একটা ঘর আছে। সেই ঘরে এ কম করেছে ঝুনু। বাড়িখানা জঘন্য, কোন কালে বানানো হয়েছে কে জানে। কড়ি বরগা দেওয়া ছাত আছে কোথাও আজ কাল? যত্ত সব—"

বদনবাবুর সব কথা শুনতে পেলাম না। প্রচণ্ড বিক্রমে কান্নাকাটি করছেন মেয়েরা। প্রচণ্ডতর বিক্রমে তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এক রকম চোখ কান বন্ধ করেই বদনবাবুর পিছু পিছু এগিয়ে গেলাম। ঘুঁটে কয়লা রাখবার ঘরখানা অন্ধকার, দরজার সামনে পৌঁছে প্রথমে কিছু দেখাই গেল না। বদনবাবু বললেন—"ঐ দেখুন ঝুলছে। এখান থেকেই দেখুন, ভেতরে পা দেবেন না।"

একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেরিয়ে পড়ল আমার মুখ থেকে। নৈর্ব্যক্তিকতার খোলসটা টুপ করে খসে পড়ল। প্রায় চিৎকার করে উঠলাম—"সে কি। এখনও নামান হয়নি।"

"পাগল হয়েছেন।" বদনবাবু আমাকে ধমকে উঠলেন—"সুইসাইড কেস, সাংঘাতিক ব্যাপার। ঐ ঘরে ঢুকলেই সর্বনাশ।

যেমন আছে থাকুক, যাঁরা নামাবার তাঁরা আসুন, তাঁরাই নামাবেন। এমনিতেই দেখবেন কি ফ্যাসাদে পড়তে হবে বাড়ির লোকদের। কর্তারা এসে জেরা করে করে পেটের নাড়ীভুঁড়ি টেনে বার করে ছাড়বেন। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা দাদা, জানেন না তো কিছু। ঐ ঘরে কারও পায়ের দাগ পড়লে কি আর রক্ষে আছে। বলে বসলেই হলো, মেরে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে।”

বোকা বনে গেলাম। গলায় দড়ি দিলে কি করা উচিৎ সে সম্বন্ধে সত্যিই আমার কোনও জ্ঞান নেই। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব চেনা জানা কত লোকই আছে, কস্মিনকালে তাদের ভেতর কেউ গলায় দড়ি দেয়নি। তাই গলায় দড়ি দেওয়া ব্যাপারটা সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতাই নেই আমার। বুঝতে পারলাম, গলায় দড়ি দিলে দড়ি কেটে নামানো কর্মটির মত এমন আর একটিও নেই। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। যারা নামাবার তাঁরা আসবেন, তবে সেই ঝুলন্ত জীবটি নামতে পারবে।

মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। কি আপদ দেখ! ঝুনুই বা মনে করছে কি! ঝুনু মেয়েটি খুবই ঠাণ্ডা মেয়ে। দিন পনরো আগে এসেছিল আমার কাছে। ওদের অফিসক্লাবের থিয়েটার দেখতে যেতেই হবে। দু'খানা কার্ড গছিয়ে গেল।

বদনবাবু বললেন—“তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেলতে হবে আমাদের ষ্টেট্‌মেণ্ট্‌টা। এক রকম হওয়া চাই। এ এক রকম বলছে ও আর এক রকম বলছে আর একজন বলছে আর এক রকম, এই ভাবে যদি ষ্টেট্‌মেণ্ট্‌ দেওয়া হয় তাহলেই চিত্তির। কি ভাবে বললে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না, ঠিক করে ফেলুন দেখি। আপনি যা ঠিক করে দেবেন সেইটেই আমি শিখিয়ে দিচ্ছি সবাইকে। সবাইকে মানে এরা চারজন। দিদি জামাইবাবু কনু আর কুন্তল। আমি বাইরের লোক, আমাকে কোনও ষ্টেট্‌মেণ্ট্‌ দিতে হবে না। ওদের নিয়েই ভয়, ওলট পালট করলে সব মাটি—”

বাধা দিয়ে বললাম—"এর আবার ঠিক করাকরি কি। যা সত্যি তাই বলতে হবে। ঝুনু যে গলায় দড়ি দিয়েছে এটা তো আর মিথ্যে নয়।"

"না না, গলায় দড়ি দেওয়া নিয়ে তো কোনও প্রশ্নই উঠবে না। তাঁরা এসে চাক্ষুষ দেখবেন এখনও ঝুলছে। বিষ খাইয়ে মেরে টাঙিয়ে রেখেছে বা গলা টিপে মেরে টাঙিয়ে রেখেছে এই সব প্রশ্ন উঠতে পারে। এ জন্যে পোষ্টমর্টেম এগ্জামিন করবেই। প্রশ্নটা হোল গলায় দড়ি দিতে গেল কেন? আইবুড়ো মেয়ে, দিব্যি চাকরি করছিল, মাস গেলে সাড়ে চারশো পাঁচ শো টাকা ঘরে আনত, সে মেয়ে হঠাৎ এ কাজটা করতে গেল কেন? এই ব্যাপারটা নিয়েই টানা হেঁচড়া করবে কিনা। এর কি জবাব দেওয়া যায়?"

জবাবটা আমার মুখ থেকে শোনবার জন্যে বদনবাবু চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে রইলেন।

মাথা চুলকাতে লাগলাম। রাগ হয়ে গেল ঝুনুর ওপর। গুষ্টি সুদ্ধ সবাইকে ভ্যালা বিপদে ফেলে গেল তো মেয়েটা!

বদনবাবু পরম বিজ্ঞের মত মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন—"পারলেন না তো। আরে দাদা, বানিয়ে গল্প লিখতে পারেন আর একটা সোজা ষ্টেট্মেণ্ট খাড়া করতে পারলেন না? শুনুন তাহলে কি আমি শিখিয়ে দিয়েছি এদের। জানেন তো আত্মহত্যা করাটা এক ধরনের পাগলামি? ঠিক ঐ পয়েণ্টেই বাজিমাত করতে হবে। দিদি জামাইবাবু রুনু কুন্তল সবাই বলবে, রাত্রে একদম ঘুমতে পারত না ঝুনু, ঘুমলেই স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠত! অনেকবার দাঁতে দাঁত লেগে যায়। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে হুঁশ হয়। কাল অফিস থেকে বেরিয়ে সিনেমায় গিয়েছিল। বাড়ি এসে বলে ভয়ানক মাথা ধরেছে। ঝুনু রুনু দু'বোন এক ঘরে শোয়। অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করে রুনু যখন শুতে যায় তখন ঝুনু ঘুমিয়ে পড়েছে। রুনুও ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে উঠে দেখে—"

বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"ঝুনু সিনেমা দেখতে গিয়েছিল জানা গেল কি ক'রে?"

"প্রমাণ আছে, ওর ব্যাগে দুটো সিনেমার টিকিট পাওয়া গেছে।"

"টিকিট দু'খানা কেন? আর একজন কে?"

"তা আমরা জানব কেমন ক'রে। নিশ্চয়ই একজন বন্ধু সঙ্গে ছিল।"

আর কিছু জিজ্ঞাসা করার সময় পেলাম না। যাঁরা আসবার তাঁরা এসে গেলেন। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ঝুনু ঝুলন্ত অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেল।

মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, কোনও কারণেই আমার গল্প উপন্যাসের কোনও চরিত্রকে গলায় ফাঁস দিয়ে মরতে দেব না। মরতে হয় বিছানায় শুয়ে মরবে, গাড়ি চাপা পড়ে মর'বে, ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে মরবে। মরবার জন্যে শত শত পন্থা খোলা থাকতে ওভাবে ঝুলতে ঝুলতে দুলতে দুলতে মরবে কেন? কি বিশ্রী কাণ্ড। মরবার পরেও ঝুলে থাকতে হবে, কাছাকাছি কেউ পৌঁছতে পারবে না, দড়ি কেটে নামাতে পারবে না। গেরো আর কাকে বলে।

আমার পড়শী রঘুদয়াল বাবুর কন্যাটি গলায় ফাঁসি লাগিয়ে আত্মহত্যা করলে। রঘুদয়াল যদি আমার পড়শী না হতেন, তাঁর কন্যা ঝুনুকে যদি আমি না চিনতাম, তাহলে ব্যাপারটা ওখানেই চুকে যেত। কিন্তু তা যে হবার নয়, আমি গেছি থেমে, আজ কাল পরশুর সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটছি না। তাই ঝুনুর গলার ফাঁসে আমিও জড়িয়ে গেলাম। ওরাবে সহজিয়া রাইচাঁদ দাসের বিশ্বজোড়া জমিদারিতে কত গন্ডই না ঘটতে লাগল। কে বা দেখে কে বা শোনে, একটা পুরনো পচা গল্পের ফেরে পড়ে আমি নাকানি-চোবানি খেতে লাগলাম।

সিধু মল্লিক ছোকরাটিকে খুবই পছন্দ করি আমি। পছন্দ করি ওর গুণের জন্যে। বছর সাতাশ আটাশ বয়েস হবে সিধুর, কিন্তু এই বয়েসেই ও দুনিয়াটাকে চিনে ফেলেছে! কোথাও কিছু ঘটলে সিধু একদম বিচলিত হয় না। ক্বচিৎ মন্তব্য প্রকাশ করে। বক্তব্যটি এমনই মোক্ষম যে তারপর আর কেউ রা কাড়তে পারে না। সে বছর ভয়ানক চোরের উপদ্রব হোল পাড়ায়। আজ এ বাড়িতে চুরি হচ্ছে, কাল সে বাড়িতে হচ্ছে, ফি রাতে একটা না একটা বাড়িতে চুরি হচ্ছেই। জ্বালাতন করে ছাড়লে চোরেরা। ঘটি বাটি বাদ দিয়ে সবাই কলাপাতায় ভাত খেতে লাগল। জলখাবার জন্যে কলাই করা গেলাস কিনে আনলে। পেতল কাঁসার বাসন বলতে অনেক বাড়িতেই কিছু রইল না। পেতল কাঁসা ব্যবহার করলে আর রক্ষে নেই, চোর পড়বেই।

নাজেহাল হোয়ে আমরা ঠিক করলাম পাহারা দিতে হবে। আর জি পার্টি তৈরী হোয়ে গেল পাহারা দেওয়া শুরু হোল! যথা পূর্বং তথা পরং, চোরেরা তাদের কারবার আরও ফাঁপিয়ে তুললে। নিচ্ছিল বাসন-কোসন, এবার বাক্স প্যাটরা নিয়ে ভাঙতে শুরু করলে। তারপর একদিন সিধু মল্লিকের বাড়িতে চুরি হোল. সিধু থানায় গেল না, হৈ চৈ করলে না, বাড়ি বাড়ি ঘুরে খোজ করে বেড়াতে লাগল কারও কলেরা হোয়েছে কিনা। সন্ধ্যা নাগাদ খবর পাওয়া গেল ষষ্ঠীতলার পঙ্কজবাবুর বাড়িতে তার চাকরের ভেদবমি শুরু হয়েছে। পঙ্কজবাবু তাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন।

বন্ধুবান্ধব নিয়ে ছুটে গেল সিধু পঙ্কজবাবুর কাছে। বললে, তার কাছে অত্যাশ্চর্য এক বড়ি আছে, একটি খাওয়ালেই রুগী সেরে যাবে। মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে যদি ভেদবমি বন্ধ না হয় তাহলে পাঠান ওকে হাসপাতালে। মাত্র আধ ঘণ্টা সময় দিন।

পঙ্কজবাবু রাজী হোলেন। বড়ি একটি খাওয়ানো হল। মিনিট পাঁচেকের . .ধ্য খিঁচুনি বন্ধ হল, সমানে ওয়াক ওয়াক করছিল

লোকটি, তাও গেল ঘুচে। আগুনে জল পড়ল যেন, লোকটি ঘুমিয়ে পড়ল। সাক্ষাৎ-ধন্বন্তরি। সিধু গোটা চারেক কচি ডাব খাওয়াতে বলে চলে এল। ত্‌'জন বন্ধুকে কিন্তু বসিয়ে রেখে এল রুগীর পাশে, সারারাত পাহারা দেবে। বলা তো যায় না, আবার যদি কোনও উপসর্গ দেখা দেয়।

রাত দশটায় সুধাংশুবাবুর বাড়ি থেকে ডাক এল। তাঁরও চাকর হরদম বমি করছে আর পায়খানায় যাচ্ছে। ছুটল সিধু তার সেই বড়ি নিয়ে। সে রুগীটিকেও সামলালে। তারপর রাত ত্নটোয় জেলেপাড়া থেকে বুড়ো হরিহর জেলে কয়েকজন মুরুব্বীকে নিয়ে উপস্থিত হলো। ওদের পাড়ায় তিন বাড়িতে মা ওলাবিবি কৃপা করেছেন। সিধুবাবু যদি—

সিধুবাবু যাবার জন্যে তৈরী, কিন্তু যাবার আগে যে একটু পরামর্শ করা দরকার। সেই বাড়ি তিনটেয় থাকে কারা। তারাও কি জেলে? হরিহর কি চেনে তাদের? কেমন মানুষ তারা? করে কি?

হরিহর জেলে পাড়ার মুরুব্বী, সঙ্গে এনেছে আরও কয়েকজন মুরুব্বীকে। সবাই একটু লজ্জা পেল যেন। তারপর অবশ্য লজ্জা পাবার কারণটি হরিহরই ব্যক্ত করলে। যে সব বাড়িতে মা ওলাবিবি কৃপা করেছেন সেই বাড়ি গুলোর জন্যেই জেলেপাড়ার বদনাম। কয়েকজন ঝি থাকে সেই বাড়ি গুলোতে। দিনের বেলা তারা চাকরি করতে যায়, সন্ধ্যের পর রঙ মেখে দরজায় দাঁড়ায়। এপাড়ার ওপাড়ার বাবুদের বাড়ির চাকররা জোটে সেখানে, অনেক রাত পর্যন্ত আমোদ আহ্লাদ চলে। অনেকবার চেষ্টা করেছে জেলেরা ঐ সব ইল্লুতে কাণ্ড বন্ধ করতে, পারেনি। বাড়ি তিনখানা জগবন্ধু কাঁসারীর সম্পত্তি। কাঁসারীর পয়সার জোর আছে, থানাওয়ালারা কাঁসারীকে খাতির করে। তা সে মরুক গে যাক, কিন্তু এখন তো ওদের বাঁচান চাই। বুড়ো হরিহরের পায়ে পড়েছে তারা। কথা দিয়েছে, এ যাত্রা রক্ষে পেলে পাড়া ছেড়ে পালাবে।

বাড়িওয়ালা জগবন্ধু কাঁসারীর কাছে যাক না কেন। জগবন্ধুর যখন পয়সার অভাব নেই তখন সে ভাড়াটেদের বাঁচাবার জন্যে বড় বড় ডাক্তার ডাকতে পারে। সিধু সাফ জবাব দিয়ে দিলে।

গিয়েছিল। কাঁসারীকে পায়নি। মাল কেনবার জন্যে খাগড়ায় গেছে জগবন্ধু, কবে ফিরবে কেউ বলতে পারলে না। আসল কথা গা ঢাকা দিয়েছে ঘুঘু। চোরাই মাল কিনে বেচে বড় মানুষ হোয়েছে তো ব্যাটা।

সব শুনে সিধু চুপি চুপি অনেক কথা মুরুব্বীদের বললে। ওরা ফিরে গেল। পরদিন জেলেপাড়ার ছেলেরা রাশি রাশি পেতল কাঁসার বাসন এনে সিধুর কাছে জমা দিলে। পাড়াসুদ্ধ মানুষ আমরা নিজেদের জিনিষ চিনে বেছে নিয়ে এলাম। যে বাসনগুলো পাওয়া গেল না সেগুলোর বদলে জগবন্ধু কাঁসারী নতুন বাসন দিলে। চোরের হাঙ্গামা শেষ হোল।

সেই থেকে সবাই সিধুকে সমীহ করে চলে। কারও বাড়িতে কিছু হোলে সিধুকে ডেকে পরামর্শ করে। সহজে মুখ ফাঁক করে না সিধু, যখন করে তখন এমন কিছু বেরয় তার মুখ থেকে যার ওপর বা কাড়বার জো নেই। তবে তাকে পাকড়ানোই মুশকিল। ওর বাবার মস্ত বড় অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা। সিধুরা তিন ভাই হরদম রুরকেল্লা ভিলাই জামসেদপুর দুর্গাপুর চষে বেড়াচ্ছে। ঝুনু যেদিন গলায় দড়ি দিলে সিধু সেদিন জামসেদপুরে ছিল। দিন পাঁচেক পরে ফিরে এল। ওদের বাড়িতে বলে রেখেছিলাম, ফিরে এসেই সিধু যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। দেখা করতে এল। ঘরে পা দিয়েই বললে—"কুন্তলকে চেনেন তো। পরশু থেকে কুন্তলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওর বাবা মা পাগলের মত হয়ে গেছেন। মেয়ে মল ছেলে নিখোঁজ হয়ে গেল। বিপদ দেখুন।"

বাক্‌রোধ হয়ে গেল, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখ পানে। কি জন্যে আসতে বলেছিলাম তাও ভুলে গেলাম।

"বলুন কি করতে হবে, ডেকেছিলেন কেন? কুন্তলটাকে খুঁজে বার করতে হবে। আমার বাবার কাছে কুন্তলের বাবা এসেছিলেন। আমি আসতেই বাবার হুকুম হল, ছেলেটাকে খুঁজে নিয়ে আয়। কোথায় খুঁজব? গরু তো নয় যে কেউ ধরে খোঁয়াড়ে দিয়েছে, খোঁয়াড়ে খোঁয়াড়ে খুঁজে ছাড়িয়ে নিয়ে আসব। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়লাম দেখছি।" বলে সিধু আমার চৌকির কোনে বসে পড়ল।

"তাহলে কি হবে সিধু?" চেষ্টা করে ঐটুকুই আমি বলতে পারলাম কোনও রকমে।

সিধু একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে আড় হয়ে পড়ে বলল—"কি আবার হবে, খুঁজব। খুঁজতে শুরু করলে একটা না একটা উপায় বেরুবেই। ওর দিদির মত ফস করে যদি গলায় দড়ি না দেয় তা হলে একদিন ঠিক খুঁজে পাবই। কিন্তু হলটা কি ওদের তাই ভাবছি। কোথাও কিছু নেই ঝন্টু হঠাৎ গলায় দড়ি দিতে গেল কেন?"

ওর মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বললাম —"ঠিক ঐ জন্যেই আমি তোমাকে দেখা করতে বলেছি। সেদিন থেকে ভেবে ভেবে আমার ঘুম হচ্ছে না। হঠাৎ রঘুদয়াল বাবুর মেয়েটি ওভাবে আত্মহত্যা করলে কেন? উঃ, সে যা অবস্থা! ঝুলছে মেয়েটা কড়িকাঠে, ঘরে ঢুকে কেউ দড়ি কেটে নামাতে পর্যন্ত পারছে না। যাঁরা আসবার তাঁরা এলেন তবে লাশ নামল। কেউ গলায় দড়ি দিলে তাকে নামাতে নেই এটা জানতাম না আমি। ভাগ্যে বদনবাবু এসে পড়েছিলেন। তিনিই সব সামলালেন। এমন গুছিয়ে ষ্টেট্‌মেণ্ট দেওয়ালেন সবাইকে দিয়ে যে সব দিক রক্ষে হোল। উল্টোপাল্টা কথা বললে জেরা করতে করতে কর্তারা ওদের পেটের নাড়ীভুঁড়ি পর্যন্ত টেনে বার করে ছাড়তেন। যাক, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা আর পড়তে পেল না।"

সিধুও তারিফ করল বদনবাবুকে। "ভদ্রলোকের বুদ্ধি আছে

বলতেই' হবে। তবে একটু কাঁচা কাজ হয়ে গেছে।' দু'খানা সিনেমার টিকিট পাওয়া গেছে ঝুনুর ব্যাগ থেকে। এটা না বলে একখানা টিকিটের কথা বললেই হত। দু'খানা টিকিট বলার দরুণ আর একজন পড়ে গেল হাঙ্গামায়। সে বেচারাকে নিয়ে এখন কর্তারা টানাহেঁচড়া করবেন।"

"সে আবার কে!" আকাশ থেকে পড়লাম আমি।

সিধু বলল—"একজন কেউ হবেই। টিকিট যখন দু'খানা ছিল তখন আর একজন নিশ্চয় ঝুনুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। নিশ্চয় তাকে এতদিনে খুঁজে বার করে ফেলেছেন কর্তারা।"

হঠাৎ আমার খেয়াল হল, বদনবাবু যে স্টেটমেণ্টটা দিয়েছিলেন সেটাতে কি ছিল তা সিধু জানল কেমন করে। আমি তো সিনেমা টিকিটের কথা ওকে বলিনি। জিজ্ঞাসা করলাম—"বদনবাবু যে স্টেটমেণ্ট দিয়েছিলেন সেটা কি তুমি ইতিমধ্যেই দেখেছ নাকি?"

"না, দেখব কেমন করে, শুনেছি।" বলতে বলতে সিধু সোজা হয়ে উঠে বসল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাড়া দিল আমাকে—"চলুন, বেড়িয়ে আসি গে। সন্ধ্যে হয়ে এল। কি করে যে সারাদিন চুপচাপ বসে থাকেন ঘরের মধ্যে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলে কত কি মজার ব্যাপার দেখা যায়।"

তা যায়। এতদিন আমি রাস্তায় ঘুরে স্রেফ মজা দেখেই বেড়াতাম। আজও আমার বন্ধু রাইচাঁদ দাস ঐ কর্মই হয়ত করে বেড়াচ্ছে। আটকে গেছি আমি, গায়ে শ্যাওলা ধরছে। পড়শীর মেয়ে ঝুনু গলায় দড়ি দিয়ে এমনই প্যাঁচে ফেলে গেছে যে নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম। ডেকে পাঠালাম সিধুকে। ও এসে আর এক শুভ সমাচার শোনালে। রঘুদয়ালবাবুর একমাত্র ছেলে কুন্তলও নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। কি ব্যাপার রে বাবা! ওদের গুষ্টিসুদ্ধ সবায়ের মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি।

:

কুণ্ডলের কথাটাই আবার তুললাম—"তা হলে কুণ্ডলকে খোঁজবার কি ব্যবস্থা করছ সিধু?"

সিধু বলল—"চলুন না, ঘুরতে ঘুরতে সেই মতলবই করব। ঘরে বসে থাকলে কি কুণ্ডলকে খোঁজা হবে?"

আর কিছু বললাম না। জামাটা গলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সিধুকে আমি ভয়ানক বিশ্বাস করি। উপায় একটা ও ঠাওরেছে নিশ্চয়ই। চোর আসবে বলে বোতল পাঁচ সাত ধেনো মদ কিনে এনে তাতে উৎকট জোলাপের ওষধ মিশিয়ে যে ঘরে রাখে, তার অসাধ্য কর্ম নেই।

পথে পা দিয়েই সিধু বলল—"একটা ট্যাক্সি নেওয়া যাক। তাড়াতাড়ি অফিস পাড়ায় পৌঁছতে হবে। দেরি হলে সব অফিসের ছুটি হয়ে যাবে।"

আর একটু হলেই বলে ফেলেছিলাম, অফিস পাড়ায় যেতে হবে কেন। খুব সামলে গেলাম। চলুক যেখানে খুশি, আমার কাজ সঙ্গে থাকা, মুখ বুজে সঙ্গে থাকব।

যাত্রাটা শুভক্ষণে হয়েছিল, মিনিট দশেকের ভেতর ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। আর মিনিট দশেক পরে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে সিধু বলল—"চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন এই থামটার পাশে। ঐ বাড়িতে আমি একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাব। খুব সম্ভব সে এখনও বেরয়নি। যদি তাকে পাই সঙ্গে নিয়ে আসব। যদি দেখেন আমি কারও সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসছি আপনি খানিক তফাতে থেকে আমাদের পিছু পিছু আসবেন। খানিকটা গিয়েই আমি তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। আপনি তখন তার পিছু পিছু যাবেন। খুব সম্ভব সে একটা দোকানে বসে কিছু খেয়ে নেবে। খেয়ে নিয়ে কোথায় যায় কার সঙ্গে দেখা করে আপনি দেখে আসবেন। খুবই সোজা ব্যাপার। আপনাকে সে চেনে না, সন্দেহও করতে পারবে না। কেমন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পেরেছেন তো?"

ঘাড় নাড়লাম। অর্থাৎ জলের মত সব বুঝে ফেলেছি। এই বয়সে গোয়েন্দাগিরি করতে হবে। কপালের লেখন খণ্ডাবে কে। অনিকেত না হওয়া যে কত বড় ঝকমারি বোঝ এবার।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি কাকে সঙ্গে নিয়ে সিধু আসবে। লোকটি গুণ্ডা হোতে পারে, খুনে হওয়াও বিচিত্র নয়। একটা খুনে বা গুণ্ডার পিছু নেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। শেষ পর্যন্ত হয়তো ধরা পড়ে যাব। তার ফলে কপালে কি ঘটবে তাই বা কে জানে। বাড়িতে বিছানায় শুয়ে গোয়েন্দা কাহিনী পড়া এক কথা। রাস্তায় নেমে আসল খুনে বা গুণ্ডার পিছু নেওয়াটা ঠিক আরাম করে গোয়েন্দা কাহিনী পড়ার মত ব্যাপার নয়। তবে এটাও ঠিক যে সিধুকে বিশ্বাস করা যায়। সত্যিকারের কোনও বিপদের ঝুঁকি থাকলে সিধু নিশ্চয়ই আমাকে একাজে লাগাত না। তা'ছাড়া এ অবস্থায় পারব না বলে পিছিয়ে পড়াটা একেবারে অসম্ভব। ভাববে কি সিধু! লেখক বলে আমাকে যেটুকু ভক্তি শ্রদ্ধা করে সেটুকু বজায় রাখতে হোলে গোয়েন্দাগিরি করতেই হবে। লোকের কাছে মুখ দেখাতে হবে তো।

লোকের কাছে মুখ দেখাবার দায়ে পড়ে লাইট পোষ্টের আড়ালে মুখ লুকিয়ে সেই আকাশ-ছোঁয়া অফিস বাড়িটার প্রকাণ্ড দরজার পানে নজর রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম গলগল করে মানুষ বেরুচ্ছে। বিরাট এক রাক্ষসের হাঁ'যের ভেতর থেকে ঝলকে ঝলকে জ্যান্ত মানুষ বমি হোয়ে পড়ছে যেন। ভয়াবহ দৃশ্য, স্ত্রী পুরুষ মোটা বেঁটে লম্বা রোগা অগুনতি জীব গিলে ফেলেছিল রাক্ষসটা, হজম করতে পারেনি, উগরে দিচ্ছে। ঠিক বলতে পারব না কতক্ষণ ঐ ভয়াবহ দৃশ্য দেখছিলাম। ক্রমেই বমির বেগ কমতে লাগল। শেষে দেখা গেল দু'জন চারজন আধবুড়ো মানুষ ধীরেসুস্থে বেরিয়ে আসছে। তারপর দেখতে পেলাম সিধুকে। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে আকাশ

থেকে আছড়ে পড়লাম শান বাঁধানো ফুটপাতের ওপর। হরি হরি, ও কার সঙ্গে বেরিয়ে আসছে সিধু!

খুনে গুণ্ডা দূরে থাক, একটি ছাপোষা বাঙালী ভদ্রলোক হোলেও বা কথা ছিল। শেষপর্যন্ত এই বয়েসে পিছু নিতে হবে একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়েসের মহিলার! কেউ যদি টের পায় তা'হলে ভাববে কী! ভীমরতি ধরেছে মনে করে—

কে কি মনে করবে ভাববার ফুরসত্ত পেলাম না। হাঁটা শুরু করে দিলাম। মহিলাটির গা ঘেঁষে তাঁর কানের কাছে মুখ নামিয়ে কি যেন বলছে সিধু, বলতে বলতেই পথ চলছে। মহিলাটির মুখ দেখে মনে হোল উনি যেন খুবই মনমরা হোয়ে পড়েছেন। হঠাৎ সিধু ছিটকে পড়ল রাস্তার ওপর, সঙ্গে সঙ্গে একটা চলন্ত বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে আধ মিনিটের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। তখন আর আমি কোনও দিকে নজর দিতে পারি না, যাঁর ওপর নজর রাখবার ভার নিয়েছি তিনি যদি ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যান তা'হলেই চিত্তির। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সামনের কয়েক সার লোক ভেদ করে মহিলাটির ঠিক পিছনের সারিতে ঠাঁই নিলাম। নিশ্চিন্ত, এক হাত সামনে থেকে নিশ্চয়ই উনি অদৃশ্য হতে পারবেন না।

এতক্ষণে মহিলাটির বয়েস ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পেলাম। বয়েস আন্দাজ করার বিপদ আছে। মহিলাদের বয়েস তিন পর্দায় বাঁধা থাকে। যেদিন কোনও মহিলা ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরা শুরু করেন, সেদিন তিনি ষোল টপকে সতেরোয় পা দেন। তারপর দশ পনেরো বিশ যত বছর পরেই হোক, যেদিন তিনি সিঁথিতে সিঁদুর পরা শুরু করেন, সেদিন থেকে চব্বিশ পার হোয়ে পঁচিশে পা দেন। পঁচিশে পা দিয়ে চলতে চলতে চল্লিশে পৌঁছতে কারও পনেরো বছর লাগে কারো লাগে আরও পঁচিশ বছর। সুতরাং তিনশ' পঁয়ষট্টি দিনের বছর হিসেবে কোনও মহিলার বয়েসের হিসেব

করা যায় না। তবে কত বছর বয়েসে কলকাতা সহরের মহিলারা মহিলা হয়ে ওঠেন তা' আমি জানি। বাসে বা ট্রামে চার বছরের খুকী মহিলাসনে বসে থাকলেও তার পাশে বসবার উপায় নেই। লেডিজ হায়।

আমি যাঁকে অনুসরণ করছি তিনি যে পঁচিশ পার হন নি, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ রইল না। আমার ছোট ভায়ের বড় মেয়েটা ওঁর চেয়ে বয়েসে বড়। মুখের বাঁ পাশটা দেখা যাচ্ছে, গলা দেখতে পাচ্ছি। হাত পা সবই দেখছি এক হাত পেছন থেকে। বেলা দশটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করার দরুণ খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে মেয়েটিকে। কাপড় জামা জুতো মোটামুটি একেবারে খেলো জিনিষ নয়। এক হাতে কালো ফিতে বাধা পুরুষ মানুষের ঘড়ি আর একটি হাতে কিছুই নেই। কাঁধে কালো রঙের মহিলা ব্যাগ ঝুলছে। ফিকে বাদামী রঙের জামার হাত কনুই পর্যন্ত নামানো। জামার কাপড় এমন পাতলা নয় যে অন্তর্বাস দেখা যায়। পৃষ্ঠপ্রদর্শন করাবার গরজে শাড়ির আঁচল গুটিয়ে কাঁধে তোলা হয়নি। মুহুর্মুহু কাধ থেকে পিছলে পড়ছে না আঁচল। চলনেও ছন্দ তোলার প্রয়াস নেই। নেহাতই আটপৌরে ঘরের মেয়ে, যে মেয়ে পথ চলতে নেমে পথের মানুষদের বিপথে চালায় না।

সিধুর কথা হুবহু ফলে গেল। একটা খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। একটুখানি কি ভেবে নিয়ে উঠে গেল দোকানের মধ্যে। আমি পড়ে গেলাম ফাঁসাদে, দোকানের ভেতর ঢুকব না বাইরে অপেক্ষা করব বুঝতে পারলাম না। গোয়েন্দা কাহিনীর গোয়েন্দারা মুহূর্তের মধ্যে ঠিক করে ফেলে কি করা উচিৎ। সেই আণুবিক প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আমি পাব কোথায়। হদ্দ হ্যাংলার মত কাঁচের ওপিঠের সন্দেশ রসগোল্লাগুলোর পানে তাকিয়ে মাথা চুলকাতে লাগলাম। দোকানে ঢুকে কিছু খাবার নিয়ে বসলে কেমন হয়! মুশকিলে পড়ে যাব যদি মেয়েটি টপ করে খাওয়া চুকিয়ে

বেরিয়ে আসে। আমার খাবার তখনও হয়তো পড়ে আছে, তাড়াতাড়ি দাম দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখব চিড়িয়া হাওয়া হো গিয়া। যার নাম চিত্তির, গোয়েন্দাগিরি খতম হোয়ে যাবে।

দোকানে ঢোকার মতলবটি ত্যাগ করে খানিক তফাতে লাইট পোষ্টের পাশে আশ্রয় নিলাম। মিনিট দশেক পরে মেয়েটি বেরিয়ে এল। সঙ্গে নিয়ে এল এক মার্কামারা ক্ষুধার্ত যৌবনকে। ছাল ছাড়ানো প্যান্ট, খুদে খুদে দাড়ি, মাথায় বাবুই পাখির বাসা, চোখে কালো চশমা আর ছুঁচোমুখো জুতো সগৌরবে ঘোষণা করছে যে যৌবন কাঁটা গাছের উচ্চ ডালে পুচ্ছ নাচাচ্ছে। মেয়েটির অঙ্গে অঙ্গ ঠেকিয়ে এক রকম ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল তাকে সেই জিভ লকলকে যৌবন। সন্ধ্যা তখন পার হোয়ে গেছে। ফাঁকা হোয়ে উঠেছে আফিস পাড়ার পথ। ওভাবে একটি মহিলার সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করতে করতে পথ চলাটা অনেকেরই নজর এড়াল না। কিন্তু করা যাবে কি! বেপরোয়া বেলেল্লাপনা করার অধিকারের নাম ব্যক্তি স্বাধীনতা, সেই বেহেড স্বাধীনতাটি এদেশে সগৌরবে চালু আছে।

এতক্ষণে প্রকৃত গোয়েন্দাগিরি করার মওকা পেয়ে বেশ তেতে উঠলাম আমি। একটি বেশ রসঘন রহস্য ঘনিয়ে উঠল। রহস্যভেদ করাই হোল গোয়েন্দার কাজ। চলতে লাগলাম ওদের পিছু পিছু, তফাতটা খানিক বাড়াতে হোল। বলা যায় না, ক্ষুধার্ত যৌবন যদি হাঁ করে তেড়ে আসে।

ওরা ট্রামে বাসে উঠল না। ট্রামে বাসে উঠলে অমন ঘনিষ্ঠ হোয়ে মনের কথা শোনানো যাবে না বলেই বোধ হয় হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল একদম কলেজ পাড়ায়। কলেজ পাড়ায় এক গলির মধ্যে ঢুকল যখন তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমি। এইবার বোধহয় আমার গোয়েন্দাগিরির ইতি হবে। নিশ্চয়ই ওরা ঢুকবে কোনও বাড়িতে। সেই বাড়ির নম্বরটা দেখে যেতে পারলেই

হোল। সিধু বলে দিয়েছে, কোথায় যায়, কার সঙ্গে দেখা করে জেনে যেতে হবে। দেখা করল ঐ ছাল ছাড়ানো প্যাণ্ট সার্ট দাড়িওয়ালা ইচড়েপকটির সঙ্গে, কোথায় পৌছে যাত্রা খতম হবে এবার সেইটুকু জানা চাই। আমার জীবনের প্রথম গোয়েন্দাগিরি যে এভাবে নির্বিঘ্নে সাফল্যমণ্ডিত হবে তা কি ভাবতে পেরেছিলাম।

ভাবা যে অনেক কিছুই যায় না, মিনিট তিনেক পরে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। পাশের একটা অন্ধকার গলি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল কয়েকজন ওদের ওপর। পাঁচ সাত হাত পেছন থেকে দেখতে পেলাম কি ঘটে গেল চক্ষের নিমেষে। ভটাভট্ ধপাধপ্ কয়েকবার আওয়াজ হোল, একটিবার মাত্র কি একটা বলে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি। পরমুহূর্তে আমার পাশ দিয়ে তীব্র বেগে ছুটে চলে গেল একজন। সামনে তাকিয়ে দেখি আর একজন গড়াগড়ি যাচ্ছে আর গোঙাচ্ছে।

চারিদিকের বাড়ি থেকে লোকজন বেরিয়ে এল। যে গড়াগড়ি খাচ্ছিল পথের ওপর তাকে তুলে পাশের রোয়াকে শোয়ানো হোল। জল নিয়ে এস, বরফ আন, ডাক্তার ডাক. পাঠাও হাসপাতালে ইত্যাদি বহু জাতের হাঁকাহাঁকি চলতে লাগল। এগিয়ে গিয়ে দেখে নিলাম কার জন্মে এত কাণ্ড হচ্ছে। চিনতে কষ্ট হোল না লক্কাটিকে। ওরই পিছু পিছু ঘণ্টা দেড়েক হেঁটে মরেছি। মুখখানা একেবারে থেঁতলে গেছে। তলপেটে কিছু হোয়েছে নিশ্চয়ই, দু'হাতে তলপেট চেপে ধরে গোঙাচ্ছে। ভিড় ঠেলে কাছে গিয়ে বেশ করে দেখে নিলাম। কেউ কিছু সন্দেহ করল না। এক ভদ্রলোক খেঁকিয়ে উঠলেন—"আপনি বুড়ো মানুষ, আপনি আবার এর মধ্যে মাথা গলাচ্ছেন কেন। দেখছেননা, গুণ্ডায় খুন করে গেল?"

নেহাত গোবেচারার মত জিজ্ঞাসা করলাম—"ছোকরাটি কে বাবা? প্রাণে বাঁচবে তো?"

আর একজন জবাব দিলেন—"প্রাণে বাঁচবে না তো মরবে

নাকি। সহজে এরা মরে না দাছ। যান যান; সরে পড়ুন শিগ্‌গির। এর পার্টি এসে পড়বে এখুনি বোমা-ফোমা নিয়ে।"

তাঁর উপদেশ শুনে সরে পড়বার জন্যে পা বাড়িয়ে দেখি ইতিমধ্যে ভিড় পাতলা হয়ে গেছে। জল বরফ ডাক্তার হাসপাতালের জন্যে যারা হাঁকাহাঁকি করছিলেন তাঁরা উধাও। চারিদিকের বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ হবার আওয়াজ উঠল। রাত তখন বড় জোর নটা হবে। নটার সময় কলকাতার বুকে হঠাৎ নিশুতি রাতের নিস্তব্ধতা নেমে এল। সরে পড়াটা মুলতুবী রেখে ছোকরাটির গায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"উঠতে পারবে কি? উঠে পড় আমাকে ধরে। কোনও রকমে যদি বেরিয়ে যেতে পারি আমরা গলি থেকে, তা'হলে একটা ট্যাক্সি ধরে—"

গোঁ গোঁ করে কি যে বলল সে বুঝতে পারলাম না। মরিয়া হোয়ে টেনেটুনে তুলে বসালাম তাকে। বহু কষ্টে সে আমাকে ধরে রোয়াকের ওপর থেকে নেমে দাঁড়াল। এক হাতে জড়িয়ে ধরলাম তার কোমর, আর এক হাতে তার হাত একখানা আমার কাঁধের ওপর তুলে টেনে নিয়ে চললাম। অনেকেই দেখল আমাদের অবস্থা, কেউ কাছে এগিয়ে এল না। ছ'একটা টিপ্পনী কানে এল -"বুড়োটার পাখা গজিয়েছে। একটি বোমা যদি ঝাড়ে তা'হলে পরোপকার করা বেরিয়ে যাবে। চলল বড় রাস্তায়। যাক না, পুলিশ মুখিয়ে আছে।"

বড় রাস্তায় পা দিয়েও পুলিশের টিকি দেখা গেল না। খালি ট্যাক্সি একখানা মিলল। নগদ দশ টাকা কবুল করায় রাজী হোল আমাদের তুলতে। আবার টেনেটুনে তুললাম তাকে গাড়িতে। কোথায় যেতে হবে জিজ্ঞাসা করল ট্যাক্সিওয়ালা। নিজের আস্তানার ঠিকানা বলে দিয়ে তার পাশে বসে হাঁপাতে লাগলাম।

আস্তানায় পৌঁছে দেখি সিধু মল্লিক আমাদের নামিয়ে নেবার জন্যে তৈরী হোয়ে রয়েছে। বরফ আর ব্র্যাণ্ডি আনবার জন্যে সিধুর

এক বন্ধু সাইকেল চেপে ছুটল। টেনে হিঁচড়ে চোঙা প্যাণ্ট ছাড়িয়ে শোয়ানো হোল তাকে চৌকির ওপর। একটু পরে বরফ ব্র্যাণ্ডি এসে গেল। ডাক্তার ডাকবার কথাটা একবার উত্থাপন করতে গেলাম আমি। সিধু বলল, ডাক্তার ডাকার দরকার হবে না। এই রকম ছোটখাট ব্যাপারে ডাক্তার ডাকতে হোলে কলকাতা সহরে বাস করা উচিৎ নয়।

তথাস্তু, স্নান করবার জন্যে চলে গেলাম। গায়ে মাথায় জামা কাপড়ে রক্ত লেগে গেছে। খুন-খারাপি রক্তারক্তি কাণ্ডগুলোও নেহাত ছোটখাট ব্যাপার। সাধে কি আর কবি গেয়েছেন—যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে, তুই যে পারিস কাঁটা গাছের উচ্চ ডালে পুচ্ছ নাচাতে।

হায় যৌবন! আমার জীবনে কবে যে তুমি এলে কবেই বা তুমি গেলে জানতেই পারলাম না।

স্নান টান করে ফিরে এসে দেখি খাড়া হোয়ে বসেছে ছোকরাটি। সিধুর এক বন্ধু এক চাঁই বরফ চেপে ধরে আছে তার তলপেটে। আর এক বন্ধু রুমালে মুড়ে এক টুকরো বরফ তার নাকে মুখে ঘষছে। ছোকরাটির হাতে হাফ গেলাস ব্র্যাণ্ডি, সিধু বলছে—"গিলে ফেল ওটুকু, এখুনই চাঙা হয়ে উঠবি। ব্র্যাণ্ডি পেটে পড়লে মগজটাও সাফ হবে। কি হোয়েছিল বলবি তো। এ রকম বেমক্কা ধোলাই দিল কারা? গিয়েছিলি কোথায় মরতে? এ ভদ্রলোকই বা তোকে তুলে আনলেন কেন?"

ব্যাপারটা কি ঘটেছিল আমি বলতে গেলাম। সিধু আমাকে ইশারা করে বারণ করল। গেলাসটা তুলে ঠোঁটে ঠেকাল ছোকরা, এক নিঃশ্বাসে সবটকু টেনে নিয়ে বলল—"জল খাব।"

সিধু বলল—"জল নয়, এক টুকরো বরফ নে মুখে, জল গিললে পেটের ব্যাথা বেড়ে যেতে পারে। মনে হচ্ছে, খুব জোরে লাথি

ঝেড়েছিল তলপেটে। মোক্ষম জায়গায় তাক করেছিল, ভাগ্যিস লাগে নি।. আর একটু নিচে লাগলে এতক্ষণে নিমতলায় পৌঁছে যেতিস। তা' যাক গে, এখন বল এ দশা তোর করলে কারা! গিয়েছিলি কোথায়?"

হাঁ করে শুনতে লাগলাম ছোকরাটি যা বলল। অফিস থেকে বেরিয়ে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে গিয়েছিল সে। মামাতো ভায়ের বিয়ে, কয়েকখানা কাপড় কিনতে হবে। কাপড় চোপড় কিনে মামার বাড়ি যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে ঢুকে পড়েছিল একটা গলিতে। গুণ্ডারা মেরে ধরে কাপড়গুলো কেড়ে নিয়ে গেছে। শুধু কাপড়গুলোই নেয়নি সেই সঙ্গে মনিব্যাগটাও চলে গেছে।

"কত ছিল," জানতে চাইলে সিধু।

"ষাট পঁয়ত্রিব মত হবে," জবাব দিল ছোকরা।

সিধু বলল—"যাক গে। ওরকম কত আসবে কত যাবে। প্রাণটা যে যায়নি এই ঢের। এখন বল যাবি কোথায়? এই অবস্থায় যদি বাড়িতে যেতে চাস—"

কথাটায় যেন আঁতকে উঠল ছোকরা। এই অবস্থায় বাড়িতে যেতে পারবে না সে, এক বন্ধুর কাছে গিয়ে রাতটা কাটাবে। একটা ট্যাক্সি পেলে—

"ট্যাক্সি ডাকতে পাঠাচ্ছি, কিন্তু একলা যেতে পারবি তো?" সিধু জিজ্ঞাসা করল। জিজ্ঞাসা করেই জবাব পাবার আগে এক বন্ধুকে ট্যাক্সি আনতে বলল। তারপর তার গেলাসে আরও খানিকটা ব্র্যাণ্ডি ঢেলে দিয়ে বলল—"আর একটু খেয়ে নে, তাহলেই চাঙা হয়ে উঠবি। কিন্তু আমি ভাবছি হিমানী বেচারী সারারাত ভেবে মরবে। বলিস তো হিমানীকে একটা খবর পাঠাই। কাজে আটকে গিয়েছিস তুই, রাতে ফিরতে পারবি না জানিয়ে দি।"

গেলাসটা হাতে নিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল ছোকরা। সিধু নিজের মনেই বলে চলল—"বিয়ে থা করে ফেলেছিস যখন তখন

সামলে চলা উচিৎ। শত্রু তোর বিস্তর, বাগে পেলে ছেড়ে দেবে না। সব জেনেশুনে কেন যে গোঁয়াতুর্মি করতে যাস বুঝতে পারি না। এ ভদ্রলোক যদি তুলে না আনতেন তাহলে শ্রাদ্ধটা কতদূর গড়াত ভেবে দেখ। পুলিশে নিয়ে যেত হাসপাতালে। পুলিশের সঙ্গে তোর যা সম্পর্ক তাতে ঐ কলেজ ষ্ট্রীটে গিয়ে কাপড় কেনার গল্প বললে রেহাই পেতিস না। তোর মনিব এমন একখানি চিজ, সে হাত ধুয়ে বসে থাকবে। যার জন্য জান দিতে যাস সে তোকে একদম চিনতেই পারবে না।"

দাঁতে দাঁতে চিবিয়ে যাচ্ছেতাই একটা খিস্তি করলে ছোকরা। সিধু বললে—"থাক থাক, এঁর বাড়িতে বসে ঐ সব শাস্ত্র কথাগুলো আর আওড়াস নে। কাকে ইনি তুলে এনেছেন জানেন না।" তারপর আমার দিকে ফিরে সিধু তার পরিচয় দিল—"আপনি তো অষ্টপ্রহর ঘরের ভেতর বসে থাকেন, এই সব স্বনামধন্য মহাপুরুষদের নামও বোধহয় শোনেননি। এঁর নাম ব্যাঙ। ব্যাঙ বললে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সারা কলকাতা সহরের সব ক'জন নামকরা মস্তান এঁকে চিনবে। তবে ইনি যা করেন পরের উপকারের জন্যে করেন। পরের উপকার করতে গিয়ে কোন্ দিন বেচারা জানটাই হয়তো দিয়ে ফেলবে। যাক গে, এ সব কথা ব্যাঙ কানেও তুলবে না। ঐ বোধহয় এসে গেছে ট্যাক্সি। নে ওঠ, প্যাণ্ট পরে নে। কিছু টাকা নিয়ে যাবি নাকি, মনিব্যাগ তো গন্।"

ব্যাঙ্ উঠে দাঁড়াল। আণ্ডারওয়ার পরা ছিল, বরফ চেপে ধরার দরুণ সেটা গিয়েছিল ভিজে। সেই ভিজে আণ্ডারওয়ারের ওপরেই হেঁচড়াহেচড়ি করে প্যাণ্টটাকে আটকে নিলে। আমার দিকে ফিরে বললে—"ভুলব না স্যার আপনার ঋণ, আপনার দয়ায় আজ বেঁচে গেছি।" সিধুর দিকে ফিরে হাত পেতে বলল—"গোটা দশেক দাও, কাল না পারি পরশু দেখা করে ফেরত দেব।"

বিনা বাক্যব্যয়ে দশ খানা এক টাকার নোট ওর হাতে দিল সিধু। টলতে টলতে ব্যাঙ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ওর বন্ধু দু'জনকে ছেড়ে দিয়ে চৌকির ওপর আড় হয়ে পড়ল সিধু। বলল—"শুনলেন তো কি রকম মিথ্যে কথা বলে গেল ব্যাঙ। স্বপ্নেও কখনও ওরা সত্যি কথা বলে না। ভাগ্যে আপনি রাজী হলেন, সেই মেয়েটা কোথায় যায় কার সঙ্গে মেশে জানা গেল। ওরে বাব্বা! শ্রীমান ব্যাঙের পাল্লায় পড়েছেন শ্রীমতী, অনেক খোয়াব আছে কপালে। যাক, এখন খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন। শরীরের ওপর যেরকম ধকল গেল—"

"সেই মেয়েটির যে কি দশা হল"—তাড়াতাড়ি আমি বলতে গেলাম সেই মেয়েটির কথা। সিধু আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—"কি আবার হবে, বাড়িতে গিয়ে রুটি খেয়ে শুয়ে পড়েছে। ব্যাঙচন্দ্রকে আচ্ছা করে ধোলাই না দিলে শেয়ালদার ওধারে একটা উঞ্ছ হোটেলের ঘরে অর্ধেক রাত কাটাত। খুব সম্ভব এইবার সাবধান হবে। না হয় উচ্ছন্নে যাবে। আজকাল সবাই স্বাধীন, উচ্ছন্নে যাওয়ার স্বাধীনতা সকলেরই আছে। বাঁচাবার চেষ্টা করা গেল; এখন ওর কপালে যা আছে তা হবেই।"

ফস করে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম—"তাহলে তোমরাই ঠেঙিয়েছ ঐ ব্যাঙকে, তার মানে তোমরা আগাগোড়া আমাদের সঙ্গে ছিলে?"

"আপনার মত মানুষকে ঐ হ্যাঙ্গামার ভেতর পাঠিয়ে আমরা নাক ডাকিয়ে ঘুমোই কি করে বলুন।" বলতে বলতে সিধু উঠে দাঁড়াল। "কেন ঝুনু গলায় দড়ি দিলে জানতে চান আপনি, তাই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। নিজের চোখেই দেখুন, দুনিয়াটা কি জাতের আজব চিড়িয়াখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গল্প লেখেন ঘরে বসে, ঘরের বাইরে পা দেন না। আমাদের সঙ্গে দু চারদিন ঘোরাঘুরি করলে নিজেই জানতে পারবেন কেন ঝুনুর মত মেয়েরা

আত্মহত্যা করে। এই যে আর একটি মেয়ে যার পেছনে ঐ ব্যাঙ লেগেছে, এও হয়তো শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে।"

চেঁচিয়ে উঠলাম—"আবার আত্মহত্যা!"

"কিংবা খুন" বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে সিধু বলে গেল—"খুনও হতে পারে। আজ এই পর্যন্ত থাকুক। সকালের দিকে সময় পেলে আসব একবার। চলি—"

বসে রইলাম মাথায় হাত দিয়ে। কি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম রে বাবা! অন্তত মাস খানেক যদি গা ঢাকা দিয়ে অন্য কোথাও থাকতে পারতাম, তাহলে পড়শীদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যেত। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়।

সকাল বেলা খবরের কাগজ খুলে দেখি হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ নাম দিয়ে যে বিজ্ঞাপনগুলো ছাপানো হয় তাতে রঘুদয়াল লাহিড়ীর ছেলে কুন্তলের নাম উঠে গেছে। যথেষ্ট পয়সা খরচা করে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন রঘুদয়াল। প্রথমে কুন্তলের নাম বয়েস ও পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কি কি পরে সে নিরুদ্দেশ হয়েছে তাও বলা হয়েছে। তারপর কুন্তলের কাছেই আবেদন করা হোয়েছে—বাবা কুন্তল ফিরে আয়। তোর মা মৃত্যুশয্যায়। কোথায় আছিস জানা। টাকা পাঠাব।

পড়ে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। কি হোল ছেলেটার! আসুক সিধু, সর্বাগ্রে কুন্তলকে খুঁজে বার করবার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

সিধু এল না, নটা দশটা নাগাদ এলেন বদনবাবু। হ্যাঁ, বদনবাবুই বটে, কিন্তু চেনবার উপায় নেই। ভাগনীটি মারা যাবার পর বোধ-হয় জল পর্যন্ত মুখে দেন নি বা দুচোখ বোজেন নি। দাড়ি কামান নি, মাথায় তেল মাখেন নি, এমন কি দাঁত পর্যন্ত মাজেন নি। শোক বটে। শোকের দাপট দেখে মনে মনে তারিফ না করে পারলাম

না। বদনবাবু শূন্যদৃষ্টিতে আমার মুখপানে তাকিয়ে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শোকের গুঁতোয় অনেকের মাথা খারাপ হোয়ে যায়। ভাগনীর শোকে মামার মাথায় কিছু হোল কিনা ভাবতে লাগলাম। মিনিট দুয়েক পরে বদনবাবু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না জুড়লেন। অগত্যা একটা কিছু বলতে হোল। বসতে বললাম, বসে বসে কাঁদলে কান্নাটা জমবে ভাল।

বসলেন না বদন বাবু। ফোঁপাতে ফোঁপাতেই জিজ্ঞাসা করলেন —"আমার কি হবে ?"

পড়ে গেলাম ফাঁপরে। ভাগনীটি মারা যাবার দরুন বদনবাবু এমনই অনাথ হয়ে পড়েছেন যে—

পকেট থেকে একখানি খাম বার করে আমার সামনে ফেলে দিয়ে বদনবাবু বললেন—"পড়ে দেখুন। ওরা আমায় বাঁচতে দেবে না।"

সে দিকে তাকিয়ে রইলাম। হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে সাহস হোল না।

"আমি কি দোষ করলাম ?" ফোঁপানো বন্ধ করে গর্জে উঠলেন বদন বাবু—"দু'খানা টিকিট পাওয়া গিয়েছিল ঝুনুর ব্যাগে, সত্যি কথাই বলেছি আমি। সত্যি কথা বলেছি বলে ওরা খুন করবে আমাকে ? দেখুন কি লিখেছে ঐ চিঠিতে। দেখে বলুন, কি করা উচিৎ আমার। আমিও দেখে নোব ওদের, সব ব্যাটাকে ঢোকাব হাজতে। বদন বাগচীকে ঘাঁটালে রক্ষে নেই, হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারবে এবার।"

খামখানি তুলে নিয়ে চিঠিখানি বার করে পড়তে শুরু করলাম। অতি অল্প কথাই লেখা হয়েছে চিঠিতে। যা লেখা হোয়েছে তা পড়লে সত্যিই মাথা গরম হয়। অতি অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে বলা হয়েছে যে ফল ভোগ করতে হবে। ঝুনুর ব্যাগে দু'খানা টিকিট পাওয়া গেছে এই কথা বলার দরুণ চরম শাস্তি পেতে হবে।

চিঠির শেষে লেখকের নাম ঠিকানা নেই। নাম ঠিকানার বদলে লেখা রয়েছে, তোমার যম। পত্র প্রেরক শ্রীমান যমের হাতের লেখাটি কিন্তু চমৎকার। দেখে মনে হোল যম সাহেব বোধহয় কোনও আড়তে বা দোকানে বসে জাবেদা খাতা লেখেন।

চিঠি পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"এই চিঠি লিখল কারা? আপনার কি সন্দেহ হয় কাউকে?"

"সন্দেহ মানে?" বদনবাবু হাত পা ছুঁড়ে চেঁচাতে লাগলেন—"সন্দেহ আবার কি? ওদের প্রত্যেকটিকে আমি চিনি, আপনিও চেনেন। ওদের মর্জি মাফিক চলতে হবে সবাইকে, নয়ত ওরা পথে ঘাটে অ্যাসিড বালব্ ছুঁড়ে মারবে। সেদিন একটা কলেজের মেয়ের মুখের ওপর অ্যাসিড বালব্ মেরেছে। এবার ওদের গুষ্টিশুদ্ধ সবাইকে—"

বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনিও চেনেন আমিও চিনি তাদের? কারা বলুন তো?"

বদনবাবু খানিক নুয়ে পড়ে আমার মুখের কাছে মুখ নামিয়ে প্রায় চুপিচুপি বললেন—"ঐ আপনার সিধু মল্লিকের দল। ছোড়াটা তো প্রায়ই আসে আপনার কাছে শুনেছি। বলে দেবেন, আমার সঙ্গে যেন লাগতে না আসে। আমার নাম বদন বাগচী, খামকা কারও অনিষ্ট করি না আমি। কিন্তু লেজে পা দিলে ছোবলাবই।"

সিধু মল্লিক! সিধুর দল অ্যাসিড বালব্ ছোড়ে! চোখ কপালে উঠে গেল আমার।

বদনবাবু চৌকির ওপর একটা থাপ্পড় মেরে বললেন—"আলবত ছোড়ে। ওর বাপের টাকা আছে বলে কি ওকে খাতির করতে হবে নাকি?"

"কিন্তু ঝুনুর ব্যাগে কখানা সিনেমার টিকিট পাওয়া গিয়েছিল তা' নিয়ে সিধুর দল মাথা ঘামাতে যাবে কেন? ঝুনু গলায় দড়ি দিলে কেন যতক্ষণ না জানা যাচ্ছে—"

"জানবেন দাদা জানবেন, সবই জানতে পারবেন। ধর্মের কল হাওয়ায় নড়ে। কাল হোক পরশু হোক দশদিন পরেই হোক আসল ব্যাপার জানা যাবেই। ভাগনেটা বোধহয় অনেক কিছু জানত। তাই তাকেও বেপাত্তা করা হোল। এখন আমাকে শাসানো হচ্ছে, কেন আমি দু'খানা টিকিটের কথা বলতে গেলাম। বেশ করেছি বলেছি, সত্যি কথা বলেছি তাতে হয়েছেটা কি শুনি? দরকার হোলে সেই আর একজনের নামও বলে দিতে পারি যে সেদিন ঝুনুর সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছিল। কিন্তু সহজে বলছি না, নিজের ভাগনীর নামে পাঁচজনে পাঁচ কথা রটাবে মুখ বুঁজে আমাকে সহ্য করতে হবে। তাই —"

চটে উঠলাম আমি। বললাম —"দেখুন বদনবাবু, আপনার ভাগনীটি মারা গেছে, সুনাম বদনামে এখন কিছুই আসবে যাবে না তার। যদি কিছু জানেন খোলাখুলি বলুন। ভদ্র ঘরের একটা আইবুড়ো মেয়ে, ভাল চাকরি করছিল, বাপের সংসার চলছিল তাতে, হঠাৎ সে আত্মহত্যা করে ফেললে। মানে, একটা সংসার ভেসে গেল। এই সর্বনাশটা ঘটল কেন জানা দরকার সকলের। জানলে অনেক বাপ মা অভিভাবক সাবধান হোতে পারবেন। সমাজে বাস করছেন, সমাজের কাছে আপনার কর্তব্যও আছে।"

"সমাজের কাছে কর্তব্য আছে বলেই মুখ টিপে আছি। নয়ত সমাজের মাথায় চড়ে বসে আছেন যাঁরা, তাঁদের উঁচু মাথা ধুলোয় লুটোবে। ঘরে বসে বই লেখেন, সমাজ যে কি চিজ তা জানেন না। যাক আপনার ঐ সিধু বাবাজীকে একটু সমঝে চলতে বলবেন, এই কথাই আপনাকে বলতে এসেছি। সমঝে না চললে বাছাধনকে শ্রীঘরে বাস করতে হবে।"

বক্তব্য শেষ করে আর দাঁড়ালেন না বদনবাবু, যাত্রাওয়ালাদের মত বেগে নিক্রান্ত হোয়ে গেলেন। যাবার সময় চিঠিখানা তুলে নিয়ে যেতে ভুললেন না

সিধু মল্লিককে নিয়ে নতুন ভাবনায় পড়ে গেলাম। সিধু আর সিধুর দল কোন কলেজের মেয়ের মুখে অ্যাসিড বালব ছুঁড়েছে! কাল রাত্রে ব্যাঙকে ওরাই ঠেঙিয়েছিল, ঠেঙানিটা আমি নিজের চোখেই দেখেছি। সৎ উদ্দেশ্যে ঐ কর্মটি করেছিল ওরা, সেই মেয়েটিকে ব্যাঙের খপ্পর থেকে বাঁচাবার জন্যে ব্যাঙকে ঐ দাওয়াই দিয়েছিল। বুঝলাম, কিন্তু মারামারি ঠেঙাঠেঙি করাটা কি ওর মত মানুষের মানায়। গুণ্ডা মস্তানদের সঙ্গে তা'হলে তফাতটা রইল কোনখানে।

ঠিক করে রাখলাম সিধু আসলে স্পষ্টাস্পষ্টি ওকে জিজ্ঞাসা করব, ঐ কলেজের মেয়ের মুখে অ্যাসিড বাল্‌ব ছোড়ার ব্যাপারটা। সোজা কথায় বলব, ব্যাপারটা যদি সত্যি হয় তা'হলে সে যেন আমার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখার চেষ্টা না করে। সামান্য মানুষ আমি, ঐ সমস্ত বড় বড় কাজ যারা করে বেড়ায়, তাদের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে চাই না। এই বয়েসে বীরত্ব দেখিয়ে মহাবীর আখ্যা পাবার বিন্দুমাত্র সখ নেই আমার। কোনও রকমে ঘরের কোনে মুখ লুকিয়ে বাকী দিন কটা কাটাতে পারলেই হোল।

খবরের কাগজটা হাতে তুলে নিলাম আবার, কুন্তলের সেই বিজ্ঞাপনটার ওপর আবার নজর পড়ল। বদনবাবু বলে গেলেন তার ভাগনে অর্থাৎ কুন্তল তার দিদির আত্মহত্যা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানত বলেই তাকে সরিয়ে ফেলা হোয়েছে। সরিয়ে ফেলা হোয়েছে নাকি? আসুক সিধু, কুন্তলের ব্যাপারটারও একটা হেস্তনেস্ত করা চাই। মেয়ে গেল, ছেলেও গেল, রঘুদয়ালবাবু আর তাঁর স্ত্রী পাগল হয়ে উঠেছেন। যদি বেঁচে থাকে কুন্তল তা'হলে সর্বাগ্রে তাকে খুঁজে বার করা চাই। হয় সিধু কুন্তলের খবর দেবে, নয়ত—

দরজার সামনে থেকে কে বলে উঠল, "কি অত ভাবছেন মাথায় হাত দিয়ে?"

ভয়ানক রকম চমকে উঠে ডাক দিলাম—"এস এস, তোমার কথাই ভাবছিলাম।"

ঘরের ভেতরে পা দিয়ে সিধু বলল—"ভাববেন বৈকি। যত ভাববেন ততই সব পরিষ্কার হোয়ে যাবে। ইতিমধ্যে বদনবাবু যদি এসে গিয়ে থাকেন আপনার কাছে, তা'হলে আমার কথা ভাবতেই হবে আপনাকে। কি বলে গেলেন আপনাকে মাতুল? এক চিঠি ঝাড়বার ফলে মাতুলের পিলে চমকে গেছে। এবার ঘুঘু ফাঁদে পা দেবে। অগাধ জলের মাছ, সহজে ঘাই মারে না! দেখা যাক এবার কি চাল চালেন।"

"ঐ চিঠিখানা কারা লিখেছে বদনবাবুকে?" খুবই গম্ভীর সুরে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"কারা আবার লিখবে, আমিই লিখিয়েছি।" সিধু খুবই ফুর্তিসে বলতে লাগল—"আমিই যে পাঠাচ্ছি চিঠিখানা, সে সংবাদও ওঁকে কায়দা করে জানিয়ে দেওয়া হোয়েছে। ভ্যাবলাকে চেনেন তো? নৃসিংহ পণ্ডিতের ভাইপো ভ্যাবলা? ভ্যাবলা শেষ পর্যন্ত ছিঁচকে চোর হোয়ে উঠেছে। বাজারে ঘুরে বেড়ায়, সুবিধে পেলেই একটা আলু দুটো পটল বা দুটো বেগুন ছো মেরে নিয়ে সরে পড়ে। সেই ভ্যাবলাকে গণ্ডা আষ্টেক পয়সা দিয়ে বললাম, চিঠিখানা কুন্তলের মামার হাতে দিয়ে আসতে হবে। বেশ করে সাবধান করে দিলাম কিছুতেই যেন সে আমার নামটা না বলে। ঐ মানা করে দেওয়ার মানে হোল ভ্যাবলা ঠিকই আমার নামটা মাতুলকে জানিয়ে দিয়ে আরও গণ্ডা আষ্টেক পয়সা রোজগার করবে। ঠিক তাই হোয়েছে, মাতুল ছুটে এসেছেন আপনার কাছে। জানেন যে আপনি আমাকে স্নেহ করেন।"

"কিন্তু ঐ চিঠি লেখার উদ্দেশ্য কি? ঐ রকম চিঠি লেখা কিছুতেই উচিৎ নয়। ঐ চিঠি যদি উনি থানায় দাখিল করেন তা'হলে—।"

"করুন না। থানায় যাবার মত বুকের পাটা ওঁর আছে বলে আপনি মনে করেন নাকি? বেসামাল হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। কি কি বলে গেলেন আপনাকে?"

"বলে গেলেন যে তোমরাই কুন্তলকে লুকিয়ে রেখেছ বা সরিয়ে দিয়েছ। কারণ, কুন্তল অনেক কিছু জানে। এমন অনেক কিছু জানে যার দরুণ তার দিদির আত্মহত্যার কারণটা স্পষ্ট জানা যাবে।"

"তা না হয় জানল কুন্তল, কিন্তু আমরা তাকে সরিয়ে দেব কেন? আমাদের স্বার্থ?"

"তোমরা চাওনা কুন্তলের দিদির আত্মহত্যার কারণটা প্রকাশ হয়ে যাক। কোন একটা কলেজের মেয়ের মুখে তোমরা অ্যাসিড বালব্ ছুঁড়ে মেরেছিলে। কুন্তলের দিদির আত্মহত্যার ব্যাপারটার সঙ্গে তোমরাও জড়িত আছো। অনেক কথাই বলে গেলেন ভদ্রলোক। এখন আমি ভাবছি কি জান সিধু, আমি আর এ ব্যাপারটার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ রাখব না। ভারী বিশ্রী লাগছে। তোমাকে আমি ভালবাসি স্নেহ করি বিশ্বাসও করি। কাল সেই ব্যাঙকে ঠেঙানো, আজ আবার বদনবাবুকে ঐ চিঠি দেওয়া"—বলতে বলতে আমি থেমে গেলাম। আর বেশী কিছু বলতে প্রবৃত্তি হোল না।

মিনিট তিন চার সিধু মুখ টিপে অন্য দিয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর মুখ ফিরিয়ে খুবই অনুনয় করে বললে—"ঐ বিশ্বাসটুকু আর দুটো দিন বজায় রাখতে পারেন না? ব্যাঙকে ঠেঙানো, বদনবাবুকে চিঠি দেওয়া, সবই অন্যায় কাজ হয়েছে। কিন্তু করা যাবে কি? যে বিয়ের যে মন্ত্র, বজ্জাতের অকাজ কুকাজ না করতে পারলে ধেড়েল-দের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যায় না। কলেজের মেয়েটা কোথায় থাকে, কে তার মুখ পুড়িয়েছে, কেন পুড়িয়েছে, সবই জানতে পারবেন। আর দুটো দিন আমার ওপর বিশ্বাসটা বজায় রাখুন। আসল ব্যাপারটা যদি জানতে চান, আর দুটো দিন আমাদের সঙ্গে থাকতে

হবে আপনাকে। আমি যে আপনাকে বিশ্বাস করি তার প্রমাণ আজই পাবেন। বেলা তিনটের সময় এসে আপনাকে নিয়ে যাব এক জায়গায়। কুন্তলকে দেখে আসবেন, তার সঙ্গে কথা বলে আসবেন। যদি মনে করেন তাকে ধরিয়ে দেওয়া উচিৎ, তাও করতে পারবেন। আমি তো আপনাকে বিশ্বাস করেই কুন্তলের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। যদি তাকে বাচাতে হয় তা'হলে লুকিয়ে রাখতে হবেই।"

বোবা হোয়ে গেলাম আমি। কুন্তলকে সিধু লুকিয়ে রেখেছে!

সিধু বলল—"এখন চলি। অনেক কাজ, চারিদিকে নজর রাখতে হচ্ছে। ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া হয়েছে। খাওয়া দাওয়ার পরে ঘুমিয়ে নিন একটু, হয়তো সারারাত জেগে থাকতে হবে। তিনটের আগেই আমি আসব।"

জের মিটল না কিছুতেই। চক্ষু রক্তবর্ণ করে আমার মন-বুদ্ধিকে শাসন করতে গেলাম, মন বুদ্ধি বিকট মুখ করে আমাকে ভেংচাতে লাগল। বার বার নিজেকে নিজে বোঝালাম—তুমি বাপু খাঁটি থার্ড পার্স্‌ন্‌ সিংগুল্যার্‌ নাম্বার্‌ নমিন্যাটিভ্‌ কেস্‌। আগে ছিলে ভবঘুরে এখন ঘরে বসে গল্পের বই লিখে পেট চালাও, কোন্‌ গরজ পড়েছে তোমার মারপিট আত্মহত্যা ইত্যাদি সংসারী জীবেদের ধুন্ধুমার কাণ্ড কারখানার ভেতর নাক গলাবার? এখনও সময় আছে, এই বেলা কেটে পড়। কেটে না পড়লে জাল ছাড়িয়ে পালিয়ে আসতে পারবে না। বোঝানো ভয় দেখানো অনুনয় বিনয় সবই ভস্মে ঘি ঢালা হল। রঘুদয়ালবাবু ছেলের জন্যে যে বিজ্ঞাপনটি ছাপিয়েছেন কাগজে সেই বিজ্ঞাপনের ভাষা আমার বুকের মধ্যে অবিরাম ককিয়ে ককিয়ে কাঁদতে লাগল। স্পষ্ট শুনতে লাগলাম—বাবা কুন্তল, ফিরে আয়। তোর মা মৃত্যুশয্যায়। কোথায় আছিস জানা।—কুন্তল যেখানে আছে সেখানে আমাকে নিয়ে যাবে সিধু, কুন্তলকে দেখে আসব, তার সঙ্গে কথা বলে আসব। তারপর

কুন্তলের হতভাগা বাপকে আর পোড়াকপালী মাকে গিয়ে বলতে পারব যে ছেলে তাদের বেঁচে আছে, আমি স্বচক্ষে তাকে দেখে এসেছি, সে ফিরে আসবে। তবে দেরি হবে। দেরি হবার কারণটাও বলব। কেন তাদের মেয়ে আত্মহত্যা করেছে জানা দরকার। যারা তার ঐ আত্মহত্যা করার জন্যে দায়ী তাদের শাস্তি হওয়া চাই। কুন্তলকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে কারণ কুন্তল জানে তার দিদি কেন আত্মহত্যা করেছে। ঐ রহস্যটি পরিষ্কার হলেই কুন্তল ফিরে আসবে। নয়ত কুন্তলেরও বিপদ ঘটতে পারে।

কেন কুন্তল লুকিয়ে আছে বা কেন তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা কিন্তু বলেনি আমাকে সিধু। না বলুক, ওটা আমি অর্থাৎ আমার মন বুদ্ধি আঁচ করে ফেলেছে। সব কিছু কি আর খোলাখুলি বলা লাগে। অনেক কিছু আঁচ করে নিয়ে তৈরী হয়ে বসে রইলাম। তিনটের আগেই সিধু আসবে। তার সঙ্গে গিয়ে কুন্তলকে দেখে আসব। ঐ পর্যন্তই, তার পরে এই রহস্যময় কাণ্ডকারখানার সঙ্গে আর কোনও সম্বন্ধ রাখব না। এখন মানুষ হামেশা আত্মহত্যা করছে। কোন্ আত্মহত্যাটির অন্তরালে কি রহস্য লুকানো আছে তা নিয়ে কে মাথা ঘামাতে যায়।

তিনটে বেজে গেল। তিনটের পর যথাসময়ে চারটেও বাজল। সিধু এল না। কেন এল না আঁচ করতে গিয়ে নিজের মনের আঁচেই জ্বলে মরতে লাগলাম। স্রেফ ধাপ্পা দিয়েছে আমাকে সিধু। যুগটাই হচ্ছে ধাপ্পা দেওয়ার যুগ। সিধু যুগধর্মই পালন করেছে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা কানাকড়ির মূল্য দেয় না আমাদের। তিন কুড়ি বছর ঠায় বেঁচে থাকার খেসারত দিচ্ছি এখন আমরা। যেচে মান কেঁদে সোহাগ আদায় করার চেষ্টা করছি। আজকালকার এরা বাঁচতে জানে, মরার প্রয়োজন হলে মরতেও জানে। আমাদের মরা বাঁচার সঙ্গে এদের বাঁচা মরার আকাশ পাতাল ফরক। কোন্ অধিকারে এদের বাঁচা মরা নিয়ে মাথা ঘামাবার সাহস করি।

আমাকে ধাপ্পা দিয়ে বাঁদর নাচ নাচাচ্ছে সিধু, বেশ করছে। ঘেন্না ধরে গেল নিজের ওপর। নিস্ফল আক্রোশে দগ্ধে মরা ছাড়া কিছুই আর করার নেই। সামান্য একটু সান্ত্বনা পেলাম বদনবাবুর সেই সাংঘাতিক কথাটা মনে পড়ার দরুণ। বলে গেলেন বদনবাবু, খামকা তিনি কারও অনিষ্ট করেন না, কিন্তু লেজে পা পড়লে ছোবলাতে ছাড়বেন না। হলেনই বা বদনবাবু বিষহীন ঢোঁড়া, তবু ছোবলটা তো দিয়ে ছাড়বেন। আমার যে সে সামার্থ্যটুকুও নেই।

সন্ধ্যা হয়ে এল। আলো না জ্বেলে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে বসে রইলাম। কুন্তলের কথা একটিবার মনের কোনেও উদয় হল না। কে কুন্তল? কি সম্পর্ক আমার রঘুদয়ালের ছেলে মেয়ের সঙ্গে? নিছক পর। ওদের ভালো করাও যায় না মন্দ করাও যায় না। শুধু শুধু নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা-ভঙ্গ করার চেষ্টা করছি। আর না, এইবার মানে মানে দরজা বন্ধ করে আত্মরক্ষা করতে হবে।

দরজা বন্ধ করার কথাটা মনে উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন দরজা পেরিয়ে ঘরের মধ্যে পা দিলে! চৌকির সামনে পৌঁছে চাপা গলায় বললে—"শিগ্গির আসুন আমার সঙ্গে, সিধু দা আপনাকে নিতে পাঠালেন।"

পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত বিদ্যুৎ খেলে গেল। ধড়ফড় করে নেমে পড়লাম চৌকি থেকে। জিজ্ঞাসা করলাম—"সিধু কোথায়?"

"লুকিয়ে রেখেছি আমি, মাথা ফেটে গেছে সিধুদার। এতক্ষণ পরে জ্ঞান হল। জ্ঞান হতেই বললেন, আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে। এখুনিই কুন্তলকে সরিয়ে ফেলতে হবে। নয়তো কুন্তলকে ওরা শেষ করে ফেলবে।"

"কুন্তল কোথায়?"

"তা আমি জানব কেমন করে। আসুন আমার সঙ্গে, এক মিনিট দেরি করা উচিৎ নয়।"

চললাম। কার সঙ্গে যাচ্ছি কোথায় যাচ্ছি, বিপদে পড়তে যাচ্ছি কিনা, এ সব প্রশ্ন যখন গজিয়ে উঠল মগজের মধ্যে তখন আমাদের ট্যাক্সিখানা হু হু করে ছুটে চলেছে। যার পাশে বসে চলেছি তার পানে তাকিয়ে এতক্ষণ পরে খেয়াল হল যে সে আমার স্বজাতি পর্যন্ত নয়। কপালের নিচে পর্যন্ত ঘোমটা টেনে সিল্কের চাদর জড়িয়ে বসে আছে সে গাড়ির কোনে মুখ লুকিয়ে। বুকের মধ্যে হাঁতুড়ি পিটতে লাগল। কি করে বসলাম হঠাৎ! যার সঙ্গে যাচ্ছি সে সাক্ষাৎ দুশমন। এদের জাতকে কি বিশ্বাস করতে আছে!

ট্যাক্সিওয়ালাকে থামিয়ে নেমে গেল কেমন হয়! যদি চেঁচামেচি করে লোক জমা করে! কিছুই অসাধ্য নয় ওজাতের কাছে। এগার হাত কাপড় পরেও যারা মুক্তকচ্ছ তারা পারেনা কি!

দস্তুরমত ঘেমে উঠলাম। ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া করবার কিছুই নেই। নিজের গালে ঠাস ঠাস করে চড়াতে ইচ্ছে হল। বাড়ি থেকে বেরুবার আগে কেন খেয়াল হল না যে কার সঙ্গে যাচ্ছি।

হঠাৎ সে বলে উঠল, "রোখকে রোখকে, ঐ আটাকলকা সামনে রোখনে হোগা।"

থামল গাড়ী। নেমে পড়তে হোল। চক্ষের নিমেষে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বলল—"আসুন, ঐ গলির ভেতর যেতে হবে। যদি কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে বলবেন, আমি আপনার নাতনী। আমার নামটা শুনে রাখুন—হিমানী। হিমু বলে ডাকবেন আমাকে, কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারবে না।"

হিমানী! কোথায় যেন শুনেছিলাম নামটা।

টপ করে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম—"তুমি কি সেই ব্যাঙের বউ? ব্যাঙের আসল নামটাও ছাই জানি না আমি। সিধুরা তাকে ব্যাঙ বলেই ডাকে।"

"আসল নাম হচ্ছে নায়ক মান্না। নায়িকা বানাবার জন্যে তিনিই

আমাকে বিয়ে করেছেন ; নায়িকা হোতে পারলাম না বলে বাদও দিয়েছেন আমাকে। থাকুক এখন এসব আলাপ, চলুন তাড়াতাড়ি, সিধুদাকে একলা ফেলে গেছি ঘরে। ভয়ের অবশ্য কারণ নেই, ছটা গুলি ভরতি একটা পিস্তল সিধুদার হাতে দিয়ে এসেছি।"

ফিসফিস করে ঐ কথাগুলো শোনাতে শোনাতে হিমানী আমার সামনে সামনে চলল। মিনিট দু'তিন চলবার পরে দাঁড়িয়ে পড়ল ডান ধারের একটা দরজার সামনে। দরজায় তালা ঝুলছে। আঁচলে বাঁধা চাবি দিয়ে তালা খুলে ভেতরে ঢুকল। আর একবার আমার বুকের ভেতরে হাতুড়ির ঘা পড়ছে শুনতে পেলাম। গ্রাহ্য করলাম না। সত্ত পাওয়া নাতনীর পিছু পিছু দরজা পার হয়ে গেলাম।

অন্ধকার।

অন্ধকারেই নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিল হিমানী। একটা টর্চ জ্বেলে পথ দেখিয়ে চলতে লাগল আমার সামনে সামনে। আদ্যিকালের বাড়ি, টর্চের আলোয় যেটুকু দেখতে পেলাম তাতে মনে হল বহুকাল ওবাড়িতে কেউ বাস করে না। ইট বার করা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম। টানা বারান্দা, মেঝের সিমেন্ট উঠে গেছে। বকবকুম বুমবকুম বকুম এক সঙ্গে অনেকগুলো পায়রা ঘুম ভাঙাবার দরুণ বকাবকি জুড়ে দিলে। ওপর দিকে ছাদের তলায় কোথায় তারা বসে আছে দেখতে পেলাম না। খানিকটা যাবার পর একটা দরজার সামনে থামল হিমানী। সে দরজাতেও তালা ঝুলছে। আবার সেই আঁচলে বাধা চাবি দিয়ে তালা খুলল। দরজার ভেতরে পা দিয়েই ডাক দিল—"সিধুদা, আমি হিমু। নিয়ে এসেছি তাঁকে।"

"তাড়াতাড়ি এসে পড়েছিস তো।" অন্ধকারের ভেতর থেকে জবাব এল।

সিধুর গলা! আর একটু হোলেই চেঁচিয়ে উঠতাম। সিধু

বললে—"একটা বাতি জ্বালা হিমু। ব্যাণ্ডেজটা বোধহয় সরে গেছে রে, মনে হচ্ছে রক্ত বন্ধ হয় নি এখনও। দেশলাইটা কোথায় গেল যেন।"

টর্চের আলো তখন পড়েছে সিধুর গায়ে। ঘরটার শেষ দিকের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মেঝেয় বসে আছে সিধু। ছুটে গিয়ে ওর সামনে বসে পড়লাম উবু হোয়ে। ওর একটা হাত ধরে ফেলে কোনও রকমে বলতে পারলাম—"কি করে এমন হল ?"

পেছন থেকে লোহার রড ঝেড়েছে। নিরুত্তাপ নির্লিপ্ত সুরে সিধু বলে গেল,—"বুঝতে পারিনি এতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে ওরা। সম্ভবই ঐ রকম, একটা অন্যায়কে সামলাবার জন্যে লোকে দশটা অন্যায় করে ফেলে। একটা মিথ্যে কথা দশটা মিথ্যে কথার জন্ম দেয়। যাক, হিমু যে আপনাকে এনে ফেলতে পারবে এটা আমি আশা করিনি। কুন্তলটা এখন আছে যেখানে সেখান থেকে তাকে সরিয়ে ফেলতে হবে। তাড় তাড়ি সরানো চাই। কোথায় তাকে লুকিয়ে রাখা যায় বলুন তো ? বুকের পাটা আছে এমন লোকের কাছে রাখতে হবে।"

"এখন কোথায় আছে কুন্তল ?" জানতে চাইলাম।

"আছে কলকাতার বাইরে গঙ্গার ওপারে। ভাল জায়গাতেই আছে। কিন্তু সেটা সন্ন্যাসীর আশ্রম। যদি কিছু ঘটে, সাধুরা কুন্তলের জন্যে লড়াই করতে যাবেন না। এমন একটা জায়গা আমি চাইছি, যেখানে হামলা করতে ওরা সাহস করবে না। যদি সাহস করে কিছু খুন জখম হবে, কিন্তু কুন্তলকে ছিনিয়ে আনতে পারবে না। বহু লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে আপনার, দেখুন না একটু ভেবে।" বলতে বলতে সিধু হাঁপিয়ে উঠল। দুটো মোমবাতি জ্বেলে ওর সামনে বসিয়ে দিলে হিমু। সেই আলোয় দেখা গেল, মাথায় যে কাপড়টা জড়ানো সেটা লাল হয়ে উঠেছে। দেখে আঁতকে উঠল হিমু—"সমানে রক্ত বেরচ্ছে যে এখনও, কি হবে ?"

সিধু ধমকে উঠল—"কিছুই হবে না, চেঁচামেচি করিস নে। আর ঘণ্টা দু'য়েক পরে আমরা পালাব—এখান থেকে। তখন যা হোক একটা ব্যবস্থা হবেই। এখন এই ব্যাণ্ডেজটা বদলাতে হবে। কিন্তু ন্যাকড়াই বা পাওয়া যাবে কোথায় এখন। যেমন আছে থাকুক, আগে কুন্তলের একটা ব্যবস্থা করি তবে অন্য কথা। কই, কিছু বলছেন না যে? কোথায় রাখা যায় কুন্তলকে একটু ভেবে বলুন না।"

ততক্ষণে আমি উঠে দাঁড়িয়ে আমার কোঁচাটা খুলে ফেলেছি। বললাম—"ওটা তুমি আমার ওপরে ছেড়ে দাও, ঠিক জায়গায় নিয়ে যাব কুন্তলকে। কিন্তু আগে তোমার ব্যাণ্ডেজটা বদ'লে দি। আমার কাপড়ের আধখানা ছিঁড়ে দিচ্ছি। খানিকটা তুলো চাই। তুলো পাওয়া যাবে এখানে?"

ফ্যাঁস করে একটা শব্দ হল। হিমু তার সিল্কের চাদরখানা লম্বালম্বি ছিঁড়ে ফেলল। বলল—"ছিঁড়তে হবে না আপনার কাপড়। এই চাদর দিয়ে দু'বার বাঁধা যাবে। তুলো ফুলো কিছুই নেই। আপনাকে নিয়ে এলাম, সেই, সময় খানিকটা তুলোও আনতে পারতাম। একটা কিছু ওষুধও আনা যেত। কিছুই মনে পড়ল না। মনে করেছিলাম রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে।"

সিধু বললে—"ডাক্তারখানায় ট্যাক্সি থামিয়ে ওষুধ তুলো কেনবার দুর্বুদ্ধি যে উদয় হয়নি তোর মগজে এজন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ। ভালয় ভালয় যে ফিরে আসতে পেরেছিস এই যথেষ্ট। নে, এখন ব্যাণ্ডেজটা বদলে দে। শক্ত করে পেঁচিয়ে বাঁধবি। তা'হলে রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

হিমুর সঙ্গে আমিও হাত লাগালাম। হাত ছয়েক লম্বা হাত দু'য়েক চওড়া সিল্কের কাপড়টাকে চার পাট করে আধ হাত চওড়ায় দাঁড় করান হোল। সেই রক্তে ভেজা কাপড়টাকে খুলে ফেলে দেখি মাথার পেছনে তিন ইঞ্চি ফাঁক হয়ে গেছে। ভেতরে আঙুল দিয়ে

বুঝতে পারলাম চামড়াই কেটে গেছে, খুলি ভাঙেনি। প্রথমে খানিকটা কাপড় সেই ফাঁকের মুখে চেপে বসিয়ে দিলাম, তারপর পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা হোল বাকী কাপড়টা। দেখে সন্তুষ্ট হোল হিমু। বললে—"এই রকম করে যদি বাঁধতে পারতাম আমি, তা'হলে রক্ত বেরুত না। তখন এত রক্ত বেরুচ্ছিল যে দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। তবু রক্ষে যে সিধুদা মাথা চেপে ধরে ছুটতে ছুটতে আমার কাছে পৌঁছতে পেরেছিলেন।"

"ঐটুকু বুদ্ধি চট করে আমার ভাঙা মাথায় ঢুকে পড়েছিল।" অপরিসীম যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে বলল সিধু—"বেড়ার ঘরে সেঁড়ার বউয়ের কাছে দৌড়ে যাব আমি, এটা ওরা ভাবতেই পারবে না। ঐ ভাবে যারা পেছন থেকে ডাণ্ডা ঝাড়ে মাথায় তারা কাজটি সুসম্পন্ন করেই পালায়। কাজের ফলটা কি দাঁড়াল ফিরেও দেখে না। সেই সুযোগটাই আমি নিলাম। রেলিঙ টপকে পার্কের ভেতর পড়লাম। এক দৌড়ে পার্কটা পার হয়ে আবার রেলিঙ টপকে পার্ক থেকে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর আর আমায় পায় কে। রুমালটা মাথার পেছনে চেপে ধরে দে ছুট। রাস্তায় এমন ভিড় যে কেউ কারও দিকে ফিরে তাকাতে পারে না। ডাণ্ডা খেয়ে যদি ঘুরে পড়তাম সেখানে তা'হলে কি আর রক্ষে ছিল। পুলিশ হাসপাতাল, কেলেঙ্কারির একশেষ হোত। এধারে এরা কুন্তলটাকে" —বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল সিধু। সঙ্গে সঙ্গে মোম দুটো নিভিয়ে দিলে ফুঁ দিয়ে। ফিসফিস করে বললে— "কিসের শব্দ হচ্ছে যেন!"

নীরন্ধ্র অন্ধকারে দম আটকে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলাম। হ্যাঁ, শব্দ হচ্ছে। স্পষ্ট শুনতে পেলাম নিচের তলায় কারা যেন চলাফেরা করছে। আমার কানের সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে সিধু বলল—"চলে আসুন আমার জামা ধরে, শব্দ যেন না হয়। ওরা এসে গেছে। নিচের তলার ঘরগুলো দেখে ওপরে উঠে আসবে। ভয় নেই, ছটা

গুলি ভরা আছে পিস্তলে। ভাগ্যে পিস্তলটা বেঙা রেখে গিয়েছিল হিমানীর কাছে।"

হিমানীও আমার একটা হাত ধরে বললে—"চলুন।"

চলতে শুরু করলাম। এক হাতে ধরে আছি সিধুর সার্টের পেছনটা, আর একটা হাত হিমানী ধরে আছে। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় পা দেবার পর সিধু বলল—"আপনারা দু'জনে ছাদের ঐ পাঁচিলটার আড়ালে লুকিয়ে থাকুন গে। 'হিমু টর্চটা আমার হাতে দিয়ে যা। যতক্ষণ না আমি ডাকব ওখান থেকে নড়বি না।"

যথা আজ্ঞা। হিমানী আমার হাত ছাড়ল না। বারান্দা পার হয়ে খোলা আকাশের তলায় কোমর সমান উঁচু একটা পাঁচিলের পাশে গিয়ে গুঁড়ি মেরে বসে পড়লাম আমরা। সিধু বারান্দার অন্ধকার মিলিয়ে গেল।

তারপর সেই রাত্রে সেই ভাঙা বাড়িতে কি কি ঘটেছিল, সব গুছিয়ে বলা সত্যিই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কতকটা বেহুঁশ অবস্থায় অনেক কিছুই শুনলাম, অনেক কাণ্ডই করলাম অন্ধকারে প্রায় কিছুই দেখতে পেলাম না। খুব বেশী ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম এ কথা বললে ষোল আনা সত্যি কথা বলা হবে না। মন প্রাণ বুদ্ধি কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়েছিলাম নিজেকে, এই কথাটা বললেই খাঁটি কথা বলা হবে। ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেবার পরেও কান দুটো আমার ভয়ানক রকম সজাগ হয়ে ছিল। তাই খানিকক্ষণ পরে সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম। নিচের কাজ শেষ করে তারা ওপরে উঠে এল। আমার একটা হাত খামচে ধরে ছিল হিমানী, বুঝতে পারলাম ও কঁপছে। কাঁপুক, সেদিকে মন দেবার অবস্থা নেই আমার তখন। ওরা ওধারে কি করছে তাই কান পেতে বোঝবার চেষ্টা করছি। একে একে প্রত্যেকটা ঘরের তালা নেড়ে দেখছে তারা। পৌঁছে গেল সেই ঘরটার সামনে যে ঘরে আমরা ছিলাম। এতক্ষণ পরে

শুনতে পেলাম মানুষের গলা—এ ঘরটা খোলা কেন? চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল কে। আর একজন বললে—হুঁশিয়ার পেস্তা, শালা রামখচ্চর, মরণ কামড় ঝাড়বে। ফিসফিস করে আরও কয়েকটা কথাবার্তা হল, সব বুঝতে পারলাম না। তারপর বুঝতে পারলাম তারা ঘরের ভেতর ঢুকল। একটু পরেই দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল তুমুল কাণ্ড। দুম দাম ঘা পড়তে লাগল কপাটের গায়ে, চিৎকার গালাগালি শাসনি আরও অনেক কিছু চলতে লাগল ঘরের মধ্যে। ছায়ার মত নিঃশব্দে আমাদের পেছনে এসে উপস্থিত হল সিধু। আমরা উঠে দাঁড়ালাম। কোনও কথা নয়, আমার একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল সিধু সেই ছাদটার শেষ দিকে। আর একখানা হাত হিমানী ধরে আছে, তাই সেও চলল। ছাদের কিনারায় পৌছে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। ঠিক চার হাত নীচে টিনের চালের মত কিছু একটা রয়েছে। আলসে ধরে ঝুলে সেই চালের ওপর নেমে পড়তে হবে।

আকাশের তারার আলোয় সবই আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছি তখন। দেখলাম, আমার হাত ছেড়ে দিয়ে হিমানী আলসের কিনারায় বসে পড়ল। পরমুহূর্তে টুপ করে নেমে গেল টিনের চালের ওপর। আমার কানের ওপর মুখ দিয়ে সিধু বলল—"নামুন শিগগির, হিম পারল আর আপনি পারবেন না?" পারব নিশ্চয়ই, পারতেই হবে। তবে হিমুর বয়েস আমার বয়েসের অর্ধেকেরও অনেক কম। যাই হোক, পারলাম ঠিকই, কয়েক মুহূর্ত পরেই বুঝতে পারলাম, হিমুর পাশে বসে পড়েছি। চালটা গড়ানে, হিমু যদি ধরে না ফেলত তাহলে সেই গড়ানে চালের ওপর নিজেকে আটকাতে পারতাম না। সিধুও নেমে এল। তারপর হুস হুস করে হড়কে বা পিছলে নেমে গেলাম আমরা চালের কিনারায়। সেখানেও আটকে গেলাম না, চার পাঁচ হাত নীচে ধরণীর ওপর খসে পড়লাম। কোমরটা টনটন

করে উঠল। কিন্তু সেদিকে মন দেবার সময় কই। ওরা দু'জনে আমার দু'হাত ধরে টেনে খাড়া করলে। তারপর ওদের টানের চোটেই চোখ বুঁজে চলতে লাগলাম। চোখ মেলে থাকলেও কোনও ফল হোত না। এমন অন্ধকার যে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি ন।

একটু পরে সিধু জিজ্ঞাসা করলে—"এই গলিটা কোথায় শেষ হয়েছে রে হিমু? তুই তো এ পাড়ার মেয়ে, কোথায় গিয়ে পৌঁছব আমরা বলতে পারিস?"

হিমু বলল—"এটা গলি নয়, দুটো বাড়ির মাঝখানের একটা ড্রেন। মনে হচ্ছে আমরা বাজারের পেছনে গিয়ে উঠব। মাছের বাজারের শেষ দিকে কতকগুলো ভিখিরী আস্তানা গেড়েছে, সেখানে যদি পৌঁছতে পারি—"

সিধু বাকী কথাটা শেষ করে দিলে—"একদম নিশ্চিন্ত, আমাদেরও এখন অনেকটা ভিখিরীর মত দেখাচ্ছে হয়েছে, দিব্যি মিশে যাব ওদের সঙ্গে। তারপর একে একে সটকাতে হবে।"

রাত তখন অনেক

হাওড়া থেকে একখানা প্রাইভেট ট্যাক্সি চেপে আশ্রমের সামনে পৌঁছলাম যখন তখন সন্ন্যাসী মহারাজরা নিদ্রা সাধনা করছেন। চেষ্টা চরিত্র করে তাদের ধ্যান ভাঙাতে হোল। সিধুর চিঠিখানি দিলাম তাদের, তারা পরামর্শ করতে বসে গেলেন। ভোর নাগাদ পরামর্শ শেষ করে রায় দান করলেন, দেবেন তাঁরা কুন্তলকে আমার হাতে, কিন্তু সাধু একজন আমাদের সঙ্গে যাবেন। উদ্দেশ্য হল সিধুর সঙ্গে দেখা করে তাকে বলে আসা যে কুন্তলের দায় থেকে তাঁরা নিষ্কৃতি পেলেন।

"তথাস্তু। তা'হলে এখন কুন্তলকে ডাকা হোক। অন্ধকার থাকতে রওয়ানা হওয়া চাই।"

একজন সাধু ডেকে আনতে গেলেন কুন্তলকে। ঘুমচ্ছে সে, তখনও পর্যন্ত জানে না যে একজন তাকে নিয়ে যেতে এসেছে।

মুখিয়ে বসে বইলাম আমি। কুন্তল আসছে, এইবার দেখতে পাব কুন্তলকে। পাডাব ছেলে, দেখেছি নিশ্চয়ই বহুবাব। পাড়াসুদ্ধ ছেলে ছোকবাকে চিনি, তবে সবাযেব নাম জানি না। ঝুন্তু অনেকবাব এসেছে আমাব কাছে। মেযেটা সত্যিই ভাল ছিল। মেয়েটা কোন দুঃখে যে আত্মহত্যা কবতে গেল। কুন্তলকে জিজ্ঞাসা কবব, কেন তাব দিদি গলায ফাঁস লাগিযে নল। কেউ কুন্তলেব ত্রিসীমানায যেতে পাববে না। সে ব্যবস্থা কবব আমি। আমাব বন্ধু হববোলা পত্রিকাব মালিক হৃতাপ্ত বনাব সাক্ষাৎ খুড়ো। গণ্ডা গণ্ডা মন্ত্রী উপমন্ত্রী জজ ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ সাহেব, এমন কি দিল্লীব বাঘা বাঘা ভি আই পি সাহেববাও তাকে খাতিব কবে। তাব কাছে লুকিয়ে বাখব কুন্তলকে, যাবা ওকে খতম কবতে চায়, লড়তে হবে তাদেব হৃতাপ্ত খুড়োব সঙ্গে। কিন্তু তাব আগে, কুন্তলকে উপযুক্ত জায়গায় লুকিযে বাখাব সামর্থ্য আমাব আছে কি না।

এত দেবি হচ্ছে কেন। ভোব হযে এল, ফবসা হবাব আগেই কুন্তলকে যথাস্থানে জমা দিতে পাবলে বাচা যেত। আচ্ছা ঘুমতে পাবে কেমন ছোকবা।

আকাশ ভেঙে পডল মাথায। সবকজন সাধু পাগলেব মত দৌডাদৌডি কবতে লাগলেন। কুন্তলকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কোথায শুযেছিল কুন্তল সাধুবা আমাকে দেখালেন। একটা ঘবে চাবখানা চৌকি, তিনখানায তিনজন ব্রহ্মচাবী ছিলেন আব একখানায কুন্তল শুযেছিল। বাত চাবটেব সময় ব্রহ্মচাবীবা শয্যা ত্যাগ কবে ধ্যান লাগাতে যান ঠাকুব ঘবে। কুন্তল ব্রহ্মচাবী নয় তাই সে পবে ওঠে। সেদিনও তাই হয়েছিল, ব্রহ্মচাবীবা যথাসময়ে সাধনা করতে গিয়েছিলেন। মশাবি ফেলা ছিল কুন্তলের বিছানায়,

তাঁরা বলতে পারলেন না তখন কুন্তল বিছানায় ছিল কিনা। কুন্তলকে যিনি ডাকতে আসেন সেই সাধুটি প্রথম জানতে পারেন যে মশারির মধ্যে কুন্তল নেই। তখুনি খোঁজাখুঁজি শুরু হয়।

সাধুরা বললেন, কোন কোন দিন ভোর বেলা একটু বেড়িয়ে আসে কুন্তল। তারপর সারা দিন রাত কোথাও যায় না। আরও এক ঘণ্টা বসে রইলাম আমি। শেষে আশা ছেড়ে দিয়ে ফিরে চললাম। শরীর আর বইছে না তখন। সারাটা রাত যে কাণ্ড করা গেল তাতে একটা জোয়ানমদ্দও ঘায়েল হয়ে পড়ত। কোনও রকমে আস্তানায় পৌঁছে শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচি। মগজটাও যেন জামড়া মেরে গিয়েছে। একটা কথাই বার বার পাক খাচ্ছে মগজের মধ্যে যে কুন্তল নেই, কোনও দিন আর কুন্তলকে পাওয়া যাবে না। সংবাদটা সিধুকে জানিয়েও আমার ছুটি। এরপর আমার পক্ষে আর এই দিগদারি ভোগ সম্ভব নয়।

কোথায় পাওয়া যাবে এখন সিধুকে।

ওদের দুজনকে সেই ভিখিরীর আড্ডায় রেখে কুন্তলের খোঁজে এসেছিলাম আমি। সিধু বলেছিল, ঠিক সময়ে সে আমার সঙ্গে দেখা করবে। সেই ঠিক সময়টা যে কখন আসবে কে জানে। চুপচাপ বসে থাকতে হবে, তা ছাড়া করবই বা কি! কোথায় খুঁজে বেড়াব সিধুকে। হিমানীর বাড়িতেই খুব সম্ভব গেছে সিধু, সেই অবস্থায় ফাটা মাথা নিয়ে আর যাবে কোথায়। হিমানীর ঠিকানাও আমি জানি না। জানলেও সেই ব্যাঙচন্দ্রের বাড়িতে যাওয়াটা উচিৎ হবে কিনা কে বলবে। ব্যাঙের আসল নাম নায়ক মান্না, মনে পড়ে গেল। নায়ক মান্নার সঙ্গে সিধুর সাপে নেউলে সম্পর্ক আমি জানি। নায়ক মান্নার পরিবার হিমানী কিন্তু সিধুর ভক্ত। সিধুর জন্যে হাসি মুখে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে সে। স্বচক্ষেই সব দেখে এলাম। হ্যাঁ, মেয়ের মত মেয়ে বটে একখানি, বুকের পাটা আছে বলতে হবে।

ঐ জাতের মেয়ে যদি ঘরে ঘরে থাকত তাহলে বাঙালী জাতটা আজ দাঁড়িয়ে যেত।

এলোমেলো ভাবনা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে কোনও রকমে স্নানটা সেরে শুয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙতে দেখি সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। উৎকট তেষ্টায় ছাতি ফাটবার উপক্রম। শুনলাম, কে একজন বসে আছে দেখা করবার জন্যে। থাকুক বসে, আগে জল খাওয়া তবে অন্য কথা।

জল-টল খেয়ে বাইরে এসে দেখি, ব্যাঙ ওরফে নায়ক মান্না চক্ষু বুঁজে বসে আছে একটা চেয়ারে। আমার সাড়া পেয়ে চোখ মেলল। কিন্তু একটি কথাও বলতে পারলে না। বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখপানে তাকিয়ে রইল। মিনিট দু'য়েক পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মান্না বলল—"আপনার কাছেই এলাম। ওরা পালিয়ে গেছে।"

"কারা?" সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"সিধু মল্লিক আর হিমানী। আমার নজর ছিল বাইরে, নিজের ঘরে কি হচ্ছে জানতে পারিনি। হেরে গেলাম।" হেরে গেলাম কথাটা এমন ভাবে বললে মান্না যে আমার বুকের মধ্যে ছ্যোৎ করে উঠল। একটি কথাও বলতে পারলাম না। তিন হাত সামনে মান্না বুকে থুতনি ঠেকিয়ে পাথরের মত বসে রইল।

অনেকক্ষণ পরে উঠে দাঁড়াল মান্না। দেখলাম ওর ঠোঁট নড়ছে। কি যেন বলবার চেষ্টা করছে, আওয়াজ বেরুচ্ছে না। কথা বলতে বাধ্য হলাম! গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, "হিমানী যে সিধুর সঙ্গে গেছে তার প্রমাণ কি?"

বসে পড়ল আবার মান্না। খুব আস্তে আস্তে থেমে থেমে বলতে লাগল—"আপনি বয়েসে আমার বাবার মত। আপনি আমায় বাঁচিয়েছেন একবার। তাই আপনার কাছে এসেছি। কাল রাত্রে যে বাড়িতে আপনারা ছিলেন, সেটা আমার বাড়ি। ভয়ানক পুরনো

হয়ে গেছে বাড়িটা, তাই আমরা ওটা ছেড়ে দিয়েছি। আমি আর আমার এক বন্ধু, তার নাম পেস্তা, আমরা দু'জনে গিয়েছিলাম ওদের একসঙ্গে ধরবার জন্যে। উল্টে আমরাই ধরা পড়ে গেলাম। সেই ঘরে আপনি যা ফেলে এসেছিলেন—"

"কি ফেলে এসেছিলাম ?" প্রায় আঁৎকে উঠলাম আমি।

"এই ট্রামের টিকিটখানা," বলে পকেট থেকে টিকিটখানা বার করে আমার সামনে ফেলে দিল মান্না। তারপর আবার শুরু করল তার গল্প—"রক্ত মাখা একটা কাপড় পেলাম সেই ঘরে, কাপড়টা যে আমার সেটা বুঝতে পারলাম। কিন্তু রক্ত এল কোথা থেকে। মল্লিক যে মার খেয়ে মাথা ফাটিয়ে গিয়েছিল আমার বাড়িতে, সেটা তখনও জানতে পারিনি আমি। আমার বাড়িতে গিয়েছিল মল্লিক, হিমানীকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে এইটুকুই জানতে পেরেছিলাম। কোথায় যেতে পারে ওরা ? হিমানীর কাছে পুরনো বাড়ির চাবি আছে, আন্দাজ করলাম হয়তো নিরিবিলিতে একটু আমোদ ফুর্তি করবার জন্যে সেইখানেই গেছে। পেস্তাকে ডেকে নিয়ে—"

বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কে মাথা ফাটিয়েছিল তাহলে সিধুর ?"

সেইটুকুই এখনও জানতে বাকী আছে আমারও। এই পাড়ায় ঝুনু বলে একটা মেয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে মরেছে। ঝুনুর এক বন্ধু, তার নাম সেবা সোম, আপনি জানেন তাকে। সেই সেবাকে নিয়েই আমি যাচ্ছিলাম আমার এক বন্ধুর বাড়িতে, আপনি আমাদের ফলো করছিলেন। মল্লিকের সাকরেদরা ঝাপিয়ে পড়ল। আপনি আমাকে তুলে নিয়ে এলেন। কি করে জানবেন আপনি যে সিধু মল্লিকই আমাকে ধোলাই দেবার ব্যবস্থা করে রেখেছিল। অনর্থক মল্লিক শত্রুতা করছে আমার সঙ্গে। তার ধারণা হোয়েছে যে আমিই ঝুনুর আত্মহত্যার জন্যে দায়ী। মল্লিক মনে করে বড় বড় নেতা উপনেতাদের মন ভেজাবার জন্যে আমি তাদের মেয়েমানুষ সাপ্লাই

কবি। এপাড়ার ঝুনুকে নিয়েও ঐ জাতের একটা কিছু করতে চেয়েছিলাম, তাই ঝুনু গলায় দড়ি দিলে। ভুল ধারণা করলে কি বিপদ ঘটতে পাবে দেখুন। মল্লিক আমার পেছনে লেগে রইল। ওধারে ওর শক্ররা ওকে সাবড়ে দেবার জন্যে পাকা ব্যবস্থা করে ফেললে।"

"কারা তারা?" আবার সেই পুরনো প্রশ্ন করতে হোল আমাকে।

মান্না বলল—"বলেছি তো, সেইটুকুই এখনও জানতে পারিনি আমিও। কিন্তু আর তার দরকার নেই।"

"কেন?" এবার বেশ শক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কেন দরকার নেই? যারা ঝুনুকে ঐভাবে মরতে বাধ্য করেছে তারাই সিধুকে সাবড়ে দেবার পাকা ব্যবস্থা করেছিল। তারা কারা জানতেই হবে।"

"কি লাভ? ওরা তো পালিয়ে গেছে।" মান্নায় গলা দিয়ে আবার সেই মর্মভেদী হাহাকার উথলে উঠল—"থাকুক ওরা শান্তিতে। একটা দিনের জন্যে হিমানীকে আমি সুখী করতে পারিনি। এখন যদি সে সুখী হয় তাতে আমি বাধা দিতে যাব কেন? সিধু আর হিমানী, ওরা যে এইটে চাইছিল তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। দুশমনি করছিল সিধু আমার সঙ্গে। আমি জানতাম, চালের মারপ্যাঁচের ওপর আমাদের দুজনের হারজিৎ নির্ভর করছে। আমি এক চাল চাললাম, সিধু উলটো চালে বাজিমাৎ করলে। খেলার নিয়মই তাই, একজন হারবে, একজন জিতবে। কিন্তু এটা কি হোল?"

"কিছুই হয়নি।" ফেটে উঠলাম আমি—"যার যেমন স্বভাব সে সেইরকম ধারণা করে। কোথাও পালায়নি, কার ভয়ে পালাবে সে? কেন পালাবে? তোমার স্ত্রী তাকে বড় ভাইয়ের মত দেখে, হিমানীর মত মেয়ে কোনও অন্যায় কাজ করতে পারে না। যদি তোমার মধ্যে বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকত—"

আরও বহু কথা বলবার ছিল, উত্তেজনার ঠেলায় বাক্‌রোধ হয়ে গেল। নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল মান্না। অনেকক্ষণ পরে খুব আস্তে

হু'বাব উচ্চারণ করল, 'বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব যদি থাকত আমার, বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব যদি থাকত'।

"তা'হলে ওদের খুঁজে বার কবতে। কি জাতের বিপদে পড়তে পারে ওরা—তুমিই সবচেয়ে ভাল করে জান। তুমিই বললে, ভুল ধারণা করে তোমার পেছনে লেগে আছে সিধু, আর ওধারে ওর দুশমনরা ওকে খতম করতে চাইছে। তোমার স্ত্রী হিমানী তাকে বাঁচাবার জন্যে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে, আর তুমি এখানে বসে ছিঁচকাঁদুনেপনা করছ। যারা ওর মাথা ফাটাতে পেরেছে তাদের খপ্পরে যদি আবাব পড়ে থাকে সিধু—"

আর কিছু বলতে হোল না আমাকে, নায়ক মান্না তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। হিস্‌হিস করে বলতে লাগল—'তাই হয়েছে! নিশ্চয়ই তাই হয়েছে! হারামীব বাচ্চা ক্ষেত্তব যদি হাতে পেয়ে থাকে ওদেব! সাফ কবে ফেলব। একদম সাফ হয়ে যাবে যদি হিমানীর গায়ে হাত দিয়ে থাকে।"

চোখ মুখের অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে উঠল মান্নাব। দাঁত বার করা একটা ক্ষুধার্ত নেকড়ে, লাফ দিয়ে পড়ল বুঝি ঘাড়ে। দস্তুরমত ঘাবড়ে গেলাম। মান্না জানতে চাইল, কখন কোথায় আমি সিধুকে আর হিমানীকে শেষবাব দেখেছি। অকপটে সব কথা বলে ফেললাম। সেই ভাঙা বাড়ি থেকে পালাবার পব কোথায় গিয়ে পৌছেছিলাম আমরা, সেখানে কি অবস্থায় ওদের রেখে ঝুনুর ভাইকে আনবার জন্যে কোথায় গিয়েছিলাম সমস্তই বললাম। ঝুনুর ভাইটাকে পাওয়া গেল না। দুশমনরা তাকে পাচার করে ফেলেছে।

"বার করছি পাচার করা। আজ রাতেই এসপার-ওসপার করতে হবে। আগাগোড়া চরম দুশমনি করেছে আমার সঙ্গে মল্লিক। এইবার তার দাম দেব। ওর চরম দুশমন ক্ষেত্তর না আমি, আজ জানতে পারবে। আচ্ছা চলি এখন, যদি বেঁচে ফিরি আবার আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

বলতে বলতে মান্না বেরিয়ে গেল। হাঁ করেছিলাম তাকে ডেকে, ফেরাবার জন্যে। হাঁ বন্ধ করলাম। দরকার কি ফিরিয়ে। যা করতে যাচ্ছে করে আসুক। হ্যাঁ, খুনোখুনি করে খতম হয়ে যাক সবাই। ঐ ব্যাঙা ঐ সিধু ঐ হিমানী ওরা সবাই এক জাতের। পঞ্চাশ ষাট বছর আগে আমরা জন্মেছি, বিশ পঁচিশ ত্রিশ বছর পরে ওরা জন্মেছে। ওদের খুনে আমাদের খুনে আসমান জমীন ফরক। জীবন নিয়ে ওরা জুয়া খেলে, চালের মারপ্যাঁচের ওপর ওদের বাঁচা মরা নির্ভর করে। ওদের নিয়ে স্বপ্ন দেখা সম্ভব নয়, গল্প লেখার বসদ নয় ওদের জীবন, আদিখ্যেতা করার দরুণ ওরা জন্মায়নি। ওরা আমাদের করুণা করে। আহা, বেচারারা পঞ্চাশ ষাট বছর টিঁকে আছে মা ষষ্ঠীর কৃপায়, পঞ্চানন ঠাকুরের দয়ায় আরও কিছুদিন টিকে থাকুক। টিকে থেকে দেখুক, বাঁচার মত বাঁচা কাকে বলে। আমার পড়শী বসুদালের কন্যা ঝুনু গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়ল কেন তাই জানবার জন্যে হাংলাপনা করে মরছি আমি। ওরা সবাই হাসছে। নায়ক মান্নার পরিবার হিমানী হয়তো বোমার ঘায়ে মরবে, তাতে তার বয়েই যাবে। মরাটা বড় কথা নয়, তার সিধুদার পাশে দাঁড়িয়ে মরতে পেল এইটেই বড় কথা। ছুটল নায়ক প্রতিশোধ নিতে, তার পরিবারের গায়ে যদি হাত দেয় হারামীর বাচ্চা ক্ষেত্তর তাহলে তার আর রক্ষে নেই। ধ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানি আইন আদালত উকিল মোক্তার নয়, সোজা নিজের হাতে প্রতিশোধ নেওয়া, দেনা-পাওনা চুকিয়ে হিসেব মিটিয়ে ফেলার নাম বাঁচার মত বাঁচা এটা ওরা জানে। ঝুনুও তাই জানত নিশ্চয়ই, জীবন নিয়ে জুয়া খেলতে গিয়ে চালের মারপ্যাঁচে পড়ে হেরে গিয়েছিল, তাই জীবন দিয়ে দেনা পাওনা মিটিয়ে ফেলল। ঝুনুর আত্মহত্যা করার কারণ এটুকুই, ওর মধ্যে রহস্য কিছুই নেই।

গালে হাত দিয়ে বসে রইলাম। তাছাড়া আর করতে পারি কি!

কুন্তলের খবরটা সিধুকে জানাতেই পারলাম না। ঠিক সময় সিধু আমার সঙ্গে দেখা করবে বলেছিল। কোথায় খুঁজে বেড়াব আমি তাঁকে! যতক্ষণ না নিজে থেকে সে দেখা করছে ততক্ষণ আমাকে বসে থাকতেই হবে। বাট বছরের অথর্ব আমি, ওদের করুণার ওপর নির্ভর করে বেচে আছি। হ্যাংলামো করছি আজকের জীবনকে বোঝবার জন্যে, আজকের সর্বগ্রাসী জীবনের ক্ষুধার পরিমাণ মাপবার জন্যে। কি বিড়ম্বনা!

এক পাঠক ভয়ানক রেগে গিয়ে আমাকে লিখেছিলেন, গৃহস্থদের ব্যাপারে আমি যেন নাক না গলাই। বেশ গুছিয়ে লিখেছিলেন তিনি চিঠিখানি। চিঠিটা রয়েছে আমার কাছে, খানিকটা তুলে দিচ্ছি।

"পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আমি আপনার একজন ভক্ত পাঠক। আপনার বহু গল্প উপন্যাস আমি পড়ে পড়ে মুখস্থ করে ফেলেছি। বহুদিন ভবঘুরে জীবন যাপন করেছেন আপনি, বহু দেশ ঘুরেছেন, বহু জিনিষ দেখেছেন। বহু বিচিত্র আপনার অভিজ্ঞতা। সেই সব অভিজ্ঞতা যখন আপনি শোনান তখন আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। কিন্তু যখন আপনি গৃহস্থদের নিয়ে গল্প উপন্যাস রচনা করেন,। তখন আমরা হতাশ হই, আপনার বাণী আমাদের গায়ে বিষ ছড়িয়ে দেয়। আপনি আমাদের চেনেন না, আমাদের সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিন্দুমাত্র পরিচয় নেই আপনার। মনে হয়, উড়ে এসে জুড়ে বসে আপনি আমাদের পরিহাস করছেন। ওপর দিকে মুখ তুলে আকাশের গায়ে থুতু দেবার চেষ্টা করলে সে থুতু নিজের মুখে পড়ে। সে ভয় আপনার নেই। গৃহস্থ আপনি নন, গৃহস্থদের মুখ পুড়লে আপনার আঁতে ঘা লাগে না। যখন আপনি ভবঘুরে চরিত্র সৃষ্টি করেন তখন দেখা যায়, দরদ দিয়ে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে সেই হাড়হাবাতে চরিত্রকে এমনই অপরূপ করে

তুলেছেন যে বিশ্বসুদ্ধ মানুষের মনে সে দাগ কাটছে। কিন্তু গৃহস্থ চরিত্র যখন বানান তখন তা হয়ে ওঠে নিছক চিমটি কাটা বা অন্তর টিপুনি দেওয়া। শুনেছি, সাহিত্য কথাটার উৎপত্তি সাহিতায় কথাটি থেকে। সমাজের হিত করার জন্যে সাহিত্য, এটা সোজা কথা। আপনি কি তাই করছেন? অবিশ্রান্ত সমাজের মুখে চুন কালি মাখাবার চেষ্টা করার নাম কি সাহিত্য সৃষ্টি? ·"

আমার ভক্ত পাঠকের চিঠির সবটুকু শুনিয়ে আপনাদের ধৈর্যের গায়ে চিমটি কাটতে চাই না আমি। ঐ কথাগুলোই খুব সংক্ষেপে আমাকে শোনালে কুন্তল। সোজা কথায় সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলে--"দিদি কেন আত্মহত্যা করলে জানতে চান আপনি? জেনে কি লাভ হবে আপনার?"

"লাভ?" বোকার মতন ওর মুখ পানে তাকিয়ে রইলাম।

বয়েস বড় জোর কুড়ি বা বাইশ, ওর দিদির মতই গড়ন, বেশ কিছুটা মেয়েলী ছাদ আছে বলে মনে হয়। কুন্তল লাহিড়ী আমার পড়শী রঘুদয়ালের ছেলে, যাকে খুঁজে বার করার জন্যে আমি হন্যে হয়ে উঠেছিলাম, ছুটো গোটা রাত যার জন্যে আমি চোখের পাতা এক করতে পারিনি, সে যখন স্বয়ং সাক্ষাৎ সশরীরে উদয় হোল আমার সামনে তখন মরমে মরে গেলাম তার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারার দরুণ। সত্যিই আমার কি লাভ হবে ঝুন্নুর আত্মহত্যার কারণটা জানতে পারলে?

কুন্তল তার কোঁকড়ানো চুলগুলোর ভেতর আঙুল চালাতে চালাতে বললে—"দিদিকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে চান, তাই না? কিন্তু আমি বলছি, সে কর্মটি করার চেষ্টা করবেন না। ভাল হবে না।"

"ভাল হবে না! মানে?" সোজা হয়ে উঠে বসলাম আমি। আস্পর্ধা দেখ! এক ফোঁটা ছোড়া, গাল টিপলে দুধ বেরুবে মুখ থেকে, আমাকে চোখ রাঙাতে এসেছে!

"হ্যাঁ, ভাল হবে না। এখন আমি মরিয়া, সিধুদা আমাকে আটকে রাখতে চেয়েছিল, পালিয়ে এসেছি। কেন পালিয়ে এসেছি জানেন? নিজের হাতে প্রতিশোধ নেব। হ্যাঁ, দিদি যা পারেনি আমি তা করব। তারপর আপনার পালা, সাবধান করতে এসেছি তাই আপনাকে। বুঝলেন, ভাল হবে না যদি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে চান। আমরা গরীব গৃহস্থ, কোনও রকমে বেঁচে আছি। দিদি যদি না মরত বি-কম্‌টা দিয়ে ফেলতে পারতাম। তারপর ব্যাঙ্ক-ফ্যাঙ্কে চাকরি জুটিয়ে নিতাম। বাবা মা হাফ ছেড়ে বাঁচতেন। হোল না, হোতে দিলে না। বড় মানুষ, পয়সা আছে, ফালতু পয়সা রোজগার করার ফন্দি ফিকির জানে। দিদিকে টোপ হিসেবে বঁড়শিতে গেঁথে বড় মাছ খেলিয়ে তুলতে চেয়েছিল। যাক, এ সব হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলির প্রাইভেট অ্যাফেয়ারস্‌। এর মধ্যে আপনি নাক গলাবার কে?" বলতে বলতে ছোকরা কাছে এগিয়ে এল। ওর চোখ মুখ থেকে লকলকে আগুন বেরুচ্ছে যেন।

"তোমাদের বা অন্য কারও প্রাইভেট অ্যাফেয়ারসে নাক গলাবার কোনও দরকার নেই আমার। তোমার মামা মদনবাবু বলে গেছেন একদিন সব জানা যাবেই। সমাজের উপকারের জন্যে ব্যাপারটা সকলের জানা উচিৎ। তোমার দিদিকে আমি চিনতাম, বুলুর মত মেয়ে কেন আত্মহত্যা করলে যদি জানতে পারত দেশের লোক তাহলে দেশের দশের সকলের উপকার হোত।" নিতান্ত নিঃস্পৃহ ভাবে জবাব দিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। করুক ও যা খুশি, একটা চ্যাংড়ার সঙ্গে অনর্থক বকবক করে কি লাভ।

"আমার মামা কি বলে গেল আপনাকে?" গলার ঝাল অনেকটা কমে এল ছোকরার। পিছিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে—"মামা আসে নাকি আপনার কাছে? আর কি বলে গেল মামা?"

"তা শুনে তোমার লাভ?" ওর প্রশ্নটাই ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে

মাবলাম। অল্প একটু হাসবার ভান করে বললাম—"হায় রে! ভাগনীব শোকে ভদ্দব-লোক খেপে উঠেছেন, ভাগনেটাকে দুশমনরা সাবাড় করে দিয়েছে ভেবে দুনিয়া তোলপাড় করছেন। যাক গে, এ সব ব্যাপাব নিয়ে তোমাব সঙ্গে কথা বলতে ঘেন্না করছে আমাব। তোমার বাবা যে বিজ্ঞাপনটা ছাপিয়েছেন কাগজে সেটা পড়লে শয়তানেব চোখ থেকেও জল পড়বে। আমাব অপবাধ আমি তোমাকে খুঁজে বাব কববাব চেষ্টা করেছিলাম। ঝুনু ছিল আমাব স্নেহেব পাত্রী, অনেকবাব সে আমাব কাছে এসে থিয়েটাবেব পাস বেচে গেছে, চাঁদা নিয়ে গেছে। সেই ঝুনু কেন গলায় দড়ি দিলে জানতে চেয়েছিলাম, এই হল আমাব অপবাধ। তোমার মামা আমাব লেখাব ভক্ত। সে বেচাবাও পাগল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। ভাগনীটা মল ভাগনেটা উধাও হয়ে গেল, ভাগনে ভাগনীকে ভালবাসে এই হল তাব অপবাধ। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানছি সমস্তই আমাদেব অপবাধ। কাবণটা হল আমবা তোমাদেব যুগে জন্মাইনি। এ যুগেব মানুষদের কাছে সমস্তই প্রাইভেট অ্যাফেযাবস, কাব বাবাব সাধ্য তোমাদের ব্যাপাবে নাক গলাতে যাবে।"

বক্তৃতাটা আবও খানিক চালিয়ে যেতাম, কুন্তল বাধা দিলে। কথাব মাঝখানে জিজ্ঞাসা কবে বসল—"বদনবাবু আমাব মামা এ কথাটা আপনাকে কে বলেছে?"

"তাব মানে!"

"মানে হচ্ছে, আপনাব ভক্ত পাঠক বদন বাগচী আমাদের সংসাবেব মত দশটা সংসাবেব মামা। গবীব গৃহস্থ ভদ্রলোকের সংসাবে মামা সেজে ঢোকাটা সবচেয়ে সহজ। মামা হতে পারলে বাড়িব ছেলেমেয়েদের ওপর অভিভাবকত্ব ফলান যায়। একটু আধটু উপকার কবে সংসারেব কর্তা গিন্নীকে হাত করতে পারলে ভাগনে ভাগনীদের সর্বনাশ করার সুযোগ পাওয়া যায়। বদন বাগচীর মত মামারা আব কাকারা সব পাড়ায় ঘুবঘুব কবে ঘুবছে।

যে সংসারে ওরা ঢোকেন সেই সংসারে ঘুণ ধরে। চোঙা প্যাণ্ট ছুঁচলো জুতো চাপদাড়ি যাদের আছে তারা মার্কামারা মস্তান। পঞ্চাশ বছর যার বয়েস সে চোঙা প্যাণ্ট ছুঁচলো জুতো পরে না। ভদ্র গৃহস্থ সংসারে ছুঁচ হয়ে সেঁধোয় ফাল হয়ে বেরয়। এঁরা হলেন বর্ণচোরা আম, এঁদের নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে যায় না। পাড়াতুতো দাদাদের পাড়াতুতো দিদিদের নিয়ে সকলের মাথাব্যথা। পাড়াতুতো মামা কাকারা চাদর গলায় দিয়ে অভিভাবকত্ব ফলিয়ে কি সব্বনাশ করছেন সে খবর কে রাখে?"

দাঁত বেরিয়ে গেল কুন্তলের। খেঁকি কুত্তার মত দাঁত বার করে আমার পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"শুনতে চান কেন দিদি আত্মহত্যা করেছে?"

"না, চাই না।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাফ জবাব দিলাম। তারপর উঠে গিয়ে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বললাম—"আমার বয়েসও পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে অনেক কাল, আমাকেও বিশ্বাস করা যায় না। তবু তোমায় বলব কুন্তল, আর বাড়াবাড়ি করে কাজ নেই। তোমার দিদি ফিরে আসবে না আর, যা হবার হয়ে গেছে। প্রতিশোধ নিয়ে কাজ নেই। এই নোওরা ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে তোমার দিদিই কষ্ট পাবে সবচেয়ে বেশী। তুমিই আমাকে সাবধান করলে প্রথমে, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে বারণ করলে। খাঁটি কথা বলেছ। ঝুনু নেই। ঝুনুর সম্মতি না নিয়ে এই সব করার কোনও অধিকার নেই আমাদের। যাক, যেতে দাও। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তোমার খিদে পেয়েছে। একটু কিছু খেয়ে নাও। যদি খারাপ কিছু ধারণা না কর তাহলে খাবার কিছু আনতে বলি। খাওয়ার পরে মাথা ঠাণ্ডা করে পরামর্শ করা যাবে।"

মুখ নুয়ে পড়ল ছোকরার। তাড়াতাড়ি লুচি তরকারি বানাবার জন্যে বলে এলাম ভেতরে গিয়ে। ফিরে এসে বসতেই কুন্তল জিজ্ঞাসা করলে—"সিধুদা এখন আছে কোথায় বলতে পারেন?"

"ঐ কথাটা আমিই তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম। আমার ধারণা হয়েছিল সিধুই তোমাকে পাঠিয়েছে আমার কাছে। কে তোমায় বলেছে যে তোমার দিদির আত্মহত্যার কারণটা আমি জানতে চাই?"

"দিদির এক বন্ধু, তার নাম সেবা সোম। সেবাদি বললে—"

"সেবা সোম! নামটা যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে!"

"হ্যা, সেবাদিকে আপনি চেনেন। ব্যাঙ আর সেবাদি—"

"ঠিক বলেছ। ব্যাঙ মানে ঐ নায়ক মান্নাই সেবার নাম বলেছিল আমার কাছে। সেবার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই আমি। কোথায় যাচ্ছিল ওরা সেদিন—"

"যাচ্ছিল একটা কাজের মত কাজ করতে। মাঝখান থেকে সিধুদা লোক লাগিয়ে আচ্ছা করে ব্যাঙকে ধোলাই দিলে। সেবাদির সব প্ল্যান ভেস্তে গেল।"

"সেই প্ল্যানটি কি?"

একটু সময় চুপ করে থেকে কুন্তল বলল—"যাঁকে আপনি আমাদের মামা বলে জানেন, অ্যাসিড্ বাল্‌ব ঝেড়ে তার মুখটা পুড়িয়ে দেওয়া। সেই কাজটি এবার আমি নিজে করব।"

কাঠ হয়ে বসে রইলাম। মদনবাবুর মুখের ওপর অ্যাসিড্ বাল্‌ব পড়েছে, মুখখানা পুড়ে গেছে মদনবাবুর। যন্ত্রণার চোটে উনি গড়াগড়ি খাচ্ছেন আর চেঁচাচ্ছেন এই সমস্ত দৃশ্য চাক্ষুষ দেখতে লাগলাম যেন। সামনে বসে রয়েছে কুন্তল, ও যাবে নায়ক মান্নার অসমাপ্ত কর্মটিকে সুসমাপ্ত করতে। ঠাণ্ডা গলায়, একটুকু উত্তেজিত না হয়ে কেমন শুনিয়ে দিলে ওর অভিপ্রায়টি। আস্ত একটি খুনে বসে আছে আমার চার হাত সামনে। সেই খুনেটাকেই খাওয়ার বলে লুচি তরকারি বানাতে বলে এসেছি আমি। চমৎকার!

খুব তাড়াতাড়ি আমরা এগিয়ে চলেছি। মনুষ্য নামক জীব কি

রকম সাংঘাতিক বেগে প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে! মনে পড়ে গেল, যখন আমার তিন চার বছর বয়েস তখন ছ্যাকড়া গাড়ি চেপে বাবার সঙ্গে হাওয়াই জাহাজ দেখতে গিয়েছিলাম গড়ের মাঠে। কলকাতা সহরে যতগুলো ছ্যাকড়া গাড়ি ছিল সব সেদিন বয়ে নিয়ে গিয়েছিল আমার মত বয়েসের ছেলেমেয়েদের আর তাদের বাবা কাকা দাদাদের। ওপাশে রেস গ্রাউণ্ড আর এপাশে গড়ের মাঠ, মাঝখানের সব জায়গাটা জুড়ে ছ্যাকড়া গাড়ি। ঘোড়ারা প্রবল বিক্রমে চিঁহি চিঁহি করছে, গাড়োয়ানরা ঘোড়াদের চেয়ে প্রবল বিক্রমে চিল্লাচিল্লি করছে, এ গাড়ির ঘোড়া ও গাড়ির ঘোড়ার ঘাড় কামড়ে ধরবার জন্যে হঠাৎ খেপে উঠল। সেই তুমুল কাণ্ডের মধ্যে বাবা কাকা দাদারা ছেলেমেয়েদের নিয়ে গাড়ির ছাদে উঠেছেন। মনে পড়ে, বাবা আমাকে দু' হাতে করে তুলে মাথার ওপর উঁচু করে ধরে আছেন। চারিদিকে চিৎকার উঠেছে 'ঐ যে, ঐ দেখা যাচ্ছে, মস্ত মস্ত ডানাওয়ালা পাখীর মত, দেখ, দেখে নে ভাল করে। ঐ পাখীটার পেটের মধ্যে বসে সাহেব দু'জন বিলেত থেকে উড়ে এসেছে আকাশ দিয়ে। দেখ দেখ, দেখে নে।' কি দেখেছিলাম ঠিক মনে পড়ছে না। এটাই শুধু মনে পড়ছে যে এইতো সেদিন আমার এই জীবনেই দেখেছি মানুষকে সবপ্রথম আকাশে উড়তে। আর এই জীবনেই আবার দেখছি সেই মানুষ চাঁদ ধরতে চলেছে হাত দিয়ে। ছোটবেলায় ধমক খেতাম—'কি আবদেরে ছেলেরে বাবা! আকাশের চাঁদ ধরতে চায়।' আজকের যুগে হাত দিয়ে আকাশের চাঁদ ধরতে চাওয়াটা খুব একটা আবদেরে কাণ্ড নয়। এ সমস্তই আমার এই জীবনেই ঘটে গেল। কেন?

উত্তরটি অতি পরিষ্কার। দুনিয়ার বুকে যে জীবগুলো মাথা উঁচু করে খাড়া হয়ে দু' পায়ে হেঁটে বেড়ায়, তাদের ঐ উঁচু মাথার মধ্যে এমন কিছু আছে যা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। পঞ্চাশ বছর আগে স্রেফ আকাশে উড়তে পারাটাই ছিল একটা আজগুবী

কাণ্ড, পঞ্চাশ বছর পরে মঙ্গলগ্রহে গিয়ে পিক্‌নিক করে আসাটাও আজগুবী কাণ্ড নয়। পঞ্চাশ বছর আগে মোমিনপুরে কেউ খুন হয়েছে শুনলে শ্যামবাজারের বকে আর বৈঠকখানায় ঐ খুন হওয়ার বিষয়টি ছাড়া অন্য কিছুই শোনা যেত না। পঞ্চাশ বছর পরে বোমা, অ্যাসিড্ বাল্‌ব, বুলেট, কাঁদুনে গ্যাসের মধ্যে বাড়ির মেয়েরা দিব্যি সিনেমা দেখতে যাচ্ছে। প্রগতি, সবই হচ্ছে প্রগতি। এই ভয়ঙ্কর প্রগতির সঙ্গে পা ফেলে চলবার জন্যে যারা জন্মেছে—তাদের মধ্যে একজন সামনেই বসে রয়েছে আমার। আমি তার জন্যে গরম লুচি তরকারি বানাতে বলে এসেছি। লুচি তরকারি খেয়ে ঠাণ্ডা মেজাজে সে একটা মানুষের মুখের ওপর অ্যাসিড্ বাল্‌ব ছুঁড়ে মারতে যাবে।

সেনা সোম তার নায়ক মাত্র। অ্যাসিড্ বাল্‌ব ছুঁড়তেই যাচ্ছিল সেদিন বারে। অ্যাসিড্ বাল্‌বগুলো ছিল নিশ্চয়ই সেনা সোমের হাত ব্যাগের মধ্যে। তাই সে পালিয়ে গিয়েছিল।

যদি না পালাত। মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যারা তাদের ওপরেই যদি অ্যাসিড্ বাল্‌বগুলো খরচ করে ফেলত সেবা।

আর ভাবতে পারলাম না। দু'হাতে মুখ ঢেকে বলে উঠলাম—উঃ। অ্যাসিড্ বাল্‌ব্ যেন আমার মুখের ওপরেই ফেটে পড়েছে। চোখ মেলতে পারছি না। অসহ্য যন্ত্রণায় পাগল হোয়ে উঠেছি।

কুন্তল জিজ্ঞাসা করল- "কি হোল আপনার? কলিক্ আছে বুঝি?"

জবাব দিলাম না, ওর খাবারটা হোল কিনা দেখবার জন্যে বাড়ির ভেতর চলে গেলাম।

আবার বেরুতে হোল।

চলেছি সিধুকে খুঁজতে, কুন্তল আমার সঙ্গে চলেছে। লুচি তরকারি খাইয়ে সবই শুনিয়েছি ওকে। সিধুর মাথা ফাটা, তাকে নিয়ে

নায়ক মান্নার বউ হিমানীর সেই পুরানো বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া, মান্নার বউয়েব সঙ্গে আমার যাওয়া। পেস্তাকে নিয়ে মান্না ওদের ধরবার জন্যে গিয়েছিল সেই বাড়িতে। ওদের তালা বন্ধ করে রেখে আমাদের পলায়ন। তারপর সেই আশ্রমে যাওয়া, সেখানে গিয়ে জানতে পারা যে কুন্তল ভেগেছে। সমস্তই বলে ফেললাম ওর কাছে। নায়ক মান্না আমার সঙ্গে দেখা করে কি বলে গেছে তাও শোনালাম। শুনতে শুনতে কুন্তলেব চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। কাবু হয়ে পড়ল ছোকরা, বলল, বদন মামার মুখ পোড়ানো কাজটিকে আপাততঃ মুলতবী রেখে তার সিধুদাকে খুঁজে বার করবে সে। নয়ত সর্বনাশ হোয়ে যাবে। সিধুদাকে এই অবস্থায় যদি তারা হাতে পায় তা'হলে একদম সাফ করে ফেলবে।

"তারা কারা?" জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, সামলে গেলাম। তারা কারা জেনে আমার লাভ কি হবে! অনর্থক আর কোনও কিছুই জানতে চাই না। মাথা ফেটে গেছে সিধুর, অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে কোথাও সে, হিমানী অবশ্য তার সঙ্গে আছে। কিন্তু একলা হিমানী কি করে বাঁচাবে সিধুকে যদি তারা ওকে সাবড়ে দেবার জন্যে দল বেঁধে উপস্থিত হয়।

কুন্তল বলল,—"সবপ্রথম সে যাবে তার সেবাদির কাছে। সেবাদি জানে কোথায় গেছে নায়ক মান্না। নায়ক মান্নাকে যদি পাওয়া যায় তা'হলে তাকেও সঙ্গে নিতে হবে। প্রথম কাজ হোল সিধুদাকে খুঁজে বার করা। সিধুদাকে জানিয়ে দেওয়া আসল দুশমন কারা। সিধুদাকে সামলে ফেলে তারপর দুশমনদের শায়েস্তা করতে যেতে হবে। নায়ক মান্নার বউকে আর সিধুদাকে যদি তারা হাতে পায়—"

মান্নাও ঐ কথাটা বলে গিয়েছে। হিমানীকে যদি তারা হাতে পায় তা'হলে কি ঘটবে সেইটে আন্দাজ করেই হন্যে হয়ে ছুটেছে মান্না। কে জানে এতক্ষণে সে যথাস্থানে পৌঁছে গেছে কিনা!

সেবাকে পাওয়া গেল না। অফিসে খোঁজ করে তার বাড়িতে

যাওয়া হোল। সেবার বিধবা জননী বললেন, সাত সকালে কিছু না খেয়ে মেয়ে বেরিয়েছে, কোথায় গেছে বলতে পারেন না।

সময় পালিয়ে যাচ্ছে। সকাল গড়িয়ে দুপুর দুপুর গড়িয়ে বিকেল হোল। আমার পড়শী রঘুদয়ালের ছেলে কুন্তল বসে আছে আমার পাশে। তার নির্দেশ মত এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটে চলেছে আমাদের ট্যাক্সি, হুহু করে মীটার উঠছে। উঠুক, অনেকগুলো নোট সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছি। হয় এসপার নয় ওসপার, দুটোর একটা না করে ঘরে ফিরছি না। বিশ বাইশ বছরের কুন্তল দেখুক ষাট বছরের বুড়োর দম কতখানি।

ভালই লাগছে, নিশ্চয়ই ভাল লাগছে। বয়েসটা চল্লিশ বছর কমে গেছে হঠাৎ। কুন্তলের সমবয়সী হয়ে পড়েছি যেন। সেই করে লুকোচুরি খেলেছিলাম, লুকোচুরি খেলার উত্তেজনা ভুলে মেরে দিয়েছিলাম। আঃ, কি আরাম! শিকারের পেছনে ছুটে শিকারী বোধহয় এই জাতের আরামই ভোগ করে। চক্ষু বুঁজে আরামটুকু চেখে চেখে উপভোগ করি।

এই ভাবে ট্যাক্সি ছুটছে —

"—অনর্থক" হঠাৎ কুন্তল কথাটা বলে উঠল।

চোখ মেলে তাকালাম ওর চোখের পানে। আমার চোখের পানে তাকিয়ে ও বলল "অনর্থক আপনার টাকাগুলো উড়িয়ে দিচ্ছি। চলুন, এবার ফেরা যাক।"

"অ্যাঁ!" আঁতকে উঠলাম।

"হ্যাঁ, ঘাঁটি আগলে বসে থাকতে হবে আমাদের। সন্ধ্যের আগে নিশ্চয়ই মালা একবার ফিরবে বাড়িতে। সেই সময় একটা চান্স নিতে হবে।"

"চান্স মানে! বলেছি তো আমার সামনে খুনখারাপি করা চলবে না।"

"আমিও তো কথা দিয়েছি, আগে সিধুদাকে উদ্ধার না করে

ও সমস্ত কিছুই করব না। চান্স্ নেব মানে মামাকে পাকড়াও করব। তারপর দেখুন না কি করি।"

খুব বেশী আশ্বস্ত হোতে পারলাম না। কিন্তু করা যাবে কি! গাড়ি ছুটল বদনবাবুর আস্তানার দিকে। আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলাম। কে জানে কি ঘটতে চলেছে। বিশ বাইশ বছরের ছোকরার ওপর এতটা নির্ভর করা খুবই অন্যায় হচ্ছে। মাথা গরম তো, কখন কি করে ফেলবে তার ঠিক কি।

কুন্তল বলল—"এইবার ছেড়ে দিতে হবে ট্যাক্সি, আমরা এসে পড়েছি। সামনের মোড় ঘুরলেই আমরা নেমে যাব। দূর থেকে দেখিয়ে দেব আপনাকে বাড়িটা। আপনি জেনে আসবেন মাতুল বাড়িতে আছেন কি না। যদি থাকেন ওঁর সঙ্গে গল্প জুড়ে দেবেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি না ফেরেন তা'হলে আমি ধরে নেব যে মাতুল বাড়িতেই আছেন। উদয় হব মাতুলের সামনে। আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না। যা বলবার বলব আমি, আপনি চুপচাপ শুনে যাবেন। তারপর যা হয় দেখা যাবে।"

ট্যাক্সি ছেড়ে দেবার পর আর একবার সাবধান করে দিলাম কুন্তলকে। খুব সাবধান, আমার সামনে যেন খুন-খারাপি না হয়। তারপর চললাম বদনবাবুর বাড়ির দিকে। তফাৎ থেকে বাড়িটা আমায় দেখিয়ে দিলে কুন্তল। আধুনিক প্যাটার্ণের ছোটখাট বাড়িটি যেন ছবি। সামনে কয়েকটি ফুলগাছও রয়েছে। কলিং বেল টিপলাম। একটি ছোড়া চাকর বেরিয়ে এল। সংবাদ শুভ, বদনবাবু বাড়িতে আছেন, এইমাত্র ফিরে স্নানের ঘরে ঢুকেছেন। বেরুতে আধ ঘণ্টাটাক দেরি হবে।

আমার নাম ঠিকানা বললাম চাকরটিকে। মনিবকে জিজ্ঞাসা করে এসে সে আমাকে ঘরে ঢুকে বসতে বললে। আর কে কে থাকে বাড়িতে জানতে চাইলাম চাকরটির কাছে। শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে বদনবাবু বিয়ে থা করেন নি। সংসার নেই তাঁর,

ঠাকুর চাকর নিয়ে একলা বাস করেন। তবে মাঝে মধ্যে বাবুর বন্ধুরা আসেন, দু এক দিন থেকে চলে যান।

সুখী মানুষ বটে। সুখী মানুষ এবং সম্পন্ন মানুষ বদনবাবু, যে সব জিনিষ-পত্র দিয়ে ঘর সাজিয়েছেন তাতে তাঁর রুচির পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে। আহা, উচুদরের রুচি না থাকলে আমার লেখার ভক্ত হোতেন কি করে? বামা শ্যামাদের জন্যে তো আর আমি কলম চালাই না।

নিজের ওপর বিশ্বাসটা আবার ফিরে এল। মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, এরপর যে উপন্যাসখানিতে হাত দেব তাতে বদন-বাবুকে মনের মত করে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

বাইরে কুন্তলের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। চাকরটি কুন্তলকে ভাল করে চেনে। বললে—"কোথায় ছিলেন দাদাবাবু? আপনার জন্যে বাবু পাগলপারা হয়ে উঠেছেন যে।"

কুন্তল জিজ্ঞাসা করলে—"মামা কি করছেন রে?"

"চান করছেন, বসুন না ঐ ঘরে, বাবু এলেন বলে।" জবাব দিলে চাকরটি.

ঘরে ঢুকল কুন্তল। আমার দিকে তাকালো না। দরজার পাশে একটা গদি আঁটা টুলের ওপর বসে একখানা সিনেমা পত্রিকার ছবি দেখতে লাগল।

আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলাম। এইবার কি ঘটবে। মামা ভাগনের মোলাকাতটা কি রূপ নেবে কে জানে! যাই হোক, কথা দিয়েছে কুন্তল যে কোন খুন খারাপি ঘটাবে না আমার সামনে। তা'ছাড়া বোমা পিস্তল অ্যাসিড্ বালব কিছুই নেই ওর সঙ্গে, শুধু হাতে করবেই বা কি!

দড়াম করে একটা আওয়াজ হোল। আওয়াজটা হোল কোথায়! দু'জনেই আমরা লাফিয়ে উঠলাম। পরমুহূর্তে চিৎকার করতে করতে ঘরে ঢুকল সেই বাচ্চা চাকরটি। তার পেছনে টলতে টলতে

এলেন স্বয়ং বদনবাবু। বীভৎস দৃশ্য, আপাদমস্তক লালে লাল, কপাল মুখ বুক পেট হাত পা সর্বাঙ্গ থেকে রক্ত ঝরছে। এক চিলতে কাপড় নেই অঙ্গে, চোখেও বোধহয় দেখতে পাচ্ছেন না কিছু। ঘরে ঢুকে একটা তেপায়ায় হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লেন। ওর মূল্যবান কার্পেটখানা নষ্ট হয়ে গেল। চিৎকার করে উঠলেন কিছু বলে, কথাটা ঠিক বোঝা গেল না।

কুন্তল ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর পাশে। মুখের কাছে মুখ নামিয়ে চেঁচাতে লাগল—"বলুন মামা বলুন, কে এ সব্বনাশ করলে। খুন করব আমি তাকে, খুন করে ফাঁসি যাব।"

বহু কষ্টে বদনবাবু অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করলেন—"ক্ষেত্তর চাটুজ্যে। ক্ষেত্তর চাটুজ্যে লোক লাগিয়ে আমাকে খুন করলে।"

"কে ক্ষেত্তর চাটুজ্যে? কোথায় থাকে সে?" বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল কুন্তল। শেষ পর্যন্ত আর একবার কথা বললেন বদনবাবু, কুন্তল ক্ষেত্তর চাটুজ্যের ঠিকানাটা জেনে নিলে। পরমুহূর্তেই আমার একটা হাত ধরে টানতে টানতে বার করে আনলে ঘর থেকে। প্রায় ছুটতে ছুটতে খানিকটা যাবার পর মোড় ঘুরতেই একখানা খালি ট্যাক্সি পাওয়া গেল। দম ফুরিয়ে গেছে আমার তখন, গাড়িতে উঠে চোখ বুজে এলিয়ে পড়লাম।

ট্যাক্সিওয়ালা সর্দারজী জানালেন গাড়ি আর যাবে না, কলকাতার গাড়ি পোল পার হতে পারে না। এক জেলা থেকে আর এক জেলায় যেতে হলে ইস্পিসাল পারমিট্ লাগে।

বহুত আচ্ছা। সর্দারজীর টাকা মিটিয়ে দিয়ে বাসের গর্ভে আশ্রয় নেওয়া গেল। শেষ বাস কখন ফিরে আসে জেনে নিল কুন্তল। অনেক দেরি, রাত দশটায় শেষ বাস ফিরে আসবে। তারপরও কলকাতায় ফেরবার গাড়ি আছে। কোনও চিন্তা নেই, সবে তো সন্ধ্যে হল।

মিনিট কুড়ি পরেই বাস ত্যাগ করে সাইকেল রিক্সার আশ্রয় নিলাম। তারপর যথাস্থানে পৌছতে আরও কুড়ি মিনিট সময় লাগল। রিক্সা ছেড়ে দিয়ে হাটতে হবে। ক্ষেত্র চাটুজ্যের বাড়ি গলির মধ্যে, সেখানে রিক্সা ঢুকবে না।

কুন্তল বলল—"আর আপনাকে যেতে হবে না, ওপাশে ঐ চায়ের দোকানে বসে চা খান। বাড়িটা আমি দেখে আসি।"

"তার মানে!"

"মানে আপনি বুড়ো মানুষ। আপনাকে এর মধ্যে নিয়ে যাওয়া—"

"থাম তো ছোকরা, বেশী ডেঁপোমো করতে হবে না। কোথায় যাচ্ছ চল। নষ্ট করবার মত সময় নেই এখন হাতে।" চাপা গলায় খিঁচিয়ে উঠলাম কুন্তলকে। ও আর কথা বাড়ালে না, দু'জনে গলির মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

সন্ধ্যা পার হয়েছে মাত্র এক ঘণ্টা। গলির ভেতরটা এমনই নির্জন যে গা ছমছম করতে লাগল। ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে গলিতে, একটুও অন্ধকার নেই। ওধারে গলির বাইরে বড় রাস্তায় গমগম করছে লোকজন। হোটেল সিনেমা দোকান সমস্ত খোলা রয়েছে। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে গলিটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে বেশ বড় একটা খোলা মাঠ। মাঠের শেষ দিকে গুদামের মত লম্বা একটা কিছু রয়েছে। ক্ষেত্র চাটুজ্যের বাসস্থান, রিক্সাওয়ালা আমাদের বলে দিয়েছে। মাঠে পা দিলাম আমরা, অন্ধকার শুরু হল। ক্ষেত্র চাটুজ্যে অন্ধকারের অন্তরে বাস করেন। অন্ধকারের জীবটি কি করছেন এখন কে বলতে পারে।

প্রায় কাছাকাছি গিয়ে পৌছলাম আমরা সেই গুদামটার। হঠাৎ বিকট আওয়াজ করে গোটাকতক কুকুর এক সঙ্গে চেঁচাতে লাগল। প্যান্টের পকেটে হাত পুরে কি একটা জিনিস বার করলে কুন্তল। দাঁড়িয়ে পড়েছি তখন আমরা দু'জনে। আকাশের আলোয় দেখলাম

চকচক করে উঠল জিনিসটা। ঠিক বুঝতে পারলাম না জিনিসটা কি।

ফিসফিস করে কুন্তল বলল—"ঠিক আমার পেছন পেছন আসুন। কুকুরগুলো বোধ হয় আটকানো রয়েছে, নয়ত এতক্ষণে এসে পড়ত। আসলেও ভয় নেই, দু'চারটে নিকেশ হয়ে যাবে।"

সত্যিই আটকানো ছিল কুকুরগুলো, গলা ফাটিয়ে চেঁচাতেই লাগল তারা, তেড়ে এসে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল না। আরও কয়েক কদম এগিয়ে গেলাম আমরা। ধপ্ করে একটু আওয়াজ হল, কি যেন একটা পড়ল আমাদের সামনে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা তুলে নিয়ে প্রাণপণে ছুঁড়লে কুন্তল। বজ্রাঘাত পড়ল যেন একটা, ছিটকে পড়লাম পেছন দিকে।

দারুণ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। অন্ধকার আর নেই, সামনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। কুন্তল কোথায়; প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলাম—"কুন্তল কুন্তল"। আগুনের ওধার থেকে জবাব এল—"চলে আসুন আগুনটা ঘুরে। সবাইকে পেয়ে গেছি। দেখে যান এখানে কি মজা হচ্ছে।"

নায়ক মান্না নায়কের মত আমাদের পরিচালনা করতে লাগল। ওর প্রধান সাগরেদ পেস্তা সিধু মল্লিককে কাঁধে করে নিয়ে যাবে। সিধুর আর উত্থানশক্তি নেই। পেস্তাকে ঘিরে যাব আমরা তিনজন, আমি থাকব সামনে, আর হিমানী ও সেবা থাকবে দু'পাশে। গলির মুখে পৌঁছে দেখতে পাব, আমাদের বাঁ দিকে একখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির চাবি আছে সেবার কাছে। গাড়ি চালাবে পেস্তা। সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হওয়া চাই। কেউ যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে বলতে হবে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি রুগীকে। আমিই বলব, কারণ আমিই বয়েসে সকলের চেয়ে বড়। রোগটার নামও শিখিয়ে দিলে নায়ক, বুকের রোগ, থ্রম্বসিস্। হাসপাতালে নিতে দেরি করলে

রাস্তায় বিপদ ঘটতে পারে। সঙ্গে মেয়েরা রয়েছেন, একজন বুড়ো ভদ্রলোক রয়েছেন, কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারবে না।

স্বয়ং রুগী সিধু মল্লিক চিঁ চিঁ করে বলল—"তোমরা দু'জন সঙ্গে না গেলে আমি যাচ্ছি না।"

নায়ক বলল—"গোলমাল করো না সিধুদা, এখন তর্কাতর্কি করার সময় নেই। আমরাও যাচ্ছি। কুন্তলকে আমি ফেলে যাব না। একটু দেরি হবে। এধারের কাজ এক দম মিটিয়ে যাব।"

হিমানী বেঁকে বসল—"তাহলে আমি এখান থেকে এক পা নড়ব না।"

বিখ্যাত গুণ্ডা ব্যাঙা রুখে উঠতে যাচ্ছিল। ওর প্রধান সাগরেদ পেস্তা বললে—"যেতে দাও না বাওয়া। এখন জলদি এই মালটিকে ঘাড় থেকে নামাই চল। ক্ষেত্তর শ্লাকে বাগে পাওয়া যাবেই আবার।"

শেষ পর্যন্ত সেবা হাল ধরলে। বললে—"আর কথা নয়। সবাই চল এক সঙ্গে। শয়তানটার সঙ্গে পরে বোঝাপড়া করব আমি। কোথায় যাবে সে? ওর মন্ত্রী বদন বাগচীকে যেখানে পাঠিয়ে এলাম ওকেও সেখানে পাঠাব। চল এখন, আর কথা নয়।"

তখন নায়ক চলল সামনে। ও গিয়ে গাড়ি খুলে স্টার্ট দিয়ে বসে থাকবে। সামনে যদি কেউ পড়ে তা'হলে রাস্তাও পরিষ্কার করবে ও। সে জন্যে নায়কের হাতে সেই চকচকে বস্তুটি দিয়ে দিলে কুন্তল। কুন্তল রইল সকলের পেছনে। পেস্তা তার হাতে একটা গোল মত জিনিস দিয়ে বললে—"নাও বাওয়া, আর একটিও নাও। ক্ষেত্তরের মানুষ মনে করে একটি ঝেড়েছিলাম, যদি ফাটত এতক্ষণে তোমরা দু'জন সোজা বেহেস্তে পৌঁছে যেতে। আসল কাটাল বিচির বাচ্চা বাবা তুমি, ক্ষেত্তর শ্লার ডালকুত্তা গুলোকে জাহান্নামে পাঠিয়ে এলে। এটিকেও সঙ্গে রাখ। পেছন দিক থেকে যদি কোন শ্লা—।"

বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম বুকের ভেতর যে যন্ত্রটা অবিরাম টিপ্‌টিপ করে সেটা থেমে গেছে। বোমাটা তা'হলে আমাদের তাক করেই ছুঁড়েছিল পেস্তা! জয় মা তারা!

এক গুষ্টি পাড়াপড়শী নিয়ে দিব্যি বেঁচে আছি। পেস্তা আসে নায়ক আসে সিধু তো মাঝে মাঝে আসেই। সিধুর বাবা কুন্তলকে একটা কাজ পাইয়ে দিয়েছেন। কাজ করছে, পড়ছেও। এইবার ও বি-কম ফাইনাল দেবে। সেদিন এসেছিল হিমানী, আমাকে নেমন্তন্ন করে গেছে। সামনের মাসের দশ তারিখে ওরা বিবাহ বার্ষিকী পালন করছে। ছোটখাট একটু অনুষ্ঠান হবে, দু'চারটে গান একটু জলযোগ আর একটু বক্তৃতা। বক্তৃতা দিতে হবে আমাকে। কারণ, আমিই হব সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি।

ভালই আছি বলতে হবে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ভাল আছি। পাড়া-পড়শীদের নিয়ে এই ভাবে শেষের দিন কটা কেটে গেলেই হোল। আর কি চাই।

প্রতিজ্ঞা করেছি, পাড়-পড়শীদের নিয়ে কিছুতেই আর গল্প ফাঁদব না। ওপর দিকে মুখ তুলে আকাশের মুখে থুতু দেবার চেষ্টা করলে সে থুতু নিজের মুখেই পড়ে। আজ আমি ভবঘুরে নই। আজ আমি এদেরই একজন। যখন মরব তখন এরাই আমাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে আসবে।

সেনাকে কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একদম উধাও হয়ে গেল মেয়েটা। কোথায় গেল! কোথায় আবার যাবে, হারিয়ে গেল।

হারিয়ে গিয়ে আমাকে রেহাই দিলে সেনা। হারিয়ে না গেলে সেনা একটা কাঁটা হয়ে আমার মনে বিঁধে থাকত। বদন বাগচীকেও যে ভুলতে পারি না। উঃ কি বীভৎস রূপ হয়েছিল তখন বাগচীর! অঙ্গের কোনও খানে এক চিলতে কাপড় ছিল না, কপাল থেকে

পায়ের পাতা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে গেঁথে গিয়েছিল কাঁচের টুকরো। বদন বাগচীর আসল রূপ, আস্ত একটি নর-রাক্ষস, মামা কাকা মেসোমশাই সেজে ভদ্র গৃহস্থ সংসারে সেঁধিয়ে রক্ত চুষে খায়, সোনার সংসার ছারখার করে ছাড়ে। সবই সত্যি, কিন্তু সেরা যেভাবে বাগচীকে শাস্তি দিলে সেটা ভোলা যায় না। বোমাটা সেরা রেখে এসেছিল বাগচীর স্নানের ঘরে। অনেক বুদ্ধি খরচা করে নায়ক ঐ বোমটা বানিয়ে দিয়েছিল। স্নানের ঘরে ঢুকে যে মুহূর্তে বাগচী জলের কল খুলতে গেল সঙ্গে সঙ্গে বোমাটা ফাটল। কর্ম ফলে, কিন্তু ঐ কর্মটার ফলে এ পাড়ার একটা রাত বাগচীর সঙ্গে কাটাতে হয়েছে সেরাকে, এটা যে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। সেরা হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গিয়ে রেহাই দিয়েছে আমাকে। একদিন সবে ভুলে যাব।

নায়ক পেয়ো নন্দ সিং, [illegible] চোখা নয়। এদের চেনা সহজ, এরা [illegible] একচেটে [illegible]। ঐ মামা কাকা মেসোমশাইদের [illegible] আমৃত্যু আমি চেষ্টা করে যাব। পঞ্চাশ [illegible] পার হয়ে [illegible] তাদের, তাদের সম্বন্ধে সাবধান হও। ছাপিয়ে [illegible] –

২

খেই হারিয়ে গেল। একসঙ্গে শত শত চরিত্র ভিড় করে দাঁড়াল সামনে এসে। সবাইকে ঠাঁই দিতে গিয়েই বেধেছে মুশকিল, গোটা উপন্যাসখানাই মারা যাচ্ছে। কে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একটা চরিত্রকেও ষোল আনা ফুটিয়ে তুলতে পারছি না। তার মানে মুনশীয়ানা যাকে বলে সেই গুণটিরই একান্ত অভাব।

অনবরত খেই হারিয়ে ফেলা আর দাঁড়ি টানা, এই করতে করতে কোনও রকমে যে উপন্যাস শেষ করে এনেছি তার নাম জীবন। কালের পাতায় অদেখা আখরে এই অসার্থক রচনা লেখে যাচ্ছি। কাগজেও যিনি কলন করেন, যাঁর গর্ভে কাল শুক্র-শোণিত মিশ্রণ-জাত ভ্রূণের প্রথমাবস্থায় থাকে, সেই মহাকালীকে বলি নিবেদন করছি এবার আমার ফুরিয়ে আসা শ্বাস প্রশ্বাসগুলো। কলন করছি মানে গুণছি, গুণে চলেছি এক-টি একটি করে পাতা, দেখছি কোথায় কোথায় খেই হারিয়ে গেছে।

ধ্রুবজ্যোতি সারকে মনে পড়ছে। বার বার সাবধান করে দিতেন—"খবরদার গোঁজামিল দিসনে, গোঁজামিল দেবার চেষ্টা করেছিস কি মরেছিস, হিসেব মিললেও প্রবলেম্ সল্ভ হবে না।"

বেশ কয়েক বছর পরে ঠিক ঐ কথাটাই মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরেছিল আর একজন। বেশ কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে রইল আমার দু' হাতের বাঁধনে। তারপর চাপা শ্বাসটাকে ফেলে বলল, "বেশ হয়েছে, এইবার ছাড়। এ ভাবে গোঁজামিল দিয়ে লাভ কি? যা পেতে চাইছ তা কি এভাবে পাওয়া যায়?"

ছেড়ে দিয়ে সরে বসেছিলাম। আগুনের স্রোত বইছে তখন শিরা

উপশিরার মধ্যে, হঠাৎ সেই আগুন হিম হয়ে গেল। মাথার ভেতর কপালের পেছন দিকে অনবরত হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল, কি পেতে চাইছিলাম আমি! কি পাবার আশায় হন্যে হয়ে উঠেছিলাম!

সান্নুদি আজ নেই, থাকলে আমার চেয়ে অনেক বুড়ো হয়ে যেত। তখনই সান্নুদি অন্তত বছর তিনেকের বড় ছিল। সান্নুদির স্বামী গোপেশ্বরবাবু কেন বিয়ে করেছিলেন বলা মুশকিল। চাকরি করতেন, মেসে থাকতেন, বছরে দু'বার বাড়ি আসতেন। বিয়ে করা পরিবার সান্নুদি ওর ঘর বাড়ি পাহারা দিত আর রাতের রুগী জেঠ-শ্বশুরের রাতের তেল গরম করে দিত। গোপেশ্বরবাবুর জেঠামশাই রামেশ্বরবাবু তেল মালিশ করাতেন ন'কড়ির বউকে দিয়ে। ন'কড়ি বাউরী বছরে এগার মাস জেলে কাটাতো। গোটা তিনেক ছেলেমেয়ে নিয়ে খুব বিপদে পড়েছিল বউটা, রামেশ্বরবাবুর জন্যে রক্ষে পেলে। শেষ রাতের দিকে তেলের বাটি নিয়ে ঢুকত সে রামেশ্বরবাবুর ঘরে, ভোর পর্যন্ত তেল মালিশ করা চলত। তারপর রামেশ্বর স্নানটান সেরে সন্ধ্যা। [illegible] সান্নুদিও এখন [illegible] পাট করতে লেগে গেছে।

আমার কাজ ছিল লাইব্রেরী থেকে বই এনে দেওয়া। রোজ একখানা রগরগে উপন্যাস [illegible] হত সান্নুদির। বই না পেলে সান্নুদির না কি ঘুম হত না। বই পড়া থেকে শুরু, বইয়ের পাত্র পাত্রীদের সুখদুঃখ নিয়ে ঢের আলোচনা চলত আমাদের মধ্যে। তারপর নিজের কথা শোনাতে লাগল সান্নুদি। শুনলাম ওর বিয়ের ইতিহাস। কুড়ি বছর পার হতে চলল বিয়ে হল না মেয়ের, আত্মীয়স্বজন ছ্যা-ছ্যা করতে লাগল। হেনকালে পাওয়া গেল পাত্র, দ্বিতীয়পক্ষ, বয়েস ত্রিশের ওপর, ছেলেমেয়ে নেই। বিয়ের এক বছর পরেই বউ মরে গেছে। তার আট বছর পরে বিয়ে করার প্রয়োজন হয়েছে আবার। কারণ ঘরে কেউ নেই। বুড়ো জেঠাশ্বশুরকে ও [illegible] জল দিতে হবে।

হয়ে গেল বিয়ে। সিঁথিতে সিঁদুর উঠল সান্নুদির, গোপেশ্বরের চাদরের খুঁটে আঁচলের খুঁট বেঁধে স্বামীর বাড়িতে এসে উঠল। আর প্রথম রাতেই বেশ ভাল করে বুঝতে পারল যে, বিয়েটা একটা মস্তবড় গোঁজামিল, হিসেব মিলল বটে, প্রবলেম কিন্তু সলভ হল না।

আষাঢ় মাস, আকাশ ভেঙে পড়েছে, যে ক'জন নেমন্তন্নের লোক এসেছিল, সন্ধ্যার আগেই খাওয়া দাওয়া সেরে তারা বিদেয় হয়েছে। গোপেশ্বরের দূর সম্পর্কের এক দিদি পাঁচ সাতটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছিলেন, ফুলশয্যার যোগাড় তিনিই করলেন। শহর থেকে আগের দিন তোড়া রজনীগন্ধার মালা আনিয়ে রাখা হয়েছিল। সেই মালা এক ছড়া [illegible] ফুলশয্যার সামনে গিয়ে পৌঁছল সান্নুদি। মিনিট খানেকের মধ্যে হাঙ্গামা চুকে গেল। দরজায় খিল দিয়ে গোপেশ্বর বললেন, “এসব কাপড়-চোপড় পরে শুলে ঘুমুতে পারবে না। ওসব ছেড়ে পাতলা কিছু পরে নিয়ে শুয়ে পড়। বিয়ের হাঙ্গামায় নিশ্চয় পাঁচ-সাতদিন ঘুমুতে পারোনি। এবার নিশ্চিন্ত, বিয়ে তো হয়ে গেল। বিয়ে নিয়ে তো আর মাথা ঘামাতে হবে না। নাও, শুয়ে পড় কাপড় জামা পালটে। আমার একটু কাজ আছে। এ ক'দিন বন্ধ দিতে হয়েছে। বন্ধ দিলে ক্ষতি হয়।”

বলতে বলতে গরদের পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলে মালকোঁচা মেরে নিলেন গোপেশ্বর। একখানা কম্বল চার ভাঁজ করে পাতলেন ঘরের মেঝেয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই কম্বলের মাঝখানে মাথার চাঁদি দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে ঠাং দু'খানা সোজা ওপর দিকে তুলে দিলেন। অদ্ভুত কাণ্ড, নতুন বউ সান্নুদি বোকার মতো তাকিয়ে রইল। কি ব্যাপার, পাগলের সঙ্গে বিয়ে হল না তো!

পাগল নয়, স্বামীটি যোগাভ্যাস করেন। এ আসনটির নাম শীর্ষাসন। ওটিতে সিদ্ধিলাভ হলে না কি জরা-মৃত্যু জয় করা যায়।

তারপর অবশ্য আরও দু'চার জাতের আসনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সান্নুদির, বজ্রাসন, স্বস্তিকাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন। চৌষট্টি জাতের না কি আসন আছে, সব পর পর ক'টি আসনসিদ্ধি লাভ করতে হবে গোপেশ্বরবাবুকে। সরকারী চাকরি করেন, মোটামুটি ভাল মাইনে পান। দিনে চাকরি আর রাতে যোগাভ্যাস এই নিয়েই আছেন। দু' দু'বার সংসার পাতলেন কিন্তু সংসারধর্ম পালন করতে গিয়ে নিজেকে হয়ত বদলালেন না।

আশকারা পেয়ে গেলাম। সখ্যও বেড়ে গেল। মাজামাজা রঙ, বেশ ছিমছাম গড়ন ছিল। সান্নুদির আর একটা যেন কিছু সম্পদ ছিল যা ঠিক বলে বোঝানো যাবে না। রূপ দেখলে ভয় পাবার, ভয় করাই উচিত। কিন্তু এমন সাপও আছে যার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। কালো রঙের গলনাগলা, মাথার চোখের ধারালো বাঁকানো ছাপ, দু'হাত উঁচু হয়ে ফণা ধরে যখন দুলতে থাকে, তখন কি বাসনা হয় বলতে পারি না। দু'হাতের মুঠোয় সাপটে ধরতে। বিষের কথা কি তখন মনে থাকে। সান্নুদির শরীরে সাধ হয় ঐ কালনাগিনীর দিকে যাই। দুপুর বেলা ভিজে চুল শুকোবার জন্যে পিঠের উপর মেলে, উপন্যাসের বই হাতে নিয়ে মাদুর পেতে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকত সান্নুদি, সেই সময় আমি যেতাম। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের ভালবাসা-বাসি আর চাওয়া-পাওয়া নিয়ে জোর আলোচনা চলত। উত্তেজনায় উঠে বসত সান্নুদি, দুই চোখে আগুন জ্বলে উঠত, এলোমেলো হয়ে যেত গায়ের কাপড়। আমি দেখতাম, একটা কালনাগিনী সামনে বসে মাথা দোলাচ্ছে। দেখতাম সান্নুদির গলা, গলার দুটি স্পষ্ট রেখা, চিবুক, ঠোঁট দু'খানি, নাকটি, নাকের ওপর কয়েক বিন্দু ঘাম। চোখের পানে তাকাতে পারতাম না, নিজে থেকে নজর নেমে আসত গলার নীচে। শ্বাস আটকে আসত আমার, ছোট ছোট মোচার মতো ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ দুটি জিনিসের দিকে দম আটকে তাকিয়ে থাকতাম। সে যুগে বুক-বাঁধা জামার চলন

ছিল কি না জানি না, সান্নুদি কিন্তু কিছুই পরত না। দুপুর বেলা কে আর গায়ে জামা দেয়। আঁচল গায়ে দিয়েই শুয়ে বসে কাটায় দুপুরটা সবাই, সে যুগে ঐ রকমই রেওয়াজ ছিল। তাছাড়া আমি তো সান্নুদির অনেক ছোট, আমার সামনে সেজেগুজে আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হবে কেন! সুতরাং সেই মহাবাণীটিই ফলে বসল, লাই দিলে কুকুর মাথায় ওঠে।

ছোটই ছিলাম। সত্যিই আমি অনেক ছোট ছিলাম তখন। লগুড়াহত কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে পালিয়ে এসে প্রমাণ করে দিয়েছিলাম আমি কত ছোট। অর্থাৎ কি না, হিসেব ঠিক মিলল বটে, কিন্তু গোঁজামিল দিয়ে। সেই গোঁজামিলটা ধরা পড়ল যখন, তখন আর আমি ছোট নই, অনেক বড় হয়ে গেছি। কিন্তু গোঁজামিল শোধরাবার কোন আর কোনও উপায় নেই।

সভাপতি হয়ে গিয়েছি পশ্চিমের এক শহরে। প্রবাসী বাঙালীরা সংস্কৃতি সম্মেলন করছেন। যাঁর বাড়িতে থাকতে হবে তিনি সেই শহরের গণ্যমান্য মানুষ। নামটিও বেশ, শ্রীকিষণ কুন্দন ভট্ট। ভদ্রলোকের এক ছেলে ডাক্তার এক ছেলে উকিল আর এক ছেলে ইন্‌জিনীয়ার। তিন ছেলের বিয়ে দিয়েছেন বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে। বউরা শান্তিনিকেতন থেকে নাচ গান ইত্যাদি ভালো ভাল বিদ্যে শিখে গেছে। এক কথায় যাকে বলা যায়, একটি অতি আধুনিক প্যাটার্নের আলোকপ্রাপ্ত সংসার। সংসারের কর্তা কিষণ কুন্দন ভট্টজীর সাদা গোঁফ দাড়ি, সাদা চুল। বাঙলা বই, গল্প-উপন্যাস-নাটক কিনে কিনে ছত্রিশটা আলমারি বোঝাই করেছেন। কলকাতা শহরে আজ যে বইখানি প্রকাশ হল তিন দিন পরেই সেখানিকে খুঁজে পাওয়া যাবে কিষণ কুন্দনজীর আলমারিতে। এ হেন বাঙলা সাহিত্যের ভক্তের বাড়িতে রাত্রিবাস করতে হল। প্রচুর পরিমাণে ভালমন্দ জিনিস ভোজনের পরে শুনলাম, বাড়ির গৃহিণী আমার সঙ্গে

দেখা কবতে আসবেন। আমাব বিশ্রামের যদি ব্যাঘাত না হয়—

বামশচন্দ্রঃ—কে বিশ্রাম কবতে চায়। কত বড় সৌভাগ্য আমাব, যে সাক্ষাৎ স্বযং লক্ষ্মীঠাককুণ অনুগ্রহ কবে আমাকে দর্শন দিতে আসছেন। সামান্য মানুষ, বই লিখে কোন বকমে পেট চালাই, আমাব মতো মানুষকে এতখানি ইযে, কি বলে যেন!

কিছুই বলতে হল না আব। মহামূল্যবান দবজাব পবদা সবিযে ঘবেব ভেতব পা দিলেন গিন্নী। দিয়েই এক ধমক, "থাম, যথেষ্ট আমড়াগাছি কবা হয়েছে। মা গো মা, কত বক্তেও পাবে। ঝাড়া দেড় ঘণ্টা বকে এল সভায়, বাড়িতে এসেও মুখ বন্ধ হল না। বলি, এত কথা পেটেব মধ্যে জমায় কেমন কবে শুনি? মুখচোবা এক ছোড়া, চড় মাবলেও রা কাড়ত না, তাব মুখে যেন খই ফুটছে।"

থতমত খেয়ে গিয়ে চুপ কবে বইলাম। আওয়াজ আব বেরুল না বটে, মুখ কিন্তু আমাব বন্ধ হল না।

তাবপব অনেক বাত পর্যন্ত সাহিত্য চর্চা চলল। বৌমা তিনটিকে ডাকিয়ে আনালেন গিন্নী। কর্তাটিও বসে বইলেন সামনে। একটা গল্প পড়ে শোনানো হল আমাকে। গল্পটি লিখেছেন কুন্দনজীব পবিবাব। মাঝে মাঝে তিনি লেখেন। দু'চাবটে গল্প হিন্দী পত্রিকায় ছাপানোও হয়ে গেছে।

গল্পটি শুনলাম। কর্তা ও বৌমাযেদেব সামনে অমন গল্প পেশ কবলেন পঞ্চান্ন বছব বযেসেব গিন্নী। সত্যিই কৃষ্টিসম্পন্ন সংসাব বটে!

সেই গল্পের বাঁধুনি কেমন ছিল, গল্পটা ঠিক উতবেছিল কি না, সে সব আলোচনা কবতে চাই না। গল্পেব নাযকটিব উপব আমাব খুবই কৃপা হল। হতভাগাটা একটি আস্ত বামছাগল, কি করতে এসেছিল সে, কি সে চাইছিল, তা নিজেই জানত না। নাযিকাব দেহে মনে আগুন জ্বালিযে দিযে চোবেব মতো পালিয়ে গেল।

লেখিকা সেই পুরনো কথা বলেই গল্পের উপসংহার টেনেছেন। কথাটি হল ঐ গোঁজামিল। ধ্রুবজ্যোতি সার বলতেন—গোঁজামিল দিসনে, হিসেব মিললেও প্রবলেম সল্‌ভ হবে না।

আর সান্নদি বলেছিল—এ ভাবে গোঁজামিল দিয়ে কি লাভ। যা পেত চাইছ তা কি এভাবে মেলে?

শ্রীকিষণ কুন্দন ভট্টজীর পরিবার শ্রীমতী সান্ত্বনাভট্ট খুবই বিদুষী মহিলা। তার গল্প ঐ যাকে বলে মুনশীয়ানা সেই জিনিসটা যথার্থই ছিল। গল্প শুনে জানতে পারলাম, নায়িকার এক বাতিকগ্রস্ত স্বামী ছিল। সে লোকটি যোগাভ্যাস করত। ফুলশয্যার রাতেই ম ন-কোঁচা মেরে নতুন বউয়ের সামনে শীর্যাসন করেছিল। তারপর এক গুরু-ভগ্নীর ঘরে অর্ধেক রাতে ধরা পড়ে, বেদম মার খেয়ে হাসপাতালে যায়। হাসপাতাল থেকে যখন ছাড়া পায় তখন বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে। নায়িকা তো। এখন এক বৃদ্ধে গঙ্গালাভ হয়।

পরদিন কিষণ কুন্দনজী গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে গেলেন সেই শহরে অতি বিখ্যাত জলপ্রপাত দেখাতে। জলপ্রপাতটি খুবই বিখ্যাত বটে কিন্তু এক ফোঁটাও জল পড়ছে না তখন। সেই জুন জুলাই মাসে ঢল নামবে।

ঢল কিন্তু নেমেছে এখন আমার বুকের মধ্যে। সমস্ত আবর্জনা এক ধাক্কায় কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কিষণ কুন্দনজী খুবই দামী আতর ব্যবহার করেন, পাশে বসে বুনো ফুলের গন্ধ পাচ্ছি। উনি শোনাচ্ছেন ওঁর বিবাহের কাহিনী। ওঁর পুত্র তিনটির যিনি জননী তিনি একদা যাত্রার দলে অভিনয় করতেন। যাত্রাওয়ালারা এসেছিল ওঁর কোলিয়ারীতে। প্রথম রজনীর পরেই তারা তাদের সুখ্যাত নায়িকাটিকে খোয়াল। অবশ্য বেশ কিছু অর্থদণ্ড দিতে হয়েছিল ভট্টজীকে। তা হোক, জিতে গেছেন তো তিনি। অমন পরিবার ক'টা লোকের ভাগ্যে জোটে।

মনে মনে তখন আমি হিসাব মেলাচ্ছি। নীট ওজন কম্‌সে কম

এক শ' পঞ্চাশ কিলোগ্রাম, দশ দশ বিশ কিলোগ্রাম ওজনের বুক দুটো বাদ দিলে দাঁড়াবে এক শ' ত্রিশ কিলোগ্রাম, সোনাদানা যা রয়েছে অঙ্গে তার ওজনও এক কিলোগ্রামের কম নয়। তাহলে দাঁড়াচ্ছে বাদসাদ দিয়ে এক শ' উনত্রিশ কিলো। গোপেশ্বর বাবুর পরিবার সান্নুদির ওজনটা ছিল বড় জোর চল্লিশ কিলোগ্রাম। হিসাব মেলাতে পারলাম না। এক শ' উনত্রিশ থেকে চল্লিশ বাদ দিলে যা থাকে সেটা গোঁজামিল। উননব্বই কিলো বেড়ে গেছে। অতটা কি গোঁজামিল দেওয়া যায়।

কোন প্রবলেমই সলভ হল না। খেই হারিয়ে গেল। মাথায় কুণ্ডলী সাপ কালনাগিনী যখন দু'হাত উঁচু হয়ে ফণা ধরে নাচে তখন খুবই লোভ হয় দু'হাতে তাকে সাপটে ধরতে। লাভ কি! সাপটে ধরলে সাপটা হিস হিস করে শুনিয়ে দেবে হয়তো—যা পেতে চাইছ তা কি এভাবে পাওয়া যায়।

৩

অতি অসার্থক আমার এই খেই হারানো উপন্যাসের চরিত্ররা যা পেতে চায় আর যা পায়, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। যা পেল তাই নিয়েই মশগুল হয়ে রইল। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে ওজন খানিকটা বাড়লেই হল। বাড়তি ওজনটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারলে আর কোন কথা নেই। টেনে দাও দাঁড়ি। দাঁড়ি টানবার পরে আর কি কিছু বলার থাকে, নতুন চরিত্রদের নিয়ে আবার তখন শুরু করতে হয়।

আর যে হতভাগা বা হতভাগী খাপ খাওয়াতে পারে না নিজেকে নিজের গুরুভারের সঙ্গে, তাকে নিয়েই হয় মরণ। যেমন নিশিকান্তদা।

নিশিকান্তদা শেষ পর্যন্ত খুন করতে বাধ্য হলেন। খুন করার আগে হলেন তান্ত্রিক, রক্তবস্ত্র পরে কপালে মস্ত বড় সিঁদুরের ফোঁটা লাগিয়ে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলিয়ে জোরসে সাধনা শুরু করে দিলেন। যে মানুষ সাত চড়েও রা কাড়ত না, তার মুখ দিয়ে মুহুর্মুহু ব্যোম তারা আর ব্যোম কালী ছিটকে বেরোতে লাগল। ক্ষুদিরাম রটিয়ে দিলে, বাবু রাত দশটা থেকে ভোর পর্যন্ত ঘটি ঘটি কারণ পান করেন। আনু বাগ্দীর উঠোনে টিন টিন মাল নামতে লাগল। গন্ধের চোটে বাগ্দীপাড়ার দিকে পা বাড়ায় কার সাধ্য। দলবল নিয়ে ভূষণ মোড়ল নিশিকান্তদা'র আটচালায় অষ্টপ্রহর গড়াগড়ি খাচ্ছে। ফি অমাবস্যায় বুড়ি মায়ের গাছ তলায় ধুমধাম করে পুজো, গণ্ডা গণ্ডা পাঁঠা বলি, সেই সঙ্গে মুক্তাঙ্গনে চক্রানুষ্ঠান, হৈ হৈ কাণ্ড লেগে গেল। তারপর সেই খুন, নিশিকান্তদা'র বাড়িতে নিশিকান্তদা'র ঠাকুরঘরের মধ্যে পাওয়া গেল ধড়টা, মুণ্ডটা লোপাট। সেই সঙ্গে

নিশিকান্তদাও উধাও, চতুর্দিকের বিশখানা গাঁ তোলপাড় করেও নিশিকান্তদা-কে পাওয়া গেল না।

লোকে বললে, নিশিকান্তদা-কেও খুন করা হয়েছে, খুন করে লাশটাকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। যাদের বুদ্ধি একটু মোটা তারা বলাবলি করতে লাগল, খুন করে মুণ্ডুটাকে নিয়ে নিশিকান্ত সরে পড়েছেন। কিন্তু সরে পড়লেন কেমন করে? রাত বারোটা পর্যন্ত বুড়ি মায়ের তলায় ছিলেন, অনেকে দেখেছে। তার মানে রাত বারোটার পর তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন। ভোর চারটেয় বাবুকে তামাক দিতে গিয়ে ক্ষুদিরাম মুণ্ডহীন ধড়টা দেখে চেঁচামেচি করে লোক জমা করে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় খোঁজা, চতুর্দিকের বিশখানা গাঁয়ে তোলপাড় লেগে যায়। দশ ক্রোশ দূরে শহর, গরুর গাড়ি বা মোষের গাড়ি ছাড়া যানবাহন নেই। তিন চার ঘণ্টার মধ্যে পায়ে হেঁটে শহরে পৌঁছে রেলগাড়ি চেপে পালিয়ে গেছেন নিশিকান্তদা, এ কি কখনও হতে পারে! নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছেন।

খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে অনেকে বলতে শুরু করলে কোন পুকুরে বা দীঘিতে পড়ে নিশিকান্তদা আত্মহত্যা করেছেন।

যা হবার তাই হল, মাস খানেকের মধ্যে লোকে ভুলতে বসল নিশিকান্তদা-কে। ওঁর বাড়ির নামটা পালটে গেল। শিবু ঠাকুর গলাকাটা বাড়ির পুরুত, নিত্যসেবাটা তিনি ত্যাগ করলেন না। রোজ সকালে গিয়ে সিদ্ধেশ্বরীর পুজো করে ভিজে চালগুলো গামছায় বেঁধে ঘরে নিয়ে আসতেন। ঠাকুরের পত্নী সংসার চালাবার জন্যে ঠোঙা বানিয়ে গৌর মুদীর দোকানে চালান করতেন, তেলটা নুনটা তা থেকে হয়ে যেত। গৌরের দোকান থেকে কি যেন এল এক ঠোঙায়। ঠোঙাটার ওপর নজর পড়তেই ছুটলাম আমি শিবু ঠাকুরের বাড়ি। গামছা পরে শিবু ঠাকরুণ তখন দাওয়া লেপছিলেন। খুঁট তুলে গা-গতর ঢাকবার চেষ্টা করতে করতে শুনিয়ে দিলেন যে

ঠাকুর হাটে গেছেন। তা যান, ঠাকুরের সঙ্গে আমার দরকার কি। ঝড়াক্সে একটা টাকা তাঁর পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে দাওয়ার কিনারায় কপাল ঠেকিয়ে পেন্নাম করলাম। তারপর গলা খাটো করে নিবেদন করলাম আমার আরজিটুকু। গলাকাটা বাড়ি থেকে যে সব কাগজ-পত্র নিয়ে আসেন ঠাকুরমশাই সেগুলো আমি চাই। ঠোঙা বানিয়ে যা পান ঠাকরুণ তার চেয়ে অনেক বেশী দেব। নগদ দু' টাকা সেরে কিনব। ইচ্ছে হলে সেই মুহূর্তেই তিনি দু' সেরের দাম আগাম নিতে পারেন।

করকরে চারটে টাকা বার করতে দেখে ঠাকরুণ কাবু হয়ে পড়লেন। ঘরের মধ্যে ঢুকে গামছা ছেড়ে কাপড় পরে খান দশেক বাঁধানো খাতা বার করে আনলেন। ওজন-পত্র আর করতে হল না। আর একটি টাকা খসাতেই থাউকো দরে খাতাগুলো আমার হস্তগত হল। তাড়াতাড়ি আমাকে বিদেয় করতে পারলে বাঁচেন তখন ঠাকরুণ, টাকা ক'টি সামলাতে হবে। ঠাকুর যদি টের পান ঠাকরুণের হাতে টাকা আছে তাহলে সব যাবে আফিমের দোকানে। ওকে কথা দিতে হল যে লেনদেনটা কাকে বকে টের পাবে না। উনিও আমায় কথা দিলেন যে গলাকাটা বাড়ি থেকে কাগজ-পত্র যা নিয়ে আসবেন ঠাকুরমশাই সবই উনি আমাকে বেচবেন। ঠোঙা বানাবার জন্যে পুরনো খবরের কাগজ আমি যোগাড় করে দেব।

নিশিকান্তদা'র হাতের লেখা আমি চিনতাম। আমাদের অ্যামেচার পার্টিতে যে সব নাটক হত সেই সব নাটকের পার্টগুলো নিশিকান্তদা আলাদা আলাদা করে লিখে দিতেন। ওঁর লেখা পড়ে অনেকবার অনেক পার্ট মুখস্থ করেছি। যাকে বলে মুক্তার মতো হস্তাক্ষর, এতটুকু কাটাকুটি নেই, একটি বানান ভুল নেই। গড়গড় করে পড়ে ফেললাম সেই খাতাগুলোয় যা ছিল। আত্মকথা লিখে রেখে গেছেন নিশিকান্তদা। আত্মকথা নয় আত্মচিন্তা। সেই আত্ম-চিন্তার খানিকটা এখানে তুলে দিচ্ছি।

কি করে এটা সম্ভব হল!

যেটা সম্ভব হল সেটা নিশিকান্তদা কল্পনাও করতে পারেননি। তাই ঐ মস্ত বড় একটা বিস্ময়ের চিহ্ন। সেই বিস্ময়ের ব্যাপারটা কী?

বাস্তবিক পক্ষে ওকে কি আমি চিনতাম? সাত বছর ন' মাস তের দিন আগে জানতাম কি আমি যে মালা নামের কেউ কোথাও আছে? আলো সানাই শাঁক উলু প্রচণ্ড হৈ চৈ আর প্রবল উত্তেজনা, চোখে চোখে দেখা হল, মালাবদল হল, ফুরিয়ে গেল। হ্যাঁ, একটা দিক চুকে গেল একেবারে। মেনে নিলাম, সন্তুষ্ট চিত্তে স্বীকার করলাম নিজের ভাগ্যকে। আর চিন্তা নেই, মাথা ঘামিয়ে আর মরতে হবে না অজানার জন্যে। জানা হয়ে গেছে, যা পাওয়ার পাওয়া হয়ে গেল। নিরুদবেগে বাকী জীবনটা কাটানো যাবে।

হায় নিরুদ্বেগ!

একটা সস্তা কথা হামেশা সবাই কপচায়। কথাটি হল কাম। কাম হচ্ছে সেই আগুন, যে আগুন আমাদের মধ্যে থাকার দরুণ আমরা পাগল হয়ে উঠি। আমরা বলতে আমি নারী ও পুরুষ দু' জাতকেই বোঝাতে চাচ্ছি। আমি আর মালা, আমরা প্রায় খেপে উঠেছিলাম। কিসের তাড়নায়? ঐ কাম, কিন্তু কামের জন্মদাতার নাম কেউ জানে? কাম বলতে যা বোঝায় তার উৎপত্তির কারণ কেউ বলতে পারে?

আমি পারি। ঝাড়া কুড়ি বাইশ দিন প্রতি মুহূর্তে মর্মে মর্মে আমি টের পেয়েছি কাম কোথা থেকে জন্মায়। উদ্‌বেগ হচ্ছে কামের উৎপত্তি স্থল। সেই উদ্‌বেগটি কি?

আমি মরব তা আমি জানি। মা বাবা সবাই একদিন মারা যাবেন তা আমার জানা আছে। জ্ঞান হবার পর থেকেই দেখছি মানুষ মরছে। সাপে কাটছে বাঘে মারছে আগুনে পুড়ছে জলে ডুবছে বজ্রাঘাত পড়ছে মাথায়। তারপর আছে মারামারি করে

মরা।' জ্বর-কলেরা তো আছেই। না খেতে পেয়ে মরা বা অত্যধিক খেয়ে পিলে ফেটে মরা, মরবার জন্যে কত রকমের পথ খোলা আছে তার হিসেব কে দেবে। মোটের ওপর মরণকে নিয়েই জন্মেছি আমরা, মরণকে নিয়েই ঘর করছি, তাই মরণকে আমরা সভাই কেউ খুব বেশী পরোয়া করি না। তা হলেও একটা বিশ্রী জাতের উদ্‌বেগ আমাদের মনের তলায় ঘাপটি মেরে থাকে। সেটা হচ্ছে কে কখন মরবে তা আমরা জানি না। মালাকে যেদিন পেলাম সেদিন, খাট-আলমারি বাক্স-প্যাঁটরা গহনা-পত্র বাসন-কোসন সবই পেলাম মালার বাপের কাছ থেকে, পেলাম না শুধু একখানা দলিল! কত দিনের জন্যে তাঁর কন্যে রত্নটি আমার ঘর করতে এলেন সেটা তিনি লিখে দিলেন না। কন্যে রত্নটির সঙ্গে এক অদৃশ্য যন্ত্রণা তিনি আমায় গছালেন। কখন কোন্ মুহূর্তে বউটি আমার হাত পিছলে পালাবে এই উদ্‌বেগটিও মালার সঙ্গে উপরি পাওনা হল। তার আগে ছিল বাবা কবে মারা যাবেন মা কবে মারা যাবেন ভাইটা যদি মারা যায় বোনটা, কিছু হবে না তো ইত্যাদি গোটা সাতেক উদ্‌বেগ, আর একটা বাড়ল। বোঝার ওপর শাকের আঁটি।

মা বাপের ওপর টান, যাকে সবাই ভক্তি বলে, ভাই বোনের ওপর টান যার নাম হচ্ছে স্নেহ ভালবাসা, পাড়া-পড়শী বন্ধু বান্ধব চেনা-জানা যার ওপরেই যে জাতের টান থাকুক, সব জাতের টানই জন্মেছে ঐ উদ্‌বেগ থেকে। কে যে কখন খসে পড়বে তা আমরা জানি না। তাই আমরা একে অপরকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকি। সদা সর্বক্ষণ আঁতকে বেঁচে আছি আমরা। ঐ আঁতকে থাকার দরুণই একে অপরের জন্যে প্রাণ দিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে মরণ দাঁত বার করে হাসছে, হাত বাড়িয়ে ছুঁলেই হয়। এই হল আমাদের জীবন, এই দুশমন জীবনকে বরদাস্ত করতে হলে কামকেও বরদাস্ত করতে হবে। কামই হল একমাত্র দাওয়াই যা

আমাদের ঐ উদ্‌বেগ থেকে কিছুক্ষণের জন্যে রেহাই দেয়। কাম জন্মায়ও কিন্তু ঐ উদ্‌বেগ থেকে, এইটুকুই হল মজা।

মালার পেটে বাচ্চা এল।

একটা থেকে আর একটা উৎপত্তি। বউটি কবে খসে পড়বে এই উদ্‌বেগ থেকে যার উৎপত্তি হল। তার ভদ্র নাম হচ্ছে প্রেম, সেই প্রেমই আবার জন্মদান করল আর এক উদ্‌বেগকে। পেটে বাচ্চা এল মালার। একশ' গুণ বেড়ে গেল মালার ওপর টান। কি বিপদেই পড়া গেল বাবা! ছেলে হতে গিয়ে কিছু একটা যদি হয়!

কিছু একটা তো হচ্ছেই হরদম। ছেলে হতে গিয়ে অমুকের বউ অমুকের মেয়ে অমুকের নাতনী ভাইঝী বা ভাগ্নে-বউ একদম খসে পড়ছে। এখন উপায়! যদি একটা কিছু ঘটে বসে!

মালার পানে চোখ মেলে তাকাতে পারি না। মুখে কিন্তু খুবই বড়াই করি। ওকে সাহস দিই, কিচ্ছু হবে না, বাবা তো বলেছেন শহর থেকে ডাক্তার আর নার্স আসবে। যাই বলি না মুখে, বুক ঢিপঢিপ করে। আমার বুকের ওপর মাথা রেখে সেই ঢিপঢিপুনি মালা শুনতে পায়।

কি উদ্‌বেগ! কি উৎকণ্ঠা! আর সেই সঙ্গে কি টান!

চেনা জানা যতগুলো দেব-দেবী ছিল সকলের কাছে বেপরোয়া মানত করতে শুরু করলাম। কে জানে অত মানত শোধ দেব কেমন করে!

দেব-দেবীদের মধ্যে একজনের কথা খেয়াল করে উঠতে পারিনি। তাই তিনি শোধ নিতে চাইলেন। লোকে বলে মায়ের দয়া, পেটে তখন মালার পাঁচ মাসের বাচ্চা, মায়ের দয়া হল। একদম যার নাম চর্মদল, চর্মদল বসন্ত হল বসন্তদের মধ্যে নৈকষ্য কুলীন। হারাণ কবিরাজ মশাই খড়ম খটখটিয়ে এসে এক নজর দেখেই ফিরে গেলেন। বাবাকে কি যেন বলে গেলেন, প্রত্যেকের মুখ শুকিয়ে

গেল। দু' দিন পরেই বোঝা গেল ব্যাপারটা, আপাদমস্তক এমন ভাবে ছেয়ে গেল গুটিতে যে একটা থেকে আর একটাকে আলাদা করে চেনা যায় না। বসন্তের নাম চর্মদল, যার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে দিন পাঁচেকের মধ্যে সমস্ত চামড়ার নিচেটা পুঁজে ভরে উঠবে। মালার ধারে কাছে যেতে দেবে না আমাকে, বউ মরে মরুক, ছেলে বেঁচে থাকলে আবার বিয়ে দেওয়া যাবে।

মাথায় খুন চেপে গেল। রাত দশটায় পালালাম। সমস্ত রাত ছুটে নদীর ধারে পৌঁছলাম। সাঁতরে নদী পার হয়ে নয়নচাঁদ আউলের আখড়ায় যখন পৌঁছলাম তখন সবে সূর্যোদয় হচ্ছে। আউলকে পাওয়া গেল, আছড়ে পড়লাম পায়ের ওপর। ওষুধ বাতলালেন। একটা মশারি চাই আর চাই কয়েক সের সাদা ধুনো। মশারির মধ্যে রোগিণীকে ছুঁয়ে দিবা-রাত্র বসে থাকতে হবে একজনকে। একটার পর একটা ধুনুচি ভরে টিকের আগুন দিতে হবে মশারির ভেতর। সেই আগুনে অষ্টপ্রহর ধুনো পোড়াতে হবে। ধুনোর ধোঁয়ায় দম আটকে আসবে, তবু বসে থাকতে হবে রোগিণীকে ছুঁয়ে। তিন দিন তিন রাত সমানে ঐ ভাবে ধুনো পোড়ালে রোগিণীর হুঁশ হবে। তারপর আর সাতদিন সাতরাত চালাতে হবে ধুনোর ধোঁয়ায় সেঁকা, নিজে থেকে পুঁজ শুকিয়ে যাবে।

"কিন্তু এই শবসাধনা কে করবে বাবা?" আউল জানতে চাইলেন।

জবাব দিলাম না। আবার দৌড়, গঙ্গা পার হয়ে মরীয়া হয়ে ছুটলাম। দুপুর প্রায় পার হতে চলেছে, ছেলের জন্যে কান্নাকাটি পড়েছে বাড়িতে, জ্যান্ত ছেলে ফিরে আসাতে সবাই হাঁফ ছাড়লো। চোখ মুখ শরীরের দশা দেখে কেউ বাধা দিতে সাহস করলে না। সোজা গিয়ে ঢুকলাম রোগিণীর ঘরে। খাট থেকে নামিয়ে রোগিণীকে তখন মেঝেয় শোয়ানো হয়েছে. মাছি ভনভন করছে

মুখেব ওপর, জ্যান্ত কিনা বোঝাই যাচ্ছে না। বসে পড়লাম পাশে, সবাইকে শুনিয়ে দিলাম আউল যা বলেছেন। বিয়েতে পাওয়া মশাবিটা তোলা ছিল, সেটা এনে টাঙিয়ে দিল কেউ! এল ধুনুচি টিকে ধুনো। শুরু হল আমাব শবসাধনা। সমানে দশ দিন দশরাত ছুঁয়ে বসে রইলাম সেই মড়া। ধোঁয়ার চোটে চোখ প্রায় কানা হয়ে গেল। যাক, মবণকে তো মুখোমুখি দেখা গেল।

সেই প্রথম টেব পেলাম কাম কি। কাম আর মরণ এক জিনিসেবই এপিঠ ওপিঠ। ওব একটাব সঙ্গে যদি পবিচয় হয় তাহলে অপবটাও অচেনা থাকে না।

সেই প্রথম বুঝতে পাবলাম, মালাকে আমি চিনিও না জানিও না। মালাব জন্যে আমি জান কবুল কবে দশদিন দশরাত শবসাধনা করিনি, নিজেব জন্যে যা কবাব কবেছি! বক্ষা পেল মালা, বাচ্চাটা পেট থেকে পড়ে গেল, পচা মড়া। মড়া পচা গন্ধ পুঁজ বক্ত ছু'হাতে সাফ কবতে হল আবও সাত দিন ধবে। কে ঢুকবে ঘবে? যমেব সঙ্গে লড়াই চলছে যেখানে, সেখানে কে মাথা গলাতে যাবে।

একুশ দিনেব দিন আবাব এলেন হাবাণ কবিবাজ মশাই। বলে গেলেন, ঐ নিদানেব বিধান তাঁর শাস্ত্রেও না কি আছে। ধুনোর ধোঁয়ায় বসন্তেব বিষ নষ্ট হয়। কিন্তু জান কবুল কবে সতেব দিন রুগী ছুঁয়ে কে বসে থাকবে মশাবিব মধ্যে। একটি বাবেব জন্যে রুগী ছেড়ে ওঠা চলবে না। বিকাবেব রুগী বিভীষিকা দেখে। বিভীষিকা দেখে চমকে উঠলেই মাবা যায়।

ঠিক তাই, বিভীষিকাই দেখত মালা। কানেব কাছে মুখ নিয়ে বাবকয়েক ডাকাডাকি কবলেই শান্ত হত। একুশ দিনের দিন বেশী করে ঘি দেওয়া একটু হালুয়া কোনও বকমে গিলতে পাবল। তখন আমাকে জোর কবে তুলে নিয়ে গেলেন বাবা। স্নান করলাম একুশ দিন পরে, ভাত খেলাম। একুশ দিন, দিনে রাতে ছু'বার চা খেয়েই কেটেছে। তা ঠিক, উদ্‌বেগ কিন্তু নাশ হল। সেই সঙ্গে ঐ

যাকে বলে কাম সেই জিনিসটাও কর্পূরের মতো উবে গেল। মালা মানে মালা, রক্তে মাংসে গড়া আমারই মতো একটা জীব। কোনও রহস্য নেই আর মালার মধ্যে! এতটুকু রোমাঞ্চ হয় না ছুঁলে। সব থেকে বড় কথা মালার চোখ দুটিতে আর বিদ্যুৎ খেলবে না কখনও। প্রাণ বাঁচল, গায়ে মুখে কোথাও বিশেষ দাগও রইল না, চোখ দুটি কিন্তু নষ্ট হয়ে গেল। চোখের জায়গায় চোখের চিহ্ন মাত্র নেই। রক্তবর্ণ দুটো গর্ত আমার পানে তাকিয়ে ভেঙচাতে লাগল। সোনার ফ্রেমে কালো কাচ বসিয়ে ঢেকে দেওয়া হল সেই গর্ত দুটো, লজ্জার হাত থেকে আমি রেহাই পেলাম।

লজ্জা। হ্যাঁ, লজ্জা বৈকি। কেন আমায় ওভাবে বাঁচাতে গেলে, এই জাতের একটা প্রশ্ন করল মালা। জবাব দিতে পারলাম না। নিদারুণ লজ্জাই পেলাম। সত্যিই তো ওর চোখ দুটো বাঁচাতে পারিনি।

এর পর অনেকগুলো পাতায় আছে নিশিকান্তর গুপ্ত সাধনার বৃত্তান্ত। মালা অন্ধ হয়ে বসে রইল ঘরে, নিশিকান্তদা গুপ্ত সাধনা করতে গুপ্ত ভাবে আউলদের আখড়ায় ভিড়ে গেলেন। সেই পরমার্থ সাধনের আসল কথাটি হচ্ছে ঐ কাম। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কামকে জাগাও। ঐ আগুন তোমারই মধ্যে রয়েছে, কিছুতেই ঐ আগুনকে নিভতে দিও না। দিবা রাত্র অষ্টপ্রহর পোড়াও নিজেকে ঐ আগুনে, মন বুদ্ধি চৈতন্য সমস্ত আহুতি দাও। ন্যায় অন্যায় ধর্ম-অধর্ম সব রকমের হৃদয়বৃত্তি যখন পুড়ে ছাই হবে তখন আর ছিটেফোঁটা খাদ থাকবে না। আসল আমিটিকে চিনতে পারবে। সেই আমির উদ্‌বেগ নেই, অশান্তি নেই, ছোকছোকানি নেই। সেই আমি তখন আউল, তখন সে প্রাণ দিয়ে গাইতে পারে—

দেখ না মন নেহার করে।

আছে এক বস্তু চাপা, রসে ঢাকা রসিক জনার অন্তরে।

দিতে পারে, সেই নারীই হল নারী। বাকী সবাই রক্ত মাংস মেদ মজ্জা হাড় মল মূত্র ইত্যাদি কতকগুলো বস্তুর পিণ্ড। ঐ পিণ্ড অবিশ্রান্ত চটকাতে থাকলে কাম মরে ঠিকই কিন্তু নারীর আশ্রয় না পাওয়ার হাহাকারটা বেঁচে থাকে। ফিরতে হল নিশিকান্তদাকে, আউলরা ওঁকে পরমার্থের সন্ধান দিতে পারল না। সোনার ফ্রেমে কালো কাঁচ বসানো চশমা পরে ঘরে রয়েছে মালা। বড় মানুষের পুত্রবধূ বড় মানুষের কন্যা। সারা দেহে অবিশ্রান্ত খাঁটি দুধের সর মাখাতে মাখাতে আর কচি ডাবের জলে স্নান করাতে করাতে বিদকুটে ব্যাধির সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলা হয়েছে। রূপ লাবণ্যের জোয়ার বইছে মালার দেহে। কিন্তু সে দেহের আর এতটুকু দাম নেই নিশিকান্তদার কাছে। ঐ দেহটাকে উনি ভালভাবে চেনেন। পুঁজ রক্ত মড়াপচা গন্ধ আরও কত কি। হঠাৎ তিনি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে বসলেন —বাস্তবিক পক্ষে ওকে কি আমি চিনতাম? আট বছর ন' মাস তের দিন আগে জানতাম কি আমি যে মালা নামে কেউ কোথাও আছে?

সঠিক হিসেব। ফি বছর ছেলের বিয়ের দিনে নিশিকান্তদার বাবা লোকজন ডেকে ভুরিভোজন দিতেন। বিয়ের পর ছ'বার সেই উৎসব হয়ে গেছে। বউ অন্ধ হবার পরেও দু'বার হয়েছে, আড়াই মাস পরে আবার হবে। বেঁকে বসলেন নিশিকান্তদা, আর দরকার নেই। ফি বছর লোকজন ডেকে উৎসব করে কি স্মরণ করা হচ্ছে? যা স্মরণ করার আয়োজন, যত তাড়াতাড়ি তা মন থেকে মুছে যায় সেই চেষ্টাই করা উচিত।

কেন উচিত?

আবার নিশিকান্তদার খাতার পাতা থেকে শোনাতে হবে। নিশিকান্তদা লিখছেন—

মালার কাছে আমি আশ্রয় পাবার আশায় ফিরে এসেছিলাম।

অকপটে সমস্ত শোনালাম মালাকে, বোঝাবার চেষ্টা করলাম, 'নারী-দেহের ওপর আর আমার ছিটেফোঁটা মোহ নেই। ঘরের বাইরে বেরোবার আর সাহস নেই আমার, লুকিয়ে থাকতে চাই আমি।' আমাকে আড়াল করে আগলে রাখো।

খুবই সামান্য কথায় অসামান্য জবাব দিল মালা, "আমায় ছুঁয়ে দিও না।"

আমার মতো অশুচিকে ছুঁলে মালার অতি পবিত্র সতীত্ব ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। নেড়ী কুত্তার পিঠে এক ঘা বসিয়ে দিলে সে যেমন কেঁউ কেঁউ করতে করতে সরে পড়ে সেই ভাবে সরে পড়লাম। আশ্রয় পাওয়ার নেশা ছুটে গেল। পরদিনই আলাদা ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা করতে হল। তাতেও শান্তি হল না, বড়লোক বাপকে ডাকিয়ে এনে বিলকুল শুনিয়ে দিলে মালা, তিনি মেয়ে নিয়ে চলে গেলেন। বছর বছর বিয়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধটা বন্ধ হল।

বাবা মারা গেলেন। বিষয় সম্পত্তি ভাইকে বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। শান্তি পেতে হবে। খুঁজে দেখতে হবে কোথায় শান্তি পাওয়া যায়। কয়েকটা নামজাদা তীর্থে ঘোরার ফলে শান্তি খোঁজার নেশাটাও ছুটে গেল। তীর্থ স্থানে ধর্ম ওজন দরে বেচাকেনা হয়। দরদস্তুর করার জন্যে ছুঁচে দালালরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির চোটে মেছোহাটাকেও হার মানায় তীর্থস্থানগুলোর ধর্মবাজার। ফিরতে হল। ফিরে এসে নন্দরানীর কাছে আশ্রয় পেলাম।

নন্দরানীও আমার মতো শান্তি পাবার আশায় তীর্থে তীর্থে ঘুরে মরছিল। রক্তবস্ত্র ত্রিশূল কমণ্ডলু-ধারিণী এক সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কন্যাকুমারীতে। সন্ন্যাসিনী বাঙলা দেশের মেয়ে শুনে তাঁর আশ্রমের ঠিকানা জানতে চেয়েছিলাম। ঠিকানা দিলেন, আমার নাম ধাম পরিচয়ও নিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তাঁর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরে শুনলাম কে একজন সপ্তাহে একবার

আমার খোঁজে আসে। দিন চার পাঁচ পরে সেই লোকটি এল। সবিনয়ে নিবেদন করলে, তার মনিবের সঙ্গে একটি বার দেখা করতে যেতে হবে। কিন্তু মনিবটি কে?

লোকটি একখানা ভিজিটিং কার্ড বার করে হাতে দিলে। পড়ে দেখলাম, নন্দরানী মিত্র—অ্যাডভোকেট। মেয়ে অ্যাডভোকেট। হাইকোর্টে আজকাল মেয়েরাও ওকালতি করে নাকি। কিন্তু, হাইকোর্টের মেয়ে উকিলের সঙ্গে দেখা করতে হবে কেন। আইন আদালতের ত্রিসীমানায় আমি ভুলেও পা মাড়াই না।

বিস্ময়ের অন্তরালে লোকটি আমার মুখের অবস্থা দেখে আঁচ করতে পারল বোধ হয় কিছু। অনুগ্রহ করে হেসে বললে, আমি নাকি নন্দরানী মিত্র অ্যাডভোকেটকে চিনি। কন্যাকুমারীতে আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি তাঁর ঠিকানাও দিয়েছিলেন।

এবার নন্দরানী অ্যাডভোকেটের ঠিকানার ওপর নজর পড়ল। বালিগঞ্জ। এক সন্ন্যাসিনী তাঁর আশ্রমের ঠিকানা দিয়েছিলেন, সেটা বালিগঞ্জে। নন্দরানী অ্যাডভোকেট বোধহয় সেই সন্ন্যাসিনী। কিন্তু যাই হোক, ব্যাপারটা একবার দেখে আসা যাক।

তখনই রওয়ানা হলাম লোকটির সঙ্গে। দুপুর বেলা লোকটা আমাকে হাইকোর্টে হাজির করলে। অ্যাডভোকেট নন্দরানী মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আইনের বই খুলে কী যেন বকছিলেন। খানিকটা তফাতে বসে তাঁর মুখপানে তাকিয়ে থ বনে গেলাম। কুচকুচে কালো গাউনে গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা অ্যাডভোকেট মহোদয়াকে রক্তবস্ত্র পরালে আর ত্রিশূল কমণ্ডলু হাতে দিলে কেমন দেখায় তাই ভাবতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মামলা শেষ হল। আমার সামনে এসে নন্দরানী চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এতদিন মশাই ছিলেন কোথায় শুনি?"

তৎক্ষণাৎ হাওয়া। নন্দরানীর গাড়িতে নন্দরানীর পাশে বসে চলে গেলাম নন্দরানীর বাড়িতে। নন্দরানীই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে

গেলেন। নামজাদা উকিলের বাড়ি যেমন হয় তাই। নিচের তিনখানা ঘরে আইনের কেতাব বোঝাই গণ্ডা গণ্ডা আলমারি, টেবিল চেয়ার নথিপত্র। ওপরের ঘরগুলোয় আইন আদালতের নাম গন্ধ নেই। একখানা ঘরে নন্দরানীর ইষ্টদেবতার আসন, আর একখানায় ইষ্টগুরুর খাট বিছানা। তৃতীয় ঘরখানায় নন্দরানী নিজে থাকেন, দেওয়ালের গায়ে বসানো ছুটো আলমারি ছাড়া কিছুই দেখা গেল না। একটা আলমারি খুলে কম্বল বার করে মেঝেয় বিছিয়ে দিলেন নন্দরানী। তারপর জোড় হাতে নিবেদন করলেন বসবার জন্যে। বসে পড়ে ভাবতে লাগলাম, মতলবটা কি!

বেশীক্ষণ ভাবতে হল না। গোটা ছয়েক সোডার বোতল নিয়ে এসে একটা বাচ্চা চাকর এক পাশে সাজিয়ে রেখে গেল। আদালতের সাজপোশাক ছেড়ে রক্তবর্ণ সিল্কের শাড়ি জড়িয়ে এক বোতল হুইস্কি আর ছুটো রুপার গেলাস নিয়ে নন্দরানী দেখা দিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে আপনি আজ্ঞে গোল্লায় গেল, সহজেই ছু'জনের মুখ দিয়ে তুমি তোমার বেরোতে লাগল। এক ঘণ্টা পরে শুয়ে পড়লাম সেই কম্বলের ওপর। অনেক রাতে ঘুম ভাঙল। চুপি চুপি গিয়ে পাশের ঘরে উঁকি মেরে দেখি, ইষ্টদেবীর আসনের সামনে নন্দরানী শিরদাঁড়া সোজা করে বসে আছে। একটা তেলের প্রদীপ জ্বলছে ঘরে, অতি সুগন্ধ ধূপ পুড়ছে। নেশার ঘোর তখনও ষোল আনা কাটেনি, বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। দরজার বাইরে বসে পড়ে নন্দরানীর অপর্যাপ্ত এলোচুলের পানে তাকিয়ে রইলাম।

নিবিড় অন্ধকার। নিবিড় অন্ধকারে পেছনটা ঢেকে গেছে নন্দরানীর। মনে হল, ঐ অন্ধকারের অন্তরে ডুবে আছে সে। মনে হল আমিও যদি ঐ অন্ধকারের অন্তরে আশ্রয় পেতাম!

তারপর নিশিকান্তদা লিখেছেন তাঁর দীক্ষা নেবার ইতিহাস। নন্দরানীর গুরুদেবের কাছে তিনি দীক্ষা নিলেন। অভিষিক্ত হলেন।

পঞ্চমকার সহযোগে সাধন ভজন শুরু হল। নিজের বাড়িতে ইষ্ট-দেবীর আসন পাতা হল। নন্দরানীর নির্দেশ মতো ঘরখানি সাজানো হল। কৃষ্ণাষ্টমী কৃষ্ণা চতুর্দশীতে চক্রানুষ্ঠান, বড় ঘরের সাধক সাধিকারা গাড়ি হাঁকিয়ে এসে সেই সব অনুষ্ঠানে যোগ দিতে লাগলেন। ঠিক দুটি বছর হৈ চৈ করে কেটে গেল। তারপর বলা নেই কওয়া নেই নিমু মিত্তির বার-এট-ল. উড়ে এলেন বিলেত থেকে। খুব ঘটা করে হাইকোর্টের উকিল নন্দরানী মিত্তিরকে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হল। ভয়ানক নামজাদা হোটেলে বিরাট এক কক্‌টেল পার্টি হল। পরদিন ওয়াইফ্ নিয়ে মিত্তির সাহেব প্লেনে উঠলেন। প্লেনে চড়বার আগে নন্দরানী এক ফাঁকে নিশিকান্তদার কানে মুখ ঠেকিয়ে বলে ফেললেন, "সাবধানে থেক, দরকার পড়লে তার কর, উড়ে চলে আসব।"

আশ্রয় ফরসা।

যে নারী নিশিকান্তদার হৃদয়টিকে মরতে দিল না, যে নারীর জন্যে নিশিকান্তদা সব ছেড়ে বড় সত্যের নাগাল পেয়ে গেলেন, বুঝতে পারলেন যে নারী শুধু একটা নারীদেহ নয়, দেহটা বাদ দিলেও নারী নারীই, সেই নারী যখন তাঁকে ছেড়া জুতোর মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উড়ে চলে গেল, তখন থেকেই তিনি আনু বাগ্দীর ঘরে চাল গুড় পাঠাতে শুরু করলেন। আশপাশের গাঁ গুলোয় যতগুলো তাড়িখোর আর মাতাল ছিল সবাই ছেকে ধরল ওঁকে। ইষ্টদেবীর সাধনা প্রকাশ্যেই বুড়ি মায়ের তলায় শুরু করে দিলেন। ভেতর থেকে যখন ভয়ানক চাপ পড়ত বুকে, তখন ব্যোম কালী ব্যোম তারা বলে ডাক ছাড়তে লাগলেন। একদম বেপরোয়া, কে তখন তাঁকে রুখবে। সেই সময় মালা ফিরে এল। শ্বশুরমশাই মেয়েকে দিয়ে গেলেন। মালা স্বামীকে ধরতে ছুঁতে পারল না। অন্ধ মালাকে স্নান করাতে হবে, খাওয়াতে হবে, মালার পুরনো ঝি ক্ষুদিরামের বোন আবার কাজে লেগে গেল। সাতদিনের মধ্যে নিশিকান্তদা সুখবরটি শুনলেন,

মালার পেটে বাচ্চা আছে। ক্ষুদিরামের বোন ননীবালা গদগদ হয়ে পাড়াময় রটিয়ে বেড়াতে লাগল, দাদাবাবুর ছেলে হবে, বংশটা রক্ষা পাবে।

নিশিকান্তদা মনে মনে হিসেব কষে বার করলেন, তিন বছরের ওপর মালা বাপের বাড়ি কাটিয়ে এসেছে। সঠিক হিসাব, এতটুকু এধার ওধার হবার জো নেই।

মনে পড়ে গেল সেই পুঁজ রক্তের স্রোত, সেই মড়াপচা গন্ধ। গতবার মরা ছেলেটা যখন মালার পেট থেকে পড়ে গেল তখন দু'হাতে তিনি সেই পুঁজ রক্ত সাফ করেছিলেন। আরও অনেক কিছুই মনে পড়ে গেল। সামান্য কথায় অসামান্য জবাব দিয়েছিল মালা, ছুঁতে মানা করেছিল। অশুচি নিশিকান্তদা ছুঁয়ে দিলে মালার ধপধপে সাদা সতীত্বের রঙ ফিকে হয়ে যাবে। নিশিকান্তদা যা লিখে গেছেন তার উপসংহারটুকু এবার শোনাই।

অন্য কেউ হলে নিশ্চয়ই খেপে উঠত। আমি হেসে ফেলেছিলাম, বহুদিন পরে প্রাণ খুলে হেসেছিলাম ইষ্টদেবীর সামনে বসে। চমৎকার, সত্যিই চমৎকার একটা সংবাদ। শুভ সংবাদ তো বটেই। নিশিকান্তবাবুর ছেলে হবে, নিশিকান্তবাবুর পিতৃপুরুষের পিণ্ডের ব্যবস্থা হচ্ছে। কেউ কিছুই সন্দেহ করতে পারবে না। সবাই জানবে যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে। শ্বশুর বাড়ি যাওয়া আসা করতেন নিশিকান্তবাবু, অন্ধ স্ত্রীকে ত্যাগ করেননি। নিজের জান কবুল করে যমের গ্রাস থেকে স্ত্রীকে ফিরিয়ে এনেছেন। অন্ধ হয়ে গেল বৌটি তাই তাকে বাপের বাড়ি রেখে দিয়েছিলেন। ছেলে হবে বলে আবার নিজের কাছে আনিয়ে নিলেন। আদর্শ স্বামীর আদর্শ স্ত্রী, সতীসাধ্বী তো একেই বলে।

প্রতিশোধ নেবার কথা একটিবারের জন্যে মনেই উঠল না। কেলেঙ্কারি করতে যাব কেন? বাপ-মা মরা একটা ছেলেকে আমি

উঠোনের মাঝখানে দাঁড়ানো নারকেলগাছটার মাথায়। ঠাকুর ঘরের জানালা দিয়ে দেখলেন নিশিকান্তদা দাউ দাউ করে গাছটা পুড়ছে। আকাশ ভাঙা বৃষ্টিতেও সে আগুন নিভল না। পাকা দেওয়াল টিনের চাল মস্ত একখানা ঘরে ওঁর বাবার আমলে গরু থাকত, সেই চালখানা মড়মড় করে উপড়ে নিয়ে গেল বাতাস। নারকেলগাছ পোড়া আগুনের আলোয় নিশিকান্তদা দেখলেন, একটা আস্ত গরুর গাড়ি উড়ে এসে আছড়ে পড়ল জ্বলন্ত গাছটার গোড়ায়। ছোট চাদরটি কাঁধে নিয়ে তৈরি হলেন তিনি, মালার ঘরে যেতে হবে। তৎক্ষণাৎ ভয় পাবে মালা, ক্ষতি হবে ওর পেটের সন্তানের, আবার একটা বিপদ ঘটিয়ে বসবে। যেতেই হবে মালার কাছে, এই মহাপ্রলয়ের রাতে মালাকে একলা রাখা যায় না। আহা বেচারী [illegible]। [illegible] নিশিকান্তদা মহাপ্রলয়ের মধ্যে পা দিলেন।

[illegible] তিনি লেখেন [illegible] শুধু [illegible] জানালা দেওয়ালের [illegible] থেকে উপড়ে গিয়েছিল। সেইখান দিয়ে অন্দরমহলে ঢুকে দোতলায় উঠলেন। তারপর মালার ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। ঘরে কিন্তু তিনি ঢোকেননি, মালাকেও ডাকেননি। একটা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে, কি হচ্ছে দেখেছিলেন। জানলাটা ছিল খোলা, কেবল কাচের পাল্লা বন্ধ ছিল, আলো জ্বলছিল। ওরা দু'জন জেগে ছিল। কি অবস্থায় ছিল ওরা, কি করছিল তখন, তা নিশিকান্তদা লেখেননি। শুধু লিখেছেন, পাথর হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, সেখান থেকে নড়বার পর্যন্ত শক্তি ছিল না। হুঁশ হল তখন ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে ওরা শুয়ে পড়েছে। ফিরে গেলেন নিশিকান্তদা ইষ্টদেবীর ঘরে, [illegible] বসে পড়লেন। ইষ্টদেবীর সামনে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে অভিমান ভরে বলতে লাগলেন—শক্তি দাও মা, সহ্য করার শক্তি দাও, আর যে পারিনে।

শক্তি পেলেন নিশিকান্তদা। তাঁর বুকের ভেতরে যে ঝড়-ঝঞ্ঝা উঠেছিল তা থামল। পরদিন সকালে মালার সেই ভাইটিকে ডেকে এ কথা সে কথা আলাপ করলেন। দিদির বাড়িতে থাকতে কষ্ট হচ্ছে কি না জানতে চাইলেন। ছোকরা আশকারা পেয়ে গেল। এ কদিন ভগ্নীপতির সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবার সাহস হয়নি তার, রক্তবস্ত্র পরা কপালে সিঁদুরের ফোঁটা লাগানো ভগ্নীপতিটিকে আস্ত শমন বলে ধারণা ছিল। ধারণাটা পালটে গেল। একদম মাটির মানুষকে কেন যে সবাই ভয় করে! ভয়টা আরো ভাল করে ভেঙে দিলেন নিশিকান্তদা অল্প একটু মহাপ্রসাদ পান করিয়ে। চুপি চুপি বলে দিলেন, রোজ সন্ধ্যার পর এসে সে যেন একটু মহাপ্রসাদ নিয়ে যায়। তবে তার দিদি যেন কিছু জানতে না পারে।

দিদি জানতে পারবে! অত বোকা অনুপম নয়।

ছোকরাটির নাম অনুপম। নিশিকান্তদা তারপর অনুপমকে নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলেন।

আমার জীবনে সর্বপ্রথম আমি পুরুষের দেহ নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলাম।

নিশিকান্তদা অনুপমের তাজা দেহটির নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। মালার ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে অনুপমের সমস্ত শরীরটাকেই তিনি দেখেছিলেন। তখন অনুপমের অঙ্গে এতটুকু আবরণ ছিলনা। মালারও তাই। অন্ধ দিদির দেহটা নিয়ে সে তখন পাগল হয়ে উঠেছিল। নিশিকান্তদা অনুপমের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, সত্যিই আমি ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছি, কোনও সময়েই ওর রূপ ভুলতে পারি না। সদাসর্বক্ষণ ওর নিরাবরণ শরীরটি আমার চোখের সামনে ভাসে। ঘুম ঘুচে গেল, ঘটি ঘটি কারণ পান করেও এতটুকু নেশা হয় না। পাগল হয়ে যাব না কি!

অনুপম বশ মেনেছে। রোজ আসছে, মহাপ্রসাদ গ্রহণ করছে।

ওর দিকে তাকিয়ে থাকি আর ভাবি। অমন রূপ অমন স্বাস্থ্য সর্বসুলক্ষণ যুক্ত অমন পাত্র পাওয়া কত বড় ভাগ্যের কথা। কৃষ্ণা চতুর্দশী এগিয়ে আসছে। মঙ্গলবার কৃষ্ণা চতুর্দশী—রোহিনী নক্ষত্র, এত বড় যোগাযোগ কি সহজে পাওয়া যায়।

বুড়ী মায়ের তলায় ইঁদারাটা জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। সাপের ভয়ে ওধারে কেউ যায় না। ইঁদারাটা দেখে এসেছি। চতুর্দশীর রাতে ঐ ইঁদারার পাশে পৌঁছতে হবে আমাকে। যদি সাপে না খায়—

এরপর আর একখানা পাতাও পাইনি আমি। শিবু ঠাকরুণ শেষ পাতাগুলো ঠোঙা বানিয়ে গৌর মুদির দোকানে চালান করেছিলেন। সেই ঠোঙার একটা আমার হাতে পড়ে যায়। নুন ডাল কিছু একটা সেই ঠোঙায় ভরে আমার বাড়িতে এসেছিল।

চাঁদা তুলে বুড়ি মায়ের ইঁদারাটাকে সাফ করান হল। শনি মঙ্গলবারে বহু ভক্ত জমা হয়, তারা জল খেতে পাবে। অনেক হাড়-গোড় মাথার খুলি উঠল ইঁদারার ভেতর থেকে। প্রমাণ হল, সত্যিই একদিন কাপালিকরা বুড়ি মায়ের ওখানে শব সাধনা করতেন, নরবলি দিতেন। প্রমাণ হবার পরে বুড়ি মায়ের কপাল ফিরে গেল। ভক্তরা বাঁধিয়ে ফেলল বটগাছ তলা। কোথাকার এক শেঠজী এসে শ্বেতপাথর দিয়ে মুড়ে দিলেন।

এইবার দাঁড়ি। নিশিকান্তদা চরিত্রের এইখানেই ইতি। খেই হারিয়ে গেল।

এই সেদিন খবরের কাগজে একটা খবর দেখলাম। খবরটা বিলিতি কাগজে বেরিয়েছে। মস্ত বড় এক ভারতীয় যোগী সেখানে দেহরক্ষা করেছেন। বিস্তর শিষ্য শিষ্যা আছে তাঁর ওদেশে। ক্রোর ক্রোর টাকার সম্পত্তি রেখে গেছেন যোগীরাজ। তাঁর উইলে আছে, সেই টাকায় এদেশে, তার জন্মভূমিতে পিতৃ-পরিচয়হীন সন্তানদের

জন্যে হোম খুলতে হবে। যোগীরাজ তাঁর প্রধানা শিষ্যা মিসেস নন্দরানী মিত্র বার-এট্-ল-কে অছি নিযুক্ত করে গেছেন। ব্যারিস্টার মিসেস মিত্র দীর্ঘ দিন পরে ফিরে যাচ্ছেন দেশে তাঁর যোগীগুরুর ইচ্ছা অনুযায়ী হোম স্থাপন করার জন্যে। ঐ সংবাদটির সঙ্গে ছোট একখানি ফটোও ছাপা হয়েছে। ব্যারিস্টার মিসেস মিত্র তাঁর যোগীগুরুর পায়ের কাছে বসে আছেন। গুরুর নাম শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্তী।

অনেক চেষ্টা করলাম, চিনে উঠতে পারলাম না। সাদা চুল দাড়িওয়ালা আস্ত এক সাহেব, চিনব কেমন করে।

নিশিকান্তদা অনেক দিন আগে বুড়ি মায়ের ইদারায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। ঐ বিশ্বাসটাই বেঁচে থাকুক না, ক্ষতি কি!

৪

লাভ ক্ষতি খতিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাচ্ছে একটা চরিত্রকেও আমি ষোল আনা ফুটিয়ে তুলতে পারছি না। কি করে পারব! একটা মানুষকে কতটুকুই বা চিনি, একটা মানুষের জীবন সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানতে পারি। অপরের কথা থাক, আমার নিজের জীবনটা নিয়েই বা আমি কতটা ভাবনা ভেবেছি।

চিনু লাহিড়ী সেদিন বলল—একখানা আত্মচরিত লিখে ফেল মাইরি। আমার মামা প্রকাশক হয়েছে, ধরে করে ছাপিয়ে দোব। একদম সুপার হিট্ করবে। যে রকম জমিয়ে গুল ঝাড়তে পারিস—

তোর মামা খুলেছে প্রকাশনী! আকাশ থেকে পড়লাম। চিনু পঞ্চান্ন পার করেছে, আমার চেয়ে দু বছরের ছোট। তিন তিনটে মেয়েকেও ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছে। ওর গিন্নীর হাতে পায়ে বাত, উৎকট ছুঁচিবাই, গোবর মেশোনো জল এক খাবলা চিনুর মাথায় না দিয়ে ওকে ঘরে ঢুকতে দেয় না। সবক'টা দাঁত পড়ে গেছে চিনুর, ভ্যাচড়া জাতের আমাশয় পাকড়েছে ওকে। রসটুকু কিন্তু মেজে যায়নি। ফুরফুরে ধুতি পাঞ্জাবি পরে ছড়ি হাতে নিয়ে আমার কাছে আড্ডা দিতে আসে। কথায় কথায় মাইরি ফোড়ন দেয়। ফাঁক পেলেই সিনেমার কথা পেড়ে বসে। বলে—মাল একখানা মাইরি, দেওয়ানা দিল বইখানায় যা একখানা নতুন মাল নামিয়েছে—। রাশ টেনে ওকে সামলাতে হয়। পঞ্চান্ন পার করেছে তো।

পঞ্চান্ন পার করা চিনু লাহিড়ীর মামা খুলেছেন প্রকাশনী। কোন্ প্রয়োজনে। দু'দিন পরেই তো পটল উৎপাটন করবেন।

খামোকা ভূতের ব্যাগার খেটে মরছেন কেন! বংশধরদের বড় মানুষ করে রেখে যেতে চান!

চিনু বললে—মামা সবে উনত্রিশ পেরিয়ে ত্রিশে পা দিয়েছে। আমার মায়ের সব থেকে ছোট ভাই, মায়ের চেয়ে ছেচল্লিশ বছরের ছোট। দাদু তিনবার বিয়ে করেন, ছোট বউয়ের পেটে ঐ ছেলে জন্মায়। দাদুর বয়েস তখন আটষট্টি। ব্যাপারখানা বোঝ একবার, আটষট্টি বছর বয়েসে নতুন বিয়ে করে—

আবার ওকে থামাতে হল। নিজের বংশটা সম্বন্ধে চিনু লাহিড়ীর হুঁশ জ্ঞান থাকে না।

বললাম—সে না হয় হল, তোর মামা ছাপাবে আত্মচরিত আমার। কিন্তু মালমসলা! মালমসলা পাব কোথায় বল। জীবন তোর স্রেফ ডাল-ভাত ধ্বংস করা আর নাক ডাকিয়ে ঘুমানো এই নিয়ে আত্মচরিত হয়।

লাহিড়ী অভয় দিয়ে বললে—মালমসলার জন্যে আটকাবে না। ও আমি এন্তার সাপ্লাই করব। তুই শুধু গুছিয়ে লিখবি। যে রকম গুল ঝাড়তে পারিস---

আমার আত্মচরিতের মালমসলা তুই সাপ্লাই করবি!

চিনু তখন আসল ব্যাপারটা বললে, আমার আত্মচরিত নয়, আত্মচরিতটা হল ওর। মানে শ্রীযুক্ত চিন্ময় লাহিড়ীর আত্মচরিত আমি লিখে দোব।

হেসে ফেললাম না। হেসে ফেললে বন্ধুবিচ্ছেদ হত। ইলেকট্রিকের বিল, ঝিয়ের মাইনে আটকে গেলে চিনু চালিয়ে দেয়। দু'বার লটারির টিকিটে টাকা পেয়েছে, ফার্স্ট প্রাইজ নয় অবশ্য। তবে গুছিয়ে নিয়েছে এক রকম। ত্রিশ বছর টমাশ টমকিন আফিসে চাকরি করে শেষ পর্যন্ত বড়বাবু হয়েছিল। কোম্পানি ব্যবসা গুটিয়ে ফেললে। চিনু পেল নগদ ত্রিশ হাজার। তারপর ঐ দুই লটারির প্রাইজ। তিন মেয়েকে পাত্রস্থ করেও একখানি বাড়ি

হাঁকড়েছে। ভাড়া দিয়ে মাসে চারশ টাকার মতো পায়। সংসারে তো দুটি প্রাণী, আপনি আর কপ্‌নি। তাই ঠেকায় পড়লে চিনু আমারটাও চালিয়ে দেয়।

পরিবারকে বলে কপ্‌নি। কপ্‌নি মানে তো কৌপীন, পরিবারকে কপ্‌নি বলে কেন।

চিনুর আত্মচরিত শুরু হল। একদা ও কৌপীন ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল। সেই কৌপীন ছাড়তে বাধ্য হয় পারুলবালার জন্যে। পারুলবালা চিনুর পরিবারের নাম। চিনু পারুলবালাকে তাই কপ্‌নি বলে। কৌপীন ধারণ করেছিলি। মানে সন্ন্যাসী হয়েছিলি! চোখ কপালে উঠে গেল আমার।

অতি স্বাভাবিক ভাবে চিনু বললে— সন্ন্যাসী হব কেন। সন্ন্যাসী ছাড়া কি কেউ লেঙট পরে না। লেঙট পরেছিলাম রিকশা টানবার জন্যে। তখনও [illegible] রিকশা চালু হয়নি। লেঙট পরে তখন আমি রিকশা টানতাম। রিকশা টানতে টানতেই চাকরিটা হল। চাকরি হবার পরেও রিকশা টানা ছাড়লাম না। অফিসের পর রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত রিকশা টানতাম। ত্রিশটে টাকা মাইনে পেতাম। তাতে সংসার চলবে কি করে। বাবা মা এক পিসী আর ছ'টা ভাইবোন। দু'বেলা দু'মুঠো দিতে হবে তো সবক'টার মুখে। রিকশা টেনে গড়ে দুটো টাকা হত। কোনও রকমে চলে যেত। ব্র্যাণ্ড সাহেব খুব ভালবাসতেন। যখন জানতে পারলেন চাকরি করার পরেও আমি রিকশা টানি, তখন একখানা নতুন গাড়ি কিনে দিলেন। আসল হংকং, ফুলের মতো হালকা। তিন তিন ছ'মণ দুটো মাল নিয়েও উড়ে যাওয়া যেত এমন কায়দায় বানানো। সে সব গাড়ি এখন আর মেলে না। খাস চীন দেশ থেকে জাহাজে চেপে আসত কি না।

চিন্ময় লাহিড়ী রিকশা টানত।

ঐ বারতা শোনার পরে ওর আত্মচরিত শোনার লোভ সামলানো সহজ নয়। বছর পঁয়ত্রিশ আগে কলকাতা শহরের রাস্তায় চিনু রিক্‌শা টেনে ছুটে বেড়াত। পঁয়ত্রিশ বছর আগে কেমন দেখতে ছিল ওকে!

দেখাব ফোটো, রিক্‌শা লাইসেন্সের ওপর আমার ফোটো সাঁটা আছে। এখন যে ছুরত দেখছিস আমাব এরকমটা আমি ছিলাম না। এরকমটা হয়েছি কপ্‌নি ছেড়ে ঐ মাগীর খেজমত খাটতে খাটতে। শুষে নিয়েছে, একেবারে ছিবড়ে বানিয়ে ছেড়েছে। ঐ জাঁতা কলে পড়েই না এই দশা হল। বলে চিনু একটা লম্বা শ্বাস ছাড়ল।

রাশ টেনে রিক্‌শা থামালাম। বুঝলাম কেন পঞ্চান্ন পার হয়েও চিনু সামলে সুমলে মুখ চালাতে পারে না। আসল চীনে রিক্‌শা কি না, ছুটতে শুরু করলে সহজে থামবে কেন। রিক্‌শা লাইসেন্স খানা নিয়ে আসতে বললাম। পঁয়ত্রিশ বছর আগে কেমন ছুরত ছিল ওর তা দেখবাব জন্যে আমার পেটের মধ্যে তখন তেরটা ছুঁচো ডন বৈঠক কষছে।

সত্যিই পরদিন লাইসেন্স নিয়ে উপস্থিত হল চিনু। দেখলাম ফোটো, আঠার কুড়ি বছরের এক ছোকরার বুক পর্যন্ত উঠেছে। চেরা সিঁথি, দস্তুরমত চুলের বাহার আছে। হবতনের মতো মুখের আদল, থ্যাবড়া নাক, চোখ দুটো ভাঁটার মতো গোল। চোখ দুটো আর মুখের আদলটা মিলল, বাকী কিছুই মিলল না। চিনুর মাথা জোড়া টাক, কুঁচকিকণ্ঠা পেট, বকের মতো লম্বা গলা, কপালের ডান পাশে আধুলি মাপের জড়ুল। জড়ুলটা দেখিয়ে চিনু আমাকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়লে যে লাইসেন্সে সাঁটা ফোটোখানা তারই ফোটো। ফোটোর কপালে একটা সাদা দাগ রয়েছে, ফোটোতে কালো দাগ সাদা হয়ে যায়।

তা যাক, দুনিয়ায় হামেশা কালো সাদা হচ্ছে সাদা কালো

হচ্ছে। সাদায় কালোয় মিশ না খেলে সাদারা কালোদের চিবিয়ে খেয়ে ফেলছে। ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না, ওর কালো কপালখানা সাদা হল কেমন করে সেইটুকু জানলেই হল।

কপাল ফিরল ব্র্যাণ্ড সাহেবের কৃপায়। সাহেবের গর্বে উত্তেজিত হয়ে উঠল চিনু। শুনলাম সাহেবের উপাখ্যান। টমাশ টমকিন অফিসের বড় সাহেব মিস্টার ব্র্যাণ্ডের বিশুদ্ধ সাহেবের মতো ছিল দাড়ি আর ভুঁড়ি। পৌনে চারমণ ওজন ছিল সাহেবের। ফিটনে চেপে সন্ধ্যাবেলায় সাহেব হাওয়া খেতে বেরোতেন। একলাই হাওয়া খেতেন, ওজনের দরুণ কোনও মেমসাহেব ব্র্যাণ্ডের ধারে ঘেঁষতে সাহস করত না।

চৌরঙ্গী পাড়ায় রিক্শা নিয়ে ঘুরছিল চিনু, রাত নটা সাড়ে নটা হবে তখন। হাওয়া খেয়ে মিস্টার ব্র্যাণ্ড বাড়ি ফিরছিলেন। বিরাট হৈ-চৈ চিৎকার, একখানা ছ্যাকড়া গাড়ি ছুটে আসছে দক্ষিণ দিক থেকে। গাড়িখানার ভেতর থেকে মেয়েমানুষের গলা শোনা যাচ্ছে। গাড়ির চালে বসে তিন চারটে লোক হাঁকাড় ছাড়ছে। কেউ গাড়ির কাছে এগোতে সাহস করছে না। ফিটন থেকে লাফিয়ে পড়লেন ব্র্যাণ্ড সাহেব, ছ্যাকড়া গাড়ি তখন তাঁর ফিটনের পাশে পৌঁছে গেছে। চেপে ধরলেন ছ্যাকড়া গাড়ির পেছনটা, গুণ্ডা তিনটে চালের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাতের ছোরা হাতেই রইল তাদের, একটা গুণ্ডার একখানা হাত ধরে ফেলে চরকির মতো ঘোরাতে লাগলেন সাহেব, কয়েক পাক ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলেন। পঁচিশ হাত তফাতে ট্রাম লাইন পেরিয়ে একটা গাছের গায়ে আছড়ে পড়ল সে, বাঁচল না মরল কে জানে। ছ্যাকড়া গাড়ির গাড়োয়ান ততক্ষণে হাওয়া হয়ে গেছে। সাহেবের সেই সাংঘাতিক রূপ দেখে তখনও কেউ গাড়ির কাছে এগোতে সাহস করছে না। গাড়ির ভেতর থেকে তখনও মেয়েমানুষের কান্না শোনা যাচ্ছে।

রিক্শা ফেলে ছুটে গেল চিনু সেই গাড়ির পাশে, একটা দরজা

খুলে ফেলল। টেনে নামাল তুটো জীবকে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল না তারা, তু'জনেরই হাত-পা চারখানা একসঙ্গে বাঁধা আছে। চাকু চাই, সে বাঁধন খোলা যাবে না, কাটতে হবে। এক গুণ্ডার ছোরা পড়েছিল গাড়ির পাশে, সেটা দিয়েই ব্র্যাণ্ড সেই জীবতুটোকে বন্ধন মুক্ত করলেন। আঁচলে মুখ ঢেকে তারা তখন সগৌরবে কান্না জুড়ে দিলে।

অতঃপর রিক্শাতে তুলে তাদের স্বস্থানে পৌঁছে দিল চিনু। সাহেব তাঁর ফিটন গাড়িতে যেতে বললেন। তারা রাজী হল না। একমাত্র চিনুকেই তারা বিশ্বাস করলে।

টমাশ টমকিন আফিসের ঠিকানা দিলেন চিনুকে সাহেব। বলে দিলেন সে যেন তাঁর আফিসে গিয়ে দেখা করে। তিনি বক্শিশ দেবেন। সেই বকশিশ হচ্ছে ঐ চাকরি। চিনুর বিদ্যের বহর দেখে সাহেব তাকে আফিসের ছোট কেরাণী করে নিলেন। তিন তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করার পর চিনু রিক্শা টানতে নেমেছিল। বলা নেই কওয়া নেই বাপ শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল কোমরের বাতে, তখন রোজগার না করলে চলে কি করে। চিনু যখন সংসারের বড় ছেলে তখন---

বলতে বলতে গলাটা ধরে এল চিনুর। ধরা গলায় মুখ নিচু করে বললে—আর একবার চেষ্টা করলেই ম্যাট্রিকটা আমি টপকাতে পারতাম। হঠাৎ যে বাবার ওরকম একটা ব্যামো হবে কে জানত। সবই কপাল।

কপাল নিশ্চয়ই। পঁয়ত্রিশ বছর আগে চাকরিটা যদি না পেত তাহলে বড়বাবু হয়ে রিটায়ার করত কেমন করে। আফিসের বড়-বাবু হওয়া কি চাট্টিখানি কথা।

চাট্টিখানি কথা নয়। চিনুই স্বীকার করল, ছোট কেরাণী থেকে উঠতে উঠতে বড়বাবুর চেয়ারখানি দখল করে বসা চাট্টিখানি কথা নয়। গুণ্ডারা যাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের তু'জনকে যদি

রিক্শাতে তুলে না নিয়ে যেত চিনু তাহলে এখনও ওকে রিক্শা টেনেই পেট চালাতে হত। কপাল যখন ফাটে তখন কি থেকে কি দাঁড়ায় তার কল্পনা করাও অসাধ্য। ব্র্যাণ্ড সাহেব তাদের পৌঁছে দেবার জন্যে মাত্র পাঁচটা টাকা বকশিশ দিয়েছিলেন। বকশিশ দিয়ে জানতে চেয়েছিলেন কোথায় কোন্ ঠিকানায় তাদের পৌঁছে দিতে হল। ঠিকানাটা ঠিক বলতে পারেনি চিনু, সেই চেতলার এক বস্তির সামনে তাদের নামিয়ে দিয়েছিল। রাত এগারটার পরে তখন সেখানে জনপ্রাণী ছিল না। সে সময় বস্তির ভেতরে যাওয়ার মেজাজ ছিল না চিনুর। তাছাড়া সে বুঝতে পেরেছিল কি রকম ঘরের মেয়েছেলে দুটোকে সে বয়ে নিয়ে এসেছে।

ব্র্যাণ্ড সাহেব অনুরোধ করলেন, তাঁকে একদিন সেই বস্তিতে নিয়ে যেতে হবে। যাওয়া আসায় যা রিক্শা ভাড়া তার ওপর তিনি ডবল বকশিশ দেবেন। দিন তিন চার পরে রবিবার, রবিবার সকালে সাহেব যেতে চাইলেন। তাঁর বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দিলেন চিনুকে। বলে দিলেন, ন'টার সময় যেন সে সাহেবের বাড়িতে যায়। ব্রেকফাস্ট করেই তিনি বেরোতে চান।

তাই হল। রবিবার সকালে পার্ক সার্কাস থেকে ব্র্যাণ্ড সাহেবকে তুলে নিয়ে চেতলায় গিয়ে পৌঁছল চিনু। ঠাওর করে সেই বস্তি বার করল। সাহেব বসে রইলেন রিক্শাতে, বস্তির মধ্যে ঢুকে খোঁজ নিলে চিনু, অমুক দিন রাত এগারটার পরে যাদের পৌঁছে দিয়েছিল সেই বস্তির সামনে, তারা কোন্ বাড়িতে বাস করে। মানে যাদের গুণ্ডায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল ছ্যাকড়া গাড়িতে তুলে, মানে গুণ্ডায় ধরে নিয়ে গেল বস্তির দুটো মেয়েমানুষকে এত বড় ঘটনাটাও কেউ জানবে না এ কি কখনও হতে পারে!

গুণ্ডায় ধরে নিয়ে যাচ্ছিল বলেই তাদের সন্ধান পাওয়া যাবে এই রকমই ধারণা করেছিল চিনু। ধারণাটা ভেস্তে গেল। উল্টে তাকেই ছেঁকে ধরলে বস্তির মানুষে, কি মতলবে সে বস্তিতে ঢুকে

মেয়েমানুষের খোঁজ করছে বলতে হবে। ভূতের কাছে মামদোবাজি চলবে না। একজন বেশ মুরুব্বী গোছের মানুষ ওর মুখের সামনে খোঁচা খোঁচা গোঁফ নেড়ে বললে ঐ কথাটি—ভূতের কাছে মামদো-বাজি পেয়েছ? মতলবটা কি শুনি?

চিনু তখন আগাগোড়া ঘটনাটা গুছিয়ে শোনাল সবাইকে। শুনিয়ে বলল, সাহেব বসে আছেন তার রিক্শাতে। বিশ্বাস না হয় চলুন সকলে, সাহেবের মুখ থেকেই শুনে নিন।

তাই হল, ভুঁড়ি আর দাড়ি সুদ্ধ ব্র্যাণ্ড সাহেবকে দেখে ভক্তিতে গদগদ হয়ে পড়ল সবাই। কিন্তু ফল পাওয়া গেল না। কেউ বলতে পারল না, কোন বাড়ির মেয়েছেলে দু'জনকে গুণ্ডায় ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।

তখন সাহেবকে নিয়ে ফিরতে হল চিনুকে। বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বলল, সাহেব যেন তাকে মিথ্যুক না ভাবেন। কয়েকটা দিন সময় চাই, নিশ্চয়ই চিনু তাদের সন্ধান বের করতে পারবে। সন্ধান পেলে জানিয়ে যাবে সাহেবকে, আর তখন বকশিশ নেবে। সাহেব তাকে একখানা দশ টাকার নোট গছাতে চেয়েছিলেন, নেয়নি সে, সেলাম ঠুকে চলে এসেছিল।

তারপর শুরু হল সেই প্রতীক্ষা। সকাল সন্ধ্যে দু'বেলা চেতলার সেই বস্তির আশেপাশে রিক্শা টেনে ঘুরতে লাগল চিনু, রোজগার কমে গেল। রিক্শা টেনে রোজগার করা যায় ধর্মতলা চৌরঙ্গী এলাকায়, চেতলায় কে রিক্শা চাপতে যাবে।

অবশেষে মা কালী মুখ তুলে চাইলেন। কালীঘাটে মা কালীর বাড়িতে এক জোড়া যাত্রীকে নামিয়ে দিয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল চিনু, আর এক জোড়া খদ্দের জুটে গেল। থুথুড়ি এক বুড়িকে নিয়ে এক-নাতনী উপস্থিত হল। তাদের চেতলায় পৌঁছে দিতে হবে। দরদস্তুর করল না চিনু, রওনা হল তৎক্ষণাৎ। কালীঘাটের পোল পার হয়ে ঢুকল চেতলায়, তারপর পৌঁছল সেই বস্তির সামনে।

ওরা নেমে যেতে চাইল। চিনু বলল, তাও কি হয়, ঠাকুমাকে সে একেবারে বাড়ির দরজায় পৌঁছে দেবে। ইঁট বাঁধানো সরু গলি, কোনও রকমে রিক্‌শা চলতে পারে। খুব সাবধান হয়ে দু'পাশের বাড়ির রোয়াক বাঁচিয়ে টেনে নিয়ে চলল গাড়ি, নাতনীটি অবশ্য গলির মুখেই নেমে পড়ল। রিক্‌শার সামনে পথ দেখিয়ে চলল সে! মিনিট দশেক চলবার পর পৌঁছে গেল যথাস্থানে। নাতনীটি ঠাকুমাকে বাড়ির ভেতর পৌঁছে দিয়ে ভাড়া নিয়ে আসবে। আধ মিনিট পরেই মড়াকান্না উঠল। হাউ মাউ খাউ, ও মা তুই এখন এলি মা, ভোর বেলা এলে যে তুই বাপের মুখে জল দিতে পারতিস।

অতঃপর খোঁজ করে চিনু জানতে পারল যে একটা বামুন মরেছে। লোকটা যগ্যিবাড়িতে রান্না করতে যেত। দিন-রাত হাড়ভাঙা খাটুনি আর আগুনের আঁচে পোড়া, সেই ভোরের দিকে পোলাও কালিয়া খাওয়া, কতদিন সহ্য হয়। যগ্যিবাড়িতে যারা রাঁধে তারা যে রোগে মরে সেই রোগ ধরেছিল। যার নাম গেরুনি রোগ তাই। কাঁচা জলটুকুও পেটে থাকে না। ভোরের দিকে মরেছে, ঘরে পোড়াবার খরচাটাও নেই।

খুবই ভাল কথা। রিক্‌শ সেখানেই ফেলে রেখে ট্রামে চেপে ছুটল চিনু। বলে গেল, পোড়াবার খরচা ঘণ্টাখানেকের ভেতর নিয়ে আসছে। রিক্‌শা জামিন রইল।

ব্র্যাণ্ড সাহেব পঞ্চাশটা টাকা দিলেন। সেই সঙ্গে সাবধান করে দিলেন চিনুকে,—ওদের কাছে পরিচয় দিও না। গুণ্ডারা মা-বেটিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল এটা প্রকাশ কর না। যে কারণেই হোক গুণ্ডাদের সেই ব্যাপারটা ওরা গিলে ফেলেছে। বস্তির লোকেরা ওদের পাড়া-পড়শী, পড়শীরা সেই কেলেঙ্কারিটা জেনে ফেলবে এই ওদের ভয়।

তাই হল। টাকা নিয়ে গিয়ে বামুনটাকে কেওড়াতলায় পুড়িয়ে

এল চিন্নু। ফলে আরও তিনটি প্রাণী তার ঘাড়ে পড়ল। মা দিদিমা নাতনী তিন পুরুষকে গেলাও।

সেই সময় সাহেব দয়া করে চিন্নুকে তাঁর আফিসে ঢুকিয়ে নিলেন। ফলে সেই নাতনীটিকে বিয়ে করতে হল। মনিবের হুকুম, না বলে কেমন করে।

তাই বল, অনেকক্ষণ ধরে শুনতে শুনতে হাঁফ ধরে গিয়েছিল, হাঁফ ছেড়ে বললাম—তাই বল, এতক্ষণে মিসেস লাহিড়ীর পরিচয় পাওয়া গেল। সত্যিই তোর আত্মচরিত লেখা উচিত। তোর মতো প্রাণ ক'টা মানুষের আছে। একেবারে হুবহু শরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়ার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। ইচ্ছে করছে তোর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দি।

কার মাথায়? আমার না তোর? ফোঁস করে উঠল চিন্নু। তারপর একটু ফিরে হাসি হেসে বলে—আত্মচরিত লেখাটা কি এতই সহজ রে, আত্মচরিত লিখতে হলে আমার মতো আত্মারাম হতে হয়। আত্মারাম মানে জানিস?

ঘাড় নাড়লাম, আত্মারামের মানেটা ঠিক মগজে এল না।

আত্মারাম মানে এমন মানুষ যে নিজেকে নিয়ে মশগুল হয়ে আছে। চিন্নু আমায় আত্মারাম কাকে বলে বোঝাতে লাগল—নিজেকে নিয়ে এমনই মশগুল ছিলাম আমি যে কোনও দিকে তাকাবার ফুরসত ছিল না। আফিসে যেতাম, আফিস থেকে ফিরে রিক্‌শা টানতে বেরোতাম। বছর খানেক পরে তিনজনকে টপকে পঞ্চাশ টাকা মাইনে হল। তারপর সাহেব বিলেত চলে গেলেন। যাবার পরে টের পেলাম যে আমার সেই পরিবারটি আর তার মা সাহেবের সঙ্গে জাহাজে চড়ে ভেসে পড়েছে। যাক ভেসে, আমার সম্বন্ধে এত সব ভাল কথা লিখে রেখে গেছেন সাহেব যে আমার উন্নতিতে ভাঁটা পড়বে না। আত্মারাম হয়ে বেঁচে রইলাম, আজও তাই আছি। টানতাম রিক্‌শা, আফিসের বড়বাবু হয়ে রিটায়ার করেছি, চাট্টিখানি কথা।

বোবা মেরে গেলাম। বলে কি লোকটা! চিনু লাহিড়ীর জীবনেও আত্মচরিত লেখার মতো এত সব মাল-মশলা আছে!

সেদিনের মতো চিনু আমাকে রেহাই দিলে। বলে গেল, পরদিন একখানা খাতা নিয়ে আসবে। খাতাখানায় অনেক কিছু লিখে রেখেছে। তবে—একটু আমড়াগাছি করে আমাকে তাতাবার চেষ্টা করলে চিনু—তবে কি জানিস, তোর মতন ঠিক হয় না মাইরি। সব এলোমেলো হয়ে যায়। খাতাখানা তোকে পড়ে শোনাব, তুই গুছিয়ে লিখে দিবি। দেখবি কি মাল। যদি ছাপায় মামা, তাহলে মামার কপাল—

মামার কপাল যে ভাল করেই পুড়বে সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে ওকে বিদায় দিলাম।

চিনু তার জীবনকাহিনী শুরু করেছে এইভাবে।

ছোটবেলার কথা একটু একটু মনে পড়ে। লাল মা আমাকে মানুষ করে। যে বাড়িতে থাকতাম আমরা সেটা ছিল একটা টিনের দোতলা। বহু লোক সে বাড়িতে থাকত। আমরা থাকতাম নিচের তলার একটা ঘরে, লাল মা ওপর তলায় থাকত। আমার মা হরদম টাঙুড়ে যেত। আমার যখন পাঁচ বছর বয়েস তখন লাল মা আমাকে নিয়ে নেয়। সেই থেকে আমি লাল মায়ের কাছে থাকতাম। স্নান করিয়ে ভাত খাইয়ে জামা কাপড় পরিয়ে লাল মা আমাকে পাঠশালায় পাঠাত। আমাদের সেই বাড়ির পেছনে একটা মাঠ ছিল, পাঠশালা ছিল মাঠের ওধারে মস্তবড় এক ঠাকুর দালানে। তিনকড়ি পণ্ডিতমশাই রোজ একবার করে আসতেন, চেয়ারে বসে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিয়ে বাড়ি চলে যেতেন। আমরা কিন্তু ঠিক দশটায় পাঠশালায় যেতাম আর তিনটেয় ছুটি পেতাম। পাঠশালা বসত ঠাকুর দালানে, ঠাকুর দালান ঝাড়ু দিত ভুজাওয়ালা জনক-রামের বউ, সে আমাদের দশটা থেকে তিনটে পর্যন্ত আটকে রাখত।

লোকের বাড়ি শ্রাদ্ধ-শান্তি করে যেসব কাপড় গামছা পেতেন পণ্ডিতমশাই, তা থেকে দু' একখানা দিতেন তনকরামের বউকে, তাই সে পণ্ডিতমশাইয়ের পাঠশালা চালাত। বছর দু'য়েক সেই পাঠশালাতেই আমার লেখাপড়া হয়। তারপর বাবা আমাকে মধুসূদন একাডেমীতে নাইন ক্লাসে ভরতি করে দেয়। তখনকার নাইন ক্লাশ হচ্ছে এখনকার ক্লাশ ওয়ান। নাইন ক্লাশে যখন ভরতি হই তখনও লাল মায়ের কাছেই খাওয়া-দাওয়া করতাম, লাল মায়ের বিছানায় শুয়ে ঘুমোতাম। নিচে আমাদের ঘরে তখন আমার চারটে ভাইবোন পরিত্রাহি চেঁচাত। আর আমার মা সেই ঘরের এক কোণে আঁতুড়ে বসে সবাইকে গাল পাড়ত। আমার বাবা ছিল কয়াল, ভোর হতে না হতেই মস্ত বড় দাঁড়িপাল্লা নিয়ে বেরিয়ে পড়ত, কত রাত্রে যে ফিরে আসত কে জানে। বাবা কিন্তু খুব ভালবাসত আমায়, ছুটি-ছাটার দিন আমাকে নিয়ে বেড়াতে যেত। চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া হল, হাইকোর্ট, মনুমেণ্ট, ইডেন গার্ডেন সবই আমাকে দেখায় বাবা। সে সময় কত কথা শুনতাম বাবার কাছে। একটা কথা প্রায়ই বলত—বড় জোর আট ন' বছর, আট ন' বছর পরে তুই আমার সঙ্গে আড়তে বেরোবি। তখন আর আমাদের পায় কে। বাপবেটায় রোজগার করলে দু' দিনে হাল ফিরে যাবে। হাল অবশ্য ফিরল। আমার বাবা দেখে গেছে হাল ফেরা অবস্থাটা। বাবা বাতে শয্যাশায়ী হবার পরে লেখাপড়া ছেড়ে আমি রিক্‌শা টানতে শুরু করলাম। তারপর তো টমাশ টমকিন আফিসে চাকরি হয়ে গেল। চোখ বোজবার আগে বাবা দেখে যেতে পারল যে বোনগুলোর বিয়ে হয়ে গেছে। টাকা-কড়ি কোথা থেকে আসছে জানতে চায়নি কখনও বাবা। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমাকে মাঝে মাঝে সাবধান করে দিত—দেখিস বাবা, সামলে চলিস, যেন ফাটক খাটতে না হয়। তার মানে বাবা মনে করত, আফিস থেকে চুরি-চামারি করে আমি বোনেদের বিয়ের টাকা

জোগাচ্ছি। বাবা তো জানত না যে, টমাশ টমকিনের বড় সাহেব তখন আমার মুঠোর মধ্যে।

যাক ওসব কথা, প্রথমেই আমি আমার লাল মায়ের কথা বলব। যখন ফিফ্‌থ্‌ ক্লাশে উঠি তখনও মাঝে মাঝে ওপরে উঠে লাল মায়ের পাশে শুয়ে ঘুমোতাম। তারপর একটা ঘটনা ঘটল। সঙ্গে সঙ্গে আমি পুরোদস্তুর লায়েক হয়ে উঠলাম। সেই ঘটনাটাই আগে বলি।

লাল মায়ের ঘরে চালের নিচে আগাগোড়া কাঠের মাচা ছিল। ছোট্ট একট গর্ত ছিল সেই মাচায় চড়বার জন্যে। মাচাটা পেতল কাঁসার বাসনে বোঝাই ছিল। থালা ঘটি বাটি বাঁধা রেখে দু' চার টাকা নিত লোকে লাল মায়ের কাছে। টাকা হলে সুদসুদ্ধ ফেরত দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যেত। অনেকবার আমি মই বেয়ে সেই মাচায় উঠে বাসন-কোসন বার করে দিয়েছি। একদিন খুব ভোরবেলা বাড়িসুদ্ধ লোকের ঘুম ভেঙে গেল, মসমস, খটখট, দুমদাম আওয়াজ হচ্ছে। ঢোঁৎকা হোঁৎকা জমাদার সাহেবরা বুটপট্টি সেঁটে ওপর নিচে সারা বাড়িখানায় দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। সব ক'টা ঘরে ঢুকে সব ক'জন ভাড়াটেকে গালমন্দ দিয়ে জিনিসপত্র তছনছ করে যখন তারা বিদেয় নিলে, তখন সঙ্গে নিয়ে গেল লাল মাকে আর লাল মায়ের বাসনের ডাঁই। বাড়িসুদ্ধ মানুষ লাল মাকে প্রাণভরে গালমন্দ দিলে। আমি কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে খুব কেঁদেছিলাম। আমার জীবনে সেই বোধ হয় সজ্ঞানে প্রথম চোখের জল ফেলা। তার আগে আমায় মা চড়টা চাপড়টা দিয়েছে অনেকবার। তাতে চোখের জল ফেলেছিলাম কি না মনে পড়ে না। আমার খুব ভয় করছিল, দু' দিন দু' রাত ভয়ে ঘুমোতে পারিনি। সব সময় একই ভাবনা, ওরা বোধ হয় লাল মাকে মারতে মারতে মেরেই ফেলবে। তিন দিনের দিন সন্ধ্যেবেলায় লাল মা ফিরে এল। কেউ লাল মায়ের সঙ্গে কথা বললে না। আমার মা কিন্তু আমায় পাঠিয়ে

দিলে লাল মাযেব কাছে। একটা কথা শিখিয়ে দিলে মা, কথাটি হচ্ছে চোবেব মতো চুপি চুপি আমাকে যেতে হবে লাল মাযেব কাছে, কেউ যেন দেখতে না পায। আবও একটা কাজ চোবেব মতো চুপিচুপি কবাতে হবে। অনেক রাতে সব ঘবেব দবজা বন্ধ হবে যখন তখন আবাব ঐ চোবেব মতো চুপিচুপি নিচে নেমে বটি তরকাবি নিয়ে যেতে হবে ওপবে। মানে খাওযাতে হবে তো লাল মাকে। দু' দিন দু' বাত হাজত খেটে এল, হাজতে কি আব কেউ কিছু খেতে পায।

চোবেব মতো চুপিচুপি কিছু কবতে যাওযা সেই শুরু হল আমাব জীবনে। আমাব গর্ভধাবিণী ঐ কাজে হাতেখড়ি দিল আমাকে। চোরের মতো চুপি চুপি কিছু কবাব মধ্যে কেমন যেন নেশা লাগা গোছেব ব্যাপাব আছে। লাযেক হযে উঠলাম আমি ঐ চোবেব মতো চুপি চুপি কিছু কবাব সুযোগ পেযে। ফিফথ ক্লাশে উঠেছি তখন, বাবো বছব পাব কবেছি। নেহাত কচি খোকা নই। কিন্তু তাব আগে কেউ আমাকে চোবেব মতো চুপি চুপি কিছু কবাব ভাব দেযনি। একটা অজানা জগতে পা দিলাম। বডবা আমাকে তাদেব দলে ভিডিয়ে নিলে।

সেই বাত যখন শেষ হযে আসছে তখন আবাব সেই চোবেব মতো চুপি চুপি আব একটা কাজ কবাব ভাব পেলাম। অনেক বাতে কুপী জ্বালিযে টিনেব দেওযালেব গা থেকে ছোট্ট একটু টিন খুলে ফেলল লাল মা। বাব কবে আনল খেবো কাপডেব গোটা তিনেক ছোট ছোট থলি সেই গাতেব ভেতব থেকে। লাল মাকে বাঁচাবাব জন্যে সেই থলি তিনটি নিযে অন্ধকাবে কাঠেব সিঁডি দিযে নিচে নামতে হল আমাকে। ভগবান জানেন কি ছিল সেই থলিগুলোয়। অন্ধকাবেই আমাব বাবা নিঃশব্দে থলি তিনটি নিল আমার হাত থেকে, নিঃশব্দে বাডি থেকে বেরিযে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মাযেব পাশে শুযে ঘুমিযে পড়লাম আমি। চরম তৃপ্তি যাকে বলে, চোবেব

মতো চুপি চুপি সাংঘাতিক কিছু কাজ করেছি, বুক ফুলে উঠল। লাল মাকে বাঁচাবার জন্যে আরও সাংঘাতিক জাতের কাজ করতেও প্রস্তুত তখন আমি, রক্তের স্বাদ পেয়ে গেছি।

লাল মাকে কিন্তু বাঁচানো গেল না। বার পাঁচ সাত লাল মা আদালতে গেল এল। আমার হাত দিয়ে বাবা লাল মাকে অনেক টাকা দিল। কোনও ফলই ফলল না, একদিন যথাসময়ে আদালতে গেল লাল মা, সন্ধ্যেবেলা ফিরে এল না। পরদিন বাড়িসুদ্ধ মানুষ বলাবলি করতে লাগল, পুরো দু'বছর লাল মায়ের জেল হয়ে গেছে।

আবার আমি চোরের মতো চুপি চুপি কেঁদে ম'লাম।

সেই পাড়া ছেড়ে অন্য পাড়ায় উঠে গেলাম আমরা। তার কারণ লাল মা আমাকে মানুষ করত বলে সবাই আমাদের বিষ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। ভালই হল, অন্য পাড়ায় গিয়ে যে বাড়িতে ঠাঁই পেলাম সেই বাড়িতে থাকত ঝিঁঝি, ঝিঁঝির সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল। ভাব হবার কারণটি হচ্ছে মাথার পেছনে একটি খোয়া ছুঁড়ে ঝিঁঝির বাবাকে আমি পনেরো দিনের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছিলাম। পনেরোটা দিন ঝিঁঝি বাপের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল। ঝিঁঝির বাপ লোকটা চাবি তালা সারিয়ে বেড়াত। এক হাতে নিত প্রকাণ্ড একটা তারের রিঙ, সেই রিঙে আটকানো এক গাদা চাবি অনবরত ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ঝনর ঝনর আওয়াজ করত। আর একটা হাতে ছোট্ট একটা কাঠের বাক্স ধরে থাকত কাঁধের ওপর। সেই বাক্সে থাকত তালা চাবি সারাবার যন্ত্রপাতি। সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সন্ধ্যার পর ঘরে ফিরত এক পেট মদ গিলে। তখন খুঁজে বেড়াত ঝিঁঝিকে। ধরতে পারলেই প্রহার, মারতে মারতে ঘরে নিয়ে গিয়ে ঘরে বন্ধ করত। অনেক রাত পর্যন্ত সবাই শুনতে পেত চড় চাপড়ের আওয়াজ আর গালাগাল। ঝিঁঝি কিন্তু টুঁ শব্দ করত না। নেশার ঘোরে বাপটা ঘুমিয়ে পড়ত যখন তখন দরজা খুলে বালতি নিয়ে চলে যেত কুয়োতলায়। বালতি

বালতি জল উঠিয়ে স্নান করত। কি বা শীত কি বা গ্রীষ্ম, রাত দশটা এগারটায় স্নান করত ঝিঁঝি, তিন চার ঘণ্টা মার খেয়ে গায়ে জ্বালা ধরত নিশ্চয়, সেই জ্বালা স্নান না করলে জুড়োবে কেন।

আমার চেয়ে গায়ে-গতরে অনেক বড় ছিল ঝিঁঝি। ঘরে ফ্রক পরত, বাইরে বেরোত ফ্রকের ওপর ডুরে শাড়ি জড়িয়ে। দুপুরে বাপের জন্যে ভাত তরকারি রেঁধে রাখত। রাতে খাওয়া হত না। সেই ভাত তরকারি গিলে সকালে বেরিয়ে যেত বাপ তালা চাবি সারাবার ছোট বাক্সটা নিয়ে। ঝিঁঝি তখন দোকান বাজার করে বাসন-কোসন মেজে রান্না চাপাত। মাত্র দুটি প্রাণী সংসারে—বাপ আর বেটি। সন্ধ্যার পর বাপের এক রূপ সকালে আর এক রূপ। সকালে ঝিঁঝির বাপকে দেখে কে বলবে যে সন্ধ্যাবেলায় ঐ লোকটাই মদ গিলে এসে মেয়েকে ধরে ঠেঙায় আর খিস্তি করে। সকালবেলা মেয়েকে না খাইয়ে লোকটা কিছুই মুখে দিত না। বালতি বালতি ঘড়া ঘড়া জল তুলে দিয়ে যেত পাছে মেয়ের কষ্ট হয়। বাজার হাট করার জন্যে টাকাকড়ি দিয়ে যেত মেয়েকে। জামা কাপড় সাবান তেল পাউডার সমস্ত ঠিক আছে কি না খোঁজ নিত। দুপুর বেলা মেয়ে সিনেমা দেখবে সে জন্যেও টাকা-কড়ি দিত। মোটের ওপর যতক্ষণ বাড়ি থাকত সকালে, ততক্ষণ শুধু মেয়ে মেয়ে আর মেয়ে। কি করলে মেয়েটা খুশি হবে তাই নিয়ে হৈ চৈ করত। বাড়ির আর সব ভাড়াটেরা মুখ বুজে থাকত, কেউ সাহস করত না ওদের ব্যাপারে নাক গলাতে। অসুরের মতো গায়ে শক্তি ছিল ঝিঁঝির বাবার, দেখতেও ছিল লোকটাকে অসুরের মতো। যেমন দুই ভাঁটার মতো চোখ তেমনি রাক্ষুসে গোঁফ। অমন সব্বনেশে গোঁফ মা দুর্গার অসুরের মুখেই দেখা যায়। কাবুলীরা পর্যন্ত ঝিঁঝির বাবাকে ভয় করত, আমাদের সেই গলির ভেতর ঢুকতে সাহস পেত না। ঐ বাড়িতে যেদিন আমরা গেলাম সেদিন সন্ধ্যার পরেই ভয়ঙ্কর একটা

কাণ্ড ঘটে গেল। একজন কিছু টাকা নিয়েছিল কাবুলীর কাছে। দু'জন কাবুলী লাঠি হাতে বসেছিল বাড়ির সামনে, মাঝে মাঝে তারা হাঁক ছাড়ছিল আর তড়পাচ্ছিল। যে টাকা ধার নিয়েছে তাকে না পেলে উঠবে না। ভয়ে কেউ বাইরে বেরোচ্ছে না, যাকে সামনে পাচ্ছে তাকে ধরেই কাবুলীরা যা তা বকে যাচ্ছে। এমন সময় উপস্থিত হল ঝিঁঝির বাবা, কাঁধ থেকে কাঠের বাক্সটাকে রোয়াকের ওপর নামিয়ে লেগে গেল কাবুলী দুটোর সঙ্গে। কেন তারা বসে থাকবে দরজার সামনে? মান-ইজ্জত আছে, ঘরে তার সোমত্ত মেয়ে। এক কথা দু'কথা থেকে চরমে উঠে গেল ব্যাপারটা। কাবুলীরা না কি লাঠি উঠিয়েছিল। আর যাবে কোথায়, লেগে গেল ঝটাপটি। মিনিট দু'য়েকের মধ্যে দুই কাবুলী লাঠি পাগড়ি ফেলে রেখে প্রাণ নিয়ে ছুটে পালাল। যারা তখন দেখছিল তাদের কেউ বললে, দু'জনের নাক-মুখ একদম চেপটা হয়ে গেছে।

সেই সাংঘাতিক ঝিঁঝির বাপকেই আমি হাসপাতালে পাঠিয়েছিলাম তার মাথার পেছনে এক খোয়া ঝেড়ে।

একদিন অনেক রাতে ঝিঁঝির বাবা ঘরে ফিরে যথারীতি পেটাতে শুরু করল ঝিঁঝিকে ধরে। জেগে ছিলাম আমি, কান পেতে শুনছিলাম সব। দড়াম করে খিল খোলার শব্দ হল, হুংকার দিয়ে উঠল ঝিঁঝির বাপ, কি বলল ঠিক বুঝতে পারলাম না। তারপর আবার খিল দেবার আওয়াজ শুনলাম। আরও কিছুক্ষণ গজরালো লোকটা, তারপর একদম চুপ, এতটুকু সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ একটা কথা মনে হল আমার, চুপি চুপি উঠে খিল খুলে একখানা কপাট একটু ফাক করে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। ভয়, আমার বাবা মা ভাই বোনেরা না জেগে ওঠে।

ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা, বোধ হয় মাঘ মাস। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পা ঘষে ঘষে এগিয়ে গেলাম ঝিঁঝিদের দরজায়। পাশাপাশি ঘর, সামনে টানা বারান্দা। ওদের দরজার সামনে

পৌঁছে দরজার গায়ে কান ঠেকিয়ে দম আটকে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ, যদি কিছু শোনা যায়। শোনা গেল মাতালটার নাক ডাকার শব্দ। কি হল! ঝিঁঝি কি তাহলে!

কি হতে পারে!

নিশ্চয়ই ঘরে নেই ঝিঁঝি, দরজা খুলে মেয়েকে বার করে দিয়েছে বাপ, স্পষ্ট শুনতে পাইনি বাপের কথাগুলো। কিন্তু 'দূর হয়ে যা হারামজাদি' গোছের কিছু বলে দরজায় আবার খিল দিয়েছে এটা ঠিক। তাহলে গেল কোথায় ঝিঁঝি! দরজার গা থেকে সরে দাঁড়ালাম। ভাবছি তখন বিনা আলোয় কি করে ঝিঁঝিকে খুঁজে বার করব।

আর একটু হলেই চেঁচিয়ে উঠতাম, হঠাৎ কে আমায় জাপটে ধরলে পেছন থেকে। কানের ওপর মুখ চেপে বললে—একটা কিছু আনতে পারিস তোদের ঘর থেকে, আমার গায়ে কিছু নেই।

হাত বুলিয়ে দেখলাম, সত্যিই তাই। সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে একেবারে নেংটো করে ঝিঁঝিকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছে মাতালটা, দিয়ে নিজে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।

আগুন জ্বলে উঠল মাথার মধ্যে, ঠিক করে ফেললাম, প্রতিশোধ নিতে হবে। প্রতিশোধ নেওয়াটা পরে হলেও চলবে, তৎক্ষণাৎ দরকার একটা কাপড় বা চাদর গোছের কিছু। ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। ওর কানে মুখ ঠেকিয়ে বললাম—আনছি, এইখানে দাঁড়িয়ে থাক।

চোরের মতো চুপি চুপি কিছু করাটা তখন বেশ সড়গড় হয়ে গেছে। নিঃশব্দে ঢুকলাম আবার আমাদের ঘরে। একটা কাঠের আলনায় মা আমাদের জামা কাপড় গুছিয়ে রাখত। অন্ধকারে আলনা হাতড়ে যা পেলাম তাই নিয়ে বেরিয়ে এলাম। ঝিঁঝি সেটা তার গায়ে জড়িয়ে ফেলল। তারপর আর কোনও কথা নয়, অন্ধকারে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে দু' হাত

মেলে ঘুরে বেড়ালাম বারন্দায়, বারান্দা ছেড়ে উঠোনে নেমে খুঁজতে লাগলাম। তারপর আবার চোরের মতো চুপি চুপি ঘরে ঢুকে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়লাম।

ঘুমোবার কথা মনের কোণেও উদয় হল না। জ্বলছে তখন সর্বশরীর। যেমন বাপ তেমনি মেয়ে। মাতালটার মেয়েটা কি পাজী! কাপড়খানা নিয়েই সরে পড়ল! সারা রাত ঐ ঠাণ্ডায় নেংটো হয়ে বসে থাকতে হত, বেশ হত। সকালে উঠে সবাই দেখত —

যা মনে এল তাই মনে মনে বলে মাতাল বাপের নচ্ছার মেয়েকে জাহান্নমে পাঠিয়ে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন যখন ঘুম ভাঙল তখন অনেকটা বেলা হয়েছে। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, ফ্রক পরে ঝিঁঝি কাজকর্ম করছে। সেই প্রথম মনে হল ফ্রক পরলে ঝিঁঝিকে বিশ্রী দেখায়। হাঁটু থেকে সব খোলা, হাটুর ওপর থেকে গলা থেকে বুক যদিও ঢাকা রয়েছে ফ্রকে, কিন্তু —

সত্যিই যেন মনে হল ঝিঁঝির সারা দেহে এতটুকু আবরণ নেই। অত বড় মেয়ে কাপড় পরলেই পারে। মুখ ধুয়ে এসে রুটি খেয়ে পড়তে বসলাম। শুনলাম, বাবাকে মা খুব ধমকাচ্ছে। বাবা কাল রাত্রে একখানা ধুতি বাইরে ফেলে রেখে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছিল। পাশের ঘরের মেয়েটা খুব ভাল মেয়ে, অন্ধকারে ধুতি-খানা বারান্দায় পড়ে আছে দেখতে পেয়ে ঘরে নিয়ে রেখেছিল, সকাল বেলা দিয়ে গেল। কপাল ভাল যে ওর নজরে পড়েছিল, অন্য কারও নজরে পড়লে—হুঁ হুঁ—

আমিও মনে মনে বললাম—হুঁ হুঁ।

দিন তিনেক পরেই ঘটল সেই বিশ্রী ঘটনাটা। সেদিন হরতাল না কি একটা ছিল। সকালবেলা কোথা থেকে এক পেট মদ গিলে এল ঝিঁঝির বাপ। সবায়ের সামনে ঝিঁঝিকে ধরে বেধড়ক ঠেঙাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে খিস্তি, খিস্তি আর গলাবাজির চোটে কেউ কিছু

বলতে সাহস করলে না। ঘণ্টাখানেক ঠেঙাবার পরে তার খেয়াল হল মেয়েকে নেংটো করে খেদিয়ে দিতে হবে। ধস্তাধস্তি শুরু হল ওদের ঘরে। উঠোনের ওধারে পেয়ারা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম আমি। টেনে হিঁচড়ে বার করে আনলে ঝিঁঝিকে লোকটা, ফ্রকটা তখন ফালা ফালা হয়ে গেছে।. প্রাণপণে চেষ্টা করছে ঝিঁঝি যাতে তাকে নেংটো করতে না পারে। নিচু হয়ে বেশ বড় একটা খোয়া তুলে নিলাম। তার পর যে কি হল কিছুই খেয়াল নেই। যখন হুঁশ হল তখন দেখি রেললাইনের ধারে বসে হাঁপাচ্ছি।

সন্ধ্যার পর চোরের মত চুপিচুপি ঘরে ফিরলাম। মা বললে—কোথায় ছিলি সারাদিন? কি সর্বনাশ হয়েছে জানিস? ঝিঁঝির বাপকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। এত বড় একটা ইট মেরে মাথার পেছনটা ফাটিয়ে দিলে কে। ওদের ঘরের সামনে বারান্দায় মেয়েকে ধরে ঠেঙাচ্ছিল লোকটা, যেই না টেনে হিঁচড়ে নামিয়েছে মেয়েকে বারান্দা থেকে, অমনি এক ঢিল। কথাটি বলতে হল না আর, মুখ গুজড়ে পড়ল। কি রক্ত কি রক্ত! রক্তে ভেসে গেল উঠোন। হাসপাতালের গাড়ি এসে তুলে নিয়ে গেল।

রাতে ঝিঁঝিকে ডেকে রুটি তরকারি খাওয়ালে মা। আমার একটা বোন ঝিঁঝির কাছে গিয়ে শুল। অনেক রাতে বাবা ফিরে এসে বললে, জ্ঞান হয়েছে ঝিঁঝির বাপের, ডাক্তার বলেছে আর ভয় নেই। যদি রগে লাগত ইটটা তাহলে আর দেখতে হত না, হু' ইঞ্চির জন্যে খুব বেঁচে গেল এ যাত্রা। আমিও বেঁচে গেলাম। হাতের ঢিল হাত থেকে বেরিয়ে গেলে যে অমন ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাতে পারে তা আমি জানতাম না। সেই প্রথম আর সেই শেষ, আর কখনও আমার হাত থেকে ঢিল ছোটেনি।

পরদিন সকালে ঝিঁঝির সঙ্গে হাসপাতালে যেতে হল আমাকে। দশটার পরে আমরা যেতে পেলাম রুগীর কাছে। মস্ত একটা ঘরে হু' সারি খাটে এন্তার মানুষ শুয়ে আছে। কোনও দিকে না

তাকিয়ে এক রকম চোখ বুজে একটা বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঝিঁঝির বাপকে চেনা যাচ্ছে না। মুখ মাথা পেঁচিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে। একটিবার মাত্র চোখ মেললে ঝিঁঝির বাপ, জবা ফুলের মতো লাল দুটো ডেলা। কি যেন বলতে চেষ্টা করলে। নিচু হয়ে বাপের মুখের কাছে কান নিয়ে গেল ঝিঁঝি। আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা, তারপর বেরিয়ে এলাম। সময় হয়ে গেছে, আবার সেই বিকেলে দেখা করতে দেবে।

রাস্তায় নেমে ঝিঁঝি বললে—এই ছোঁড়া, বাড়ি চলে যা তুই, আমি এক জায়গায় যাব।

যথেষ্ট অপমানিত হলাম। যে ভাষায় যে সুরে বলল ঐ কথা ঝিঁঝি তাতে কান মাথা জ্বালা করে উঠল। মুখগোঁজ করে চলতে লাগলাম ওর পাশে পাশে, জবাব দিলাম না। একটু পরে আর একবার বললে ঝিঁঝি—বললাম না তোকে বাড়ি যেতে, শুনতে পেলি না না কি?

খুবই সংযত ভাবে জবাব দিলাম—তোমার সঙ্গে তো যাচ্ছি না, আমি একলা একলা যাচ্ছি।

ঘুরে দাঁড়াল ঝিঁঝি। চোখ পাকিয়ে বললে—দেখবি মজা? পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দোব ইট মেরে আমার বাবাকে খুন—

আমি! আমার গলা বুজে এল।

নয়তো কে? ঝিঁঝির দুই চোখ দিয়ে কি এক রকম আলো ঠিকরে বেরোতে লাগল। আমার চোখের পানে তাকিয়ে সাপের মতো হিসহিস করে বললে—কে দাঁড়িয়েছিল পেয়ারা গাছের আড়ালে? পাঁচিল টপকে কে পালিয়ে গিয়েছিল? নজর ছিল আমার চারিদিকে, কেউ কোথাও লুকিয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল কি না—

আর শুনলাম না আমি, পেছন ফিরে দৌড় দিলাম। পাশেই একটা গলি, গলির ভেতর ঢুকে তৎক্ষণাৎ ঠিক করে ফেললাম মতলব। ধীরে সুস্থে বেরিয়ে পড়লাম আবার গলি থেকে। দূর

থেকে দেখলাম সোজা চলেছে ঝিঁঝি। ঘোর লাল রঙের একটা কাপড় জড়িয়েছিল, নজর রাখতে কষ্ট হল না।

এ রাস্তা ও রাস্তা সে রাস্তা প্রায় ঘণ্টাখানেক চলবার পরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল ঝিঁঝি। উলটো দিকের ফুটপাথ দিয়ে এগিয়ে গেলাম মানুষের আড়ালে আড়ালে। মোটর গাড়ি সারাবার একটা কারখানার সামনে ঝিঁঝি দাঁড়িয়েছে। প্রকাণ্ড একটা লরির টায়ার ফেসেছে, লরিটা কাত হয়ে আছে ফুটপাথের ধারে। চমৎকার আড়াল পাওয়া গেল। ঝিঁঝি মোটে টেরই পেল না যে কয়েক হাত পেছনে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

খানিক পরে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন কারখানা থেকে। দামী প্যাণ্ট শার্ট পরে আছেন তিনি, একটা সিগারেট আটকানো রয়েছে মুখের এক কোণে। চেহারা দেখে মনে হল খুবই বড়মানুষ নিশ্চয়ই। দু' চারটে কথা হল ঝিঁঝির সঙ্গে। তারপর তিনি প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ব্যাগ বার করলেন। ব্যাগ খুলে অনেকগুলো নোট দিলেন ঝিঁঝির হাতে। নোটগুলো ঝিঁঝি নিজের বুকের ওপর জামার মধ্যে গুঁজে নিল। আরও কয়েকটা কথা বলে ভদ্রলোক কারখানার ভেতর চলে গেলেন। ঝিঁঝি পেছন ফিরে পা চালালে। কয়েক হাত পেছনেই আমি আছি। একটা ফলের দোকানে দাঁড়িয়ে গোটাকতক লেবু কিনলে ঝিঁঝি, একটা ডাক্তারখানা থেকে একবোতল হরলিক্স নিলে। তারপর আমরা দু'জনে এক সঙ্গে বাড়ি ফিরলাম।

বাড়িতে ঢোকার আগে ঝিঁঝি টের পেল যে আমি ওর সঙ্গেই আছি। চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল— কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

আমিও চোখ পাকিয়ে জবাব দিলাম —যেখানেই থাকি না কেন তোমার কি?

আচ্ছা, দেখাচ্ছি তোকে মজা—বলে ঝিঁঝি দরজার ভেতর পা দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও বলে উঠলাম—আমিও মজা দেখাতে পারি। কোথায় গিয়েছিলে সবাইকে বলে দোব!

আবার পিছিয়ে এল ঝিঁঝি। একটা ঢোক গিলে বলল—তার মানে তুই আমার সঙ্গে—

কথাটা শেষ করতে দিলাম না, চাপা গলায় তেড়ে উঠলাম—বেশ করেছি, রাস্তাটা কি তোমার কেনা?

কিন্তু—ঐ কিন্তু পর্যন্ত বলে ঝিঁঝি থেমে গেল। খুবই বেকায়দায় পড়ে গেছে বুঝতে পারলাম। অল্প একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভেবে নিয়ে বলল—কিন্তু আমরা দু'জনে তো ভাব করতে পারি। আমি তো কিছু বলিনি তোকে। কেন তুই আমার সঙ্গে ঝগড়া করবি? আমি তো—

আচ্ছা বেশ, এখন থেকে তোমার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। বলে এক দৌড়ে আমি বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলাম।

সেই ভাবের দৌড় যে কতদূর গিয়ে পৌছবে তা যদি তখন আঁচ করতে পারতাম!

বিকেলে আবার হাসপাতালে যেতে হল ঝিঁঝির সঙ্গে। লেবু হরলিক্স বাবাকে খাইয়ে এল ঝিঁঝি। ঝগড়া টগড়া আর হল না। তোড়া বলাটা ঝিঁঝি বন্ধ করলে। তুই পালটে তুমি হল। একটু আধটু পরামর্শও হল আমাদের মধ্যে। পরামর্শটা হল ঝিঁঝির বাপকে নিয়ে। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে আবার যদি মারপিট শুরু করে বাপ তাহলে কি করা যাবে?

বোধ হয় আর তোমাকে মারবে না। ওকে সাহস দেবার জন্যে আমি বললাম।

ঠিক মারবে, মারতে মারতে আমার মাকে মেরেই ফেলত বাবা। মামারা যদি নিয়ে না যেত—

তোমার মা বেঁচে আছে!

বেঁচে থাকবে না কেন। বেঁচে আছে, লোকের বাড়িতে রান্না করে। আরও বড় হলে আমিও পালিয়ে গিয়ে কোথাও কাজ করব।

কিছু করতে হবে না। ফের যদি তোমার বাপ তোমার গায়ে হাত দেয় কোনও দিন—।

ঝিঁঝি আমার হাত একখানা খামচে ধরে বলে উঠল—আবার ঢিল মারবে বুঝি? বাবা তাহলে ঠিক মরে যাবে।

বাবা মরে যাওয়াটা কত সাংঘাতিক ব্যাপার বুঝতে পারলাম। ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল ঝিঁঝি। তৎক্ষণাৎ সামলে নিলাম। খুবই মুরুব্বী চালে বললাম—না, ঢিল আর আমি ছুঁড়ছি না কোনও দিন। হাত থেকে ঢিল ছুটে গেলে ভারী বিশ্রী ব্যাপার হয়। সত্যিই আমি তোমার বাবার মাথায় মারবার জন্যে ঢিলটা ছুঁড়িনি। খুবই রাগ হয়ে গিয়েছিল। কিছু না ভেবেই ঢিলটা তুলে নিয়েছিলাম হাতে। তোমার জামাটা অমন করে ছিঁড়ে না দিত যদি তোমার বাবা, তারপর সেই অবস্থায় ধরে উঠোনে—

চাপা শ্বাসটা ছেড়ে ঝিঁঝি বললে—আবার যদি বাবা কোনও দিন আমাকে ধরে মারে তখন তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেও। চোখে না দেখলে রাগ হবে না।

হঠাৎ আমি বলে ফেললাম—পালাও না কেন তুমি? পড়ে পড়ে খাও কেন মার?

কোথায় যাব? নিদারুণ হতাশায় কেমন যেন মুষড়ে গেল ঝিঁঝি।

জাত পুরুষ মানুষ আমি। তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম—সে ব্যবস্থা আমি করব। এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখব তোমাকে—

ভয়ানক অন্যমনস্ক ভাবে অস্পষ্ট স্বরে ঝিঁঝি বললে—বাবার ভয়ে কেউ আমাকে বাঁচাতে চায় না।

এবার ওর একখানা হাত খামচে ধরে আমি বললাম—কেন আমি তো রয়েছি।

এ সমস্ত হল সেই বারো তেরো বছর বয়েসের ব্যাপার। যতদূর মনে পড়ছে, নিখুঁতভাবে বলতে চেষ্টা করেছি আমি। ঝিঁঝির সঙ্গে ভাব হবার পরে রোজই দু'বেলা ওর সঙ্গে যাওয়া আসা করতে হত হাসপাতালে। অনেক রকমের সলা-পরামর্শ করতাম আমরা। হুবহু সব কথা লেখা সোজা নয়। তবে ঐ জাতের সব কথাবার্তা হত এটা বেশ মনে পড়ছে। পনরো দিন পরে ঝিঁঝির বাবা বাড়ি এল। একদম আলাদা মানুষ, মদ খাওয়া ছেড়ে দিলে। ঝিঁঝির গায়ে হাত তোলা বন্ধ হল। তালা চাবি সারাবার জন্য বসে থাকত বাজারে গিয়ে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতে পারত না। ঝিঁঝি বাপের জন্যে রান্নাবান্না করত আব আমার মায়ের এটা ওটা করে দিত। আমি স্কুলে যেতাম, মার খেতাম মাস্টার মশাইদের কাছে, বাড়ি ফিরেই খাতা বই রেখে ছুটতাম কপাটি খেলতে। দিন দিন আমি ষণ্ডা হয়ে উঠছি তখন। দাঙ্গা লেগে গেল চারিদিকে, পাড়া বাঁচাবার জন্যে দল তৈরি হল। আমাদের পাড়াব সবাইকে ডেকে ঝিঁঝির বাবা তালিম দিতে লাগল, যদি হামলা হয় তখন কে কি করবে।

করার অবশ্য কিছুই ছিল না। সবই টিনের বাড়ি, মাঝে মাঝে দু'চারখানা খোলার চাল, আগুন লাগিয়ে দিলে বস্তিসুদ্ধ মানুষ বেগুন পোড়া হবে। আগুন যাতে না লাগাতে পারে সে জন্যে দিবারাত্র পাহারা দেবার ব্যবস্থা হল। অচেনা মানুষ একজনও না ঢুকতে পারে আমাদেব গলিতে, যদি কেউ ঢোকে তাকে আটকাতে হবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

দারুণ ব্যাপার, কেউ বেরোতে পারছে না গলি থেকে। বড় রাস্তায় হরদম মিলিটারির গাড়ি ছুটছে। গাড়িতে কলের কামান নিয়ে বসে আছে সৈন্যরা। লোকজন দেখলেই ফট্ ফট্ ফট্ ফটাস। গুলি খেয়ে পড়ে আছে মানুষ রাস্তায়, কেউ তাদের কুড়িয়ে নিতেও যাচ্ছে না। দাঙ্গা কিন্তু সমানে চলছে। কোথায় কি হচ্ছে আমরা

পাড়া থেকে না বেবিবেই সব জানতে পারছি। কি করে সেটা সম্ভব হচ্ছে সে প্রশ্ন কে তোলে। পিলে চমকানো গল্প বলতে যত আবাম শুনতেও তত আবাম। কেউ শোনালে, অমুক জাযগায একশ' জন খুন হযেছে। প্রত্যক্ষজনেব বিববণ, অমুকে নিজেব চোখে দেখেছে। শোনবাব ফলে আব একজনেব মুখ চুলকে উঠল। সে শোনাল, তাব ভাযবাভাইযেব মামাতো শালা অমুক জাযগায থাকে। সে প্রাণ নিযে পালিযে এসে বলেছে যে এক হাজাবজন একদম সাফ হযে গেছে, কুপিযে কেটে ফেলেছে সবাইকে। শুনতে শুনতে আব মনে মনে হিসেব কবতে কবতে বুঝতে পাবলাম, দাঙ্গাটা আব কযেকটা দিন চললে বেশ মজা হবে। দাঙ্গা থামবাব পবে বড বাস্তায বেবিযে দেখব একটা প্রাণীও নেই। একদম ভোঁ-ভাঁ, শুধু আমবাই বেঁচে আছি। যে দোকানগুলো এখনও লুঠ হযনি বা বাকী থাকবে সেগুলো খুলে যা খুশি আমবা নিযে নেব।

শ্রাদ্ধটা ততদূব আব গড়াল না, দাঙ্গা বন্ধ হযে গেল। যথা পূর্বং তথা পবং, দোকান বাজাব অফিস স্কুল খুলে গেল। সবাই দিব্যি বেঁচে আছে। এবা মানুষ ও মবেছে বলে মনেই হল না।

তাব আগেই, মানে দাঙ্গা বন্ধ হবাব আগেই এমন একটা ব্যাপাব ঘটে গেল যাতে আমি মস্ত এক বীবপুরুষ হযে গেলাম।

কোনও উনুন জ্বলে না, চাল নেই কযলা নেই, চাল কযলা কেনাব পযসাও অনেকেব ঘবে নেই। সবাই বোজ আনে বোজ খায। হামলা হল না আমাদেব পাড়ায, কেউ আমবা ছোবা খেযে ম'লাম না, ঘবে ঘবে শুকিযে মবতে বসলাম সবাই। ক্ষিদেব জ্বালায আমাব ভাই-বোনগুলো কাঁদছে। বাবা বেবোচ্ছে না, আড়ত বাজাব বন্ধ, কোথায কথালি কববে। ঝিঁঝিদেব ঘবেও টাকা নেই। আমাব ভাই-বোনগুলোর কান্না সইতে পাবল না ঝিঝি। চুপি চুপি আমায বলল, যদি আমি তাব সঙ্গে যাই তাহলে সে অনেক টাকা আনতে পাবে।

এতটুকু চিন্তা ভাবনা না করে আমি বললাম—বল না কোথায় যেতে হবে, আমিই যাচ্ছি। যদি টাকা পাওয়া যায় নিয়ে আসব।

দেবে কেন তোমায়। আমি গেলে দেবে। আমার সঙ্গে চল। খুবই মিনতি করে বলল ঝিঁঝি।

তোমার বাবা যেতে দেবে না। তাছাড়া তুমি আবার মেয়েছেলে—

পালিয়ে যেতে হবে। তোমার জামা প্যাণ্ট পরে যাব। মেয়েছেলে বলে চিনবে কে। বড়জোর দেড় ঘণ্টা বা দু'ঘণ্টা, বাবাকে বলে যাব নন্দীদের বাড়ি তাস খেলতে যাচ্ছি।

রাজী হলাম না। তার কারণ ঝিঁঝি একটা মেয়েছেলে ঐটুকুই হল ঝিঁঝির একমাত্র অপরাধ। সাজা। [illegible] সময় মেয়েছেলেদের এড়াতে হবে, সেই হল আমাদের পরম কর্তব্য। জান থাকতে আমাদের মেয়েছেলের গায়ে কেউ যেন হাত দিতে না পারে। মেয়েছেলেদের সম্বন্ধে দাদাদের অনেক মূল্যবান জ্ঞান অর্জন করে ফেলেছি তখন। বয়েস তেরো, পার হয়ে চোদ্দয় পড়েছে।

মেয়েছেলে [illegible] ঝিঁঝি গোঁ ধরে বসল।

চোদ্দ বছর বয়েসে সেই আমি প্রথম মেয়েছেলেদের কাছে হার মানলাম। অনেক রকম মতলব এঁটে চুপিচুপি চোরের মতো দুপুরবেলা বেরিয়ে পড়লাম দু'জনে পাড়া থেকে। পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করলাম ফুটপাথ দিয়ে। জনপ্রাণী নেই, যতদূর নজর গেল সব খা খা করছে, মাথার ওপর রোদও খা খা করছে।

পেছনে অনেক দূরে একটা আওয়াজ হল। আওয়াজটা ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল। বুঝতে পারলাম একখানা লরি গোছের কিছু আসছে।

ঝিঁঝি আমার হাতখানা খামচে ধরল। কোনও রকমে বললাম —খবরদার, যেমন চলছ তেমনি চলতে থাক। এধার ওধার তাকাবে না।

বিদকুটে কয়েকটা শব্দ হল। এক বাণ্ডিল পটকায় আগুন

লাগিয়েছে কারা। সেই শব্দ থামবার সঙ্গে সঙ্গে লরিখানা আমাদের পাশে এসে থেমে গেল। দুপদাপ শব্দ করে নামল কারা, মুখ তুলে তাকালাম। সামনেই এক জোয়ান, মাথায় পাগড়ি, পাগড়ির নিচে ইয়া গোঁফ। তখন হিন্দীও একটু একটু বুঝি, মুটে মজুরদের সঙ্গে হিন্দীতেই বাতচিত করতে হয়। সেই গোঁফের ভেতর হাসির আলো দেখা দিল। শুনলাম একটি প্রশ্ন—

কোথায় যাচ্ছ তুমলোক ?

অবিচলিত সুরে জবাব দিলাম—হামলোক খেতে পাতা নেই, ভাই বোন কাঁদতা হায়, তাই টাকা আননে যাতা হায়।

চল হামাদের সাথ, পৌঁছা দেঙ্গে।

লরিতে ওঠবার পর ওরা সবাই খুব খুশি হল। একজন পকেট থেকে বার করে কয়েকটা বিস্কুট আর লজেন্স দিল হামাদের। জিজ্ঞাসা করল ঝিঁঝি আমার কে হয়।

আমার ভাই।

খুবই খুবসুরত। বলে ওরা বোধ হয় ঝিঁঝির নাম, খুবসুরত একটি ভাইয়ের শরীর নিয়ে আলোচনা শুরু করলে। আমি খুব মন দিয়ে লজেন্স চুষতে লাগলাম। ঝিঁঝিই ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুক।

যথাস্থানে পৌঁছলাম। নেমে যাবার আগে সেই গোঁফ বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিলে, ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে ঐ রাস্তায় তারা ফিরে আসবে। আমরা যেন দাঁড়িয়ে থাকি বাড়ির সামনে, তারা তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু খুব হুঁশিয়ার, আধ ঘণ্টার আগে যেন আমরা পথে না বের হই। আধ ঘণ্টার মাথায় আর একটা লরি যাবে, সেই লরি চলে যাবার পরে আমরা পথে এসে দাঁড়াব। হুঁশিয়ার, খুব হুশিয়ার, সেই আগের লরির সামনে যেন না পড়ি আমরা। পড়লে—

পড়লে কি হবে তা আমরা আসবার সময়েই বুঝতে পেরেছিলাম।

একটা লোক হাঁটছিল ফুটপাথ ধরে। আমাদের লবি থেকেই ফট্ ফট্ ফটাস শব্দ হল। তার পরই দেখলাম লোকটা পথের ওপর গড়াচ্ছে।

দরজাটা বন্ধ ছিল। অনেকবার ঘা দেবার পরে অল্প একটু ফাঁক হল। ঝিঁঝির সঙ্গে আমিও ঢুকতে পেলাম। তখনকার মতো গুলি খেয়ে মরার ভয় আর রইল না।

রামনারায়ণ কাকা, ঝিঁঝি ওঁকে রামনারায়ণ কাকা বলেই ডাকল, রামনারায়ণ কাকা সবাগ্রে আমাদের পেট পুরে গরম হালুয়া আর গরম লুচি খাওয়ালেন। লুচি হালুয়াটা না কি তখন তার জন্যেই তৈরি হচ্ছিল। মুহুর্মুহু প্রকাণ্ড দেওয়াল ঘড়িটার পানে তাকাচ্ছি আমরা। কথাবার্তা তাড়াতাড়ি সারতে হল। বিশখানা দশ টাকার নোট ঝিঁঝিকে দিলেন তার রামনারায়ণ কাকা। আধ ঘণ্টা পার হয়েছে তখন, আমরা দরজার বাইরে ফুটপাতে পা দিলাম।

মিনিট দশেকের মধ্যে তারা ফিরে এল। আমাদের বস্তির গলি দূরে দেখা যাচ্ছে। আমার খুবসুরত ভাইটির সাথে আমাকে নামিয়ে দিতে বলল কেউ। আরও গোটকতক লজেন্স ঘুষ পেলাম আমরা। সেগুলো চুষতে চুষতে গলিতে ঢুকে পড়লাম।

এবং সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে ধরা পড়লাম।

তুলকালাম কাণ্ড লেগে গেল। পাড়াসুদ্ধ মানুষ একজোট হয়ে ঠিক করতে বসল কি জাতের শাস্তি আমাদের দেওয়া উচিত। সেই ভয়ঙ্কর হট্টগোলের ভেতর ঝিঁঝি তার বাপের কানে তুলে দিল প্রকৃত ব্যাপারটা। নোটগুলো হাতে নিয়ে ঝিঁঝির বাবা বিলোতে শুরু করলে। যাদের ভাঁড়ে মা ভবানী বিরাজ করছেন তারা পেল পাঁচ টাকা করে। অনেকে নিলই না, কেউ কেউ দু' এক টাকা নিল। তখনকার মতো জল পড়ল আগুনে, চাল কয়লার খোঁজে ছুটল সবাই। চাল কয়লা জোটানো চাট্টিখানি কথা নয়। বস্তিতে একটি মাত্র দোকান, দোকানের মালিক গুলজারলাল কাঁইয়া চাল কয়লা

কেরোসিন সবই বার করে দেবে। কিন্তু মুনাফাটা যদি না দেওয়া হয় তাহলে বলবে কিছুই নেই। মওকা মাফিক মুনাফা লুটতে হবে, কাঁইয়া জীবনের এই হল মূলমন্ত্র। কাঁইয়া মানে এমন এক চিজ যে নিজের মা বাপের কাছেও মুনাফা লুটতে কসুর করে না। কাঁইয়ার সঙ্গে হেস্তনেস্ত করে চাল কয়লা ঘরে পৌঁছে দিয়ে যখন সবাই নিশ্চিন্ত হল তখন আবার উঠল আমদের কথা। শাস্তি দেওয়ার মতলব আঁটতে বসল না কেউ, শাস্তি দেওয়ার বদলে অভিনন্দন দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হল। রাতারাতি আমি আর ঝিঁঝি বস্তিশ্রী বস্তিশ্রীমতী বনে গেলাম এবং সঙ্গে আমাদের দু'জনের নাম লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। হ্যাঁ, বুকের পাটা একেই বলে।

বুকের পাটা বজায় রাখার জন্যে একটি মস্ত কাজ আমি করলাম, মিলিটারীর গাড়ি চেপে গেছি এসেছি এই সংবাদটি বেমালুম গাপ করে ফেললাম।

দাঙ্গা থামবার পরে ঝিঁঝির বাবা আমার বাবাকে বললে, আমাকে তার বিদ্যে শিখিয়ে দেবে। বিদ্যেটি সহজ বিদ্যে নয়, যে কোনও রকমের তালা চক্ষের নিমেষে বিনা চাবিতে খুলে ফেলা যায় কি করে তাই আমাকে শিখিয়ে দেবে। আমার বাবা কৃতার্থ হয়ে গেল, সকাল সন্ধ্যে আমি তালিম নিতে লাগলাম।

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বাজারে বসে কি রোজগার করে ঝিঁঝির বাবা তা জানতে পারলাম। চাবি হারালে মানুষ নতুন চাবি বানাতে আসে। দু' আনা চার আনা বড় জোর গণ্ডা আষ্টেক পয়সা মেলে এক একটা তালা বা বাক্সর চাবির জন্যে। সারা দিনে দুটো টাকাও কামাতে পারে না। কপাল ভাল হলে লোহার সিন্দুকের চাবি বানাবার জন্যে লোকে ডেকে নিয়ে যায়। একটা লোহার সিন্দুক খুলে দেওয়া আর তার চাবি বানাবার জন্যে দশ বিশ টাকাও পাওয়া যায়। কিন্তু লোহার সিন্দুক খোলবার ডাক ন'মাসে ছ'মাসে

একটা বা দুটো মেলে। ঘরে ঘরে তো আর লোহার সিন্দুক নেই। যাদের ঘরে লোহার সিন্দুক আছে তারা হেঁজি-পেঁজি মানুষ নয়।

কভি কভি ভয়ঙ্কর নামজাদা আদমীদের ঘর থেকেও ডাক আসে। তবে সে সব ডাক আসে ভায়া রামনারায়ণ কাকা। রামনারায়ণ কাকা গভীর রাত্রে গাড়ি নিয়ে এসে ঝিঁঝির বাপকে তুলে নিয়ে যান। ঐ রকম একটি রহস্যময় ডাকে আমিও একদিন গেলাম ঝিঁঝির বাবার সঙ্গে। ডান হাতের আঙুলে চোট লেগেছিল ঝিঁঝির বাবার, আঙুলটা ফুলে কলাগাছ না হলেও একটা মাঝারি সাইজের বেগুন হয়েছিল। তাই আমাকে যেতে হল সহকারী হিসেবে। সেই রাতে আমি বড় মিস্ত্রীর সাগরেদ ছোট মিস্ত্রী হলাম।

বিরাট বাড়ি। মনে হল, অত বড় বাড়িতে লোকজন কেউ নেই। রামনারায়ণ কাকার জন্যে সদর দরজা খোলা ছিল। বাড়িতে ঢুকে রামনারায়ণ কাকা টর্চ জ্বেলে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন আমাদের। অনেকগুলো বড় বড় ঘর বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ির মুখে পৌঁছলাম। সেখানে এক ভদ্রলোক অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিলেন। তার হাতেও এক টর্চ। আমরা দোতলায় উঠলাম। সবাই একদম নিশ্চুপ, কেউ কারও সঙ্গে একটি কথা বললে না। দোতলায় আবার বড় বড় ঘর বারান্দা পার হতে হল। শেষ পর্যন্ত আমরা পৌঁছলাম একটা দরজার সামনে। দরজায় তিনটে তালা ঝুলছে। একটা মাথায়, একটা পেটে, একটা নিচের চৌকাঠের সঙ্গে। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে কাজ শুরু হল। মিনিট পনেরোর মধ্যে তিনটে তালাই খুলে গেল, একটাকেও ভাঙতে হল না। ঝিঁঝির বাবা নিজের হাতে কিছুই করতে পারলে না, কি ভাবে কি করতে হবে আমাকে দেখিয়ে দিলে। দরজা খুলে ঘরের ভেতর ঢুকলাম।

ঘরখানা বিশেষ বড় নয়। ডান পাশে দেওয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড একটা লোহার আলমারি সাঁটা রয়েছে। সেই আলমারি খুলতে হবে।

হাতল ধরে দু'চার বার মোচড় দিয়ে চাবির গর্তে দু'চারটে যন্ত্র ঢুকিয়ে ঝিঁঝির বাবা মাথা নাড়ল। অর্থাৎ খোলা যাবে না। রাম-নারায়ণ কাকা দুটো আঙুল দেখালেন। আর একবার খুটখাট চেষ্টা করে ঝিঁঝির বাবা হাল ছেড়ে দিলে। তখন সেই ভদ্রলোক, যিনি আমাদের নিচে থেকে ওপরে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি পাঁচটা আঙুল উঁচিয়ে দেখালেন। তিনবার চেষ্টা করার পরেও যখন ঝিঁঝির বাবা ঘাড় নাড়ল তখন দু'হাতের সবক'টা আঙুল উঁচিয়ে দেখালেন ওঁরা। আমরা কাজে লেগে গেলাম। উকো দিয়ে ঘসে ঘসে তিনটে চাবি বানানো হল। অতঃপর আলমারি খুলল। নগদ একশ খানা দশ টাকার নোট সেই আলমারি থেকে বার করে ঝিঁঝির বাবার হাতে দিলেন ভদ্রলোক। নিজের কড়ে আঙুল থেকে খুলে সবুজ পাথর বসানো একটা সোনার আংটি আমার মাঝের আঙুলে পরিয়ে দিলেন। হাঙ্গামা মিটে গেল। রামনারায়ণ কাকার গাড়ি চেপে ফিরে এলাম। মনে মনে তখন [illegible] খুশি। এক রাতের রোজগার এক হাজার টাকা- [illegible]।

গাড়িতে বসেই টাকাগুলো সব রামনারায়ণ কাকার হাতে দিয়ে দিলে ঝিঁঝির বাবা। রামনারায়ণ কাকা আমাদের নামিয়ে দিয়ে টাকা নিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন। বোবা মেরে গেলাম, কি ব্যাপার রে বাবা, আমরা কিছু পাব না! কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাওয়া চরম বেআদবি। ঝিঁঝির বাবা আমার ওস্তাদ, ওস্তাদ খেপে গেলে বিদ্যেটি শেখা হবে না।

পরদিন সকালে ঝিঁঝির বাবা আমাকে ডেকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে। যে কাজ করে এসেছি আমরা তার উপযুক্ত মজুরি যথাকালে পাব। তবে সেটা ঐ পুরো হাজার টাকা নয়। যাঁর কৃপায় কাজটি পাওয়া গেল তিনি সিংহ ভাগ রেখে দেবেন। এই কাজের এই দস্তুর। মনে রাখতে হবে, রামনারায়ণ কাকাকে খদ্দের বিশ্বাস করেন বলেই কাজটি আমরা করতে পেলাম। ঐ জাতের কাজ

করার জন্যে কেউ আমাদের বিশ্বাস করে ডাকবে না। তাছাড়া রামনারায়ণ কাকার মতো বড় দরের মানুষই জানতে পারেন কখন কোন্ বড় ঘরের লোহার সিন্দুক লুকিয়ে খোলবার দরকার হবে। চাবি হারানোর ব্যাপার নয় এটা, চাবি হারালে দিনের বেলা ডেকে নিয়ে গিয়ে দু'দশ টাকা খরচ করে চাবি খোলানো যেত। এ হল অন্য ব্যাপার, চাবি না হারালেও চাবি খোলার দরকার পড়েছে। রামনারায়ণ কাকার মতো মানী মানুষের নেকনজরে যদি থাকা যায় তাহলে মাঝে মধ্যে এ জাতের কাজ দু' চারটে মিলবে।

বুঝলাম না কিছুই। এটা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেল, দাঙ্গার সময় গিয়ে দাঁড়াতেই কেন রামনারায়ণ কাকা ঝিঁঝির হাতে দু'শ টাকা দিয়েছিলেন।

মন্দ কি! মস্ত বড় মুরুব্বী পেছনে থাকলে বিপদাপদে উদ্ধার পাওয়া যায়।

মস্ত বড় মুরুব্বী সামনে থাকলে কি জাতের বিপদে পড়তে হয় সে শিক্ষাটা আরও কিছুদিন পরে হল।

শীতকাল। কুয়াশায় আর ধোঁয়ায় দু'হাত সামনে নজর চলে না। রাত প্রায় দুটো, আমরা চলেছি বড় গোছের একটা দাঁও মারতে। এবারে মোটর গাড়ি নয়, পা গাড়িতেই যেতে হচ্ছে। চলতে চলতে পৌঁছলাম সেই মোটর গাড়ি সারাবার কারখানার সামনে, যেখানে একদিন ঝিঁঝির পিছু পিছু চুরি করে এসেছিলাম। অন্ধকার কারখানার ভেতর থেকে কালীঝুলি মাখা তিনটে লোক বেরিয়ে এল। হলাম পাঁচজন, পাঁচজন মুখ বুজে পা চালালাম। আধ ঘণ্টার মধ্যেই যথাস্থানে পৌঁছনো গেল। একটা দোকান, সাইন বোর্ডে লেখা রয়েছে আসল গিনি সোনার অলঙ্কার নির্মাতার নাম। শক্ত কাজ, গোটা যোল তালা নিঃশব্দে খোলা চাই। সময়

খুব কম তাই আমাকে সঙ্গে এনেছে ঝিঁঝির বাবা। দু'জনে হাত লাগালে ষোলটা তালা খুলতে আধ ঘণ্টাটাক লাগবে।

কাজ শুরু হল।

তারা তিনজন পেছনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগল।

তালা ক'টা খোলার পরে যে মুহূর্তে দরজা ধরে টান দেওয়া, সঙ্গে সঙ্গে বিকট আওয়াজ, একসঙ্গে যেন একশটা ঘড়ির অ্যালার্ম বেজে উঠল কোথায়। আমাকে একটা ধাক্কা মেরে ঝিঁঝির বাবা বললে—দৌড়ো। দৌড়তে শুরু করলাম। কোথায় যাচ্ছি কে ভাববে তখন, ধোঁয়া আর কুয়াশার মধ্যে চোখ বুজে দৌড়চ্ছি। দম যখন ফুরিয়ে এসেছে তখন দেখি সামনেই এক পুল। কোথাকার পুল কে জানে! পুল পার হতে গেলে অনেকটা চড়াই উঠতে হয়। সে সামর্থ্য নেই তখন। পুলের পাশ দিয়ে খালে নেমে গেলাম। খালে আবার জল নেই, মাঝখানে কোমর পর্যন্ত ডুবল, বাঁচা গেল। গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে রইলাম।

সর্বপ্রথম খেয়াল হল যে শীত করছে। খেয়াল হবার সঙ্গে সঙ্গে দাঁতে দাঁতে খটাখটি লেগে গেল। তা লাগুক, মনে কিন্তু দারুণ ফুর্তি। হ্যাঁ, কাজের মতো একটা কাজে হাত লাগানো গেছে বটে। কাল সকালে যখন বাড়ি ফিরব—বাড়ি ফেরার কথা মনে উঠতেই মিইয়ে গেলাম। কোথায় গেল ঝিঁঝির বাবা। ধরা পড়েনি তো!

শীতের রাত সহজে কাবার হতে চায় না। ভোর হল কিন্তু অন্ধকার কাটল না। খাল থেকে উঠে পড়লাম। শীত একশ' গুণ বেড়ে গেল। একটা হাফ প্যান্ট একটা শার্ট আর একটা গরম গেঞ্জি আছে গায়ে, কোমরে একখানা র‍্যাপারও জড়ানো রয়েছে। র‍্যাপারখানা খুলে নিঙড়ে নিয়ে কোমরে জড়ালাম, প্যান্ট শার্ট গেঞ্জি পোঁটলা বেঁধে হাতে নিলাম। চললাম খালের ধার দিয়ে। কোথায় যাচ্ছি তা জানি না। আলো ফুটলে বুঝতে পারব কোথায় এসেছি। তখন বাড়ি ফেরবার উপায় হবে।

আগুন জ্বেলে কয়েকজন লোক গোল হয়ে বসেছে। ঠাণ্ডায় হাত পা জমে গেছে তখন, গায়ে কিছু নেই। প্রাণের দায়ে তাদের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছেড়া কাঁথা কম্বল মুড়ি দিয়ে তারা বসেছে। আমাব দিকে নজর পড়ল একজনের। বিনা বাক্যব্যয়ে সে তার কাঁথাখানা খুলে আমার গায়ে জড়িয়ে দিল। দু'জন একটু সরে বসে জায়গা করে দিল। বসে পড়লাম। আরও কয়েকটা ভাঙা ঝুড়ি চাঙারি চাপিয়ে দিল তাবা আগুনেব ওপর। একটু পরে আগুনটা আমাদের মাথা ছাড়িয়ে লাফিয়ে উঠল। ধড়ে প্রাণ এল, চোখ বুজে বসে রইলাম। বসে থাকতে থাকতে কখন যে শুয়ে পড়েছি বলতে পারব না। ঘুম যখন ভাঙল তখন রোদ উঠে গেছে। আগুনও নিভে গেছে। দিনেব আলোয় কাঁথাখানার দিকে তাকিয়ে পেটের নাড়িভুঁড়ি মুচড়ে বমি উঠে এল। দুর্গন্ধেব চোটে দম আটকে মরি আব কি। গা থেকে খুলে টেনে ফেলে দিলাম সেটাকে ছাইয়ের গাদায়। চাবিদিকে তাকিয়ে দেখলাম, আমার প্যাণ্ট জামার পুঁটলিটা উধাও হয়ে গেছে। যাক গে, কোমরে জড়ানো র‍্যাপার-খানা প্রায় শুকিয়ে গেছে। কোমব থেকে খুলে গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে নিলাম। তারপব উঠে এলাম রাস্তায়। এবার খোঁজ নিতে হবে কোথায় এসেছি।

সেই অদ্ভুত সাজে দুনিয়াসুদ্ধ মানুষের চোখেব সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি পৌঁছলাম যখন তখন কান্নাব রোল উঠে গেছে। ভাইবোনগুলো কাঁদছে মা কাঁদছে বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। ও পাশের ঘর থেকে ঝিঁঝির বাবা বেরিয়ে এল। যেন কিছুই হয়নি, এমন ভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার পানে। তারপর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। এধারে কান্না থেমে গেছে তখন। বাড়িসুদ্ধ মানুষ এসে জড়ো হয়েছে আমাদের ঘরের সামনে। সবাইয়ের মুখে এক প্রশ্ন—কি হয়েছে? কোথায় ছিলাম সারারাত?

জুতসই একটা জবাব খুঁজে পেলাম না।

চাদর জড়িয়ে এসেছি কেন? জামা প্যান্ট গেল কোথায়? চোখ মুখের অবস্থা অমন হল কি করে? যার যা মুখে আসছে বলছে, কারও কথার জবাব দিচ্ছি না। এমন সময় দরজা দিয়ে ঢুকল ঝিঁঝি। সকলের পেছনে দাঁড়িয়ে শুনেই বুঝে নিল ব্যাপারটা। তারপর হঠাৎই চিৎকার করে উঠল—মাসীমা, ওকে ঘরে ঢুকতে দিও না। মড়া পুড়িয়ে এসেছেন বাবু। এই আমি সব জেনে আসছি পাড়ার বন্ধুদের কাছ থেকে। কলেরা হয়েছিল একটা মুটের, ফুটপাথে পড়ে সে মরছিল। উনি আর ওর বন্ধু দুজন তাকে তুলে নিয়ে যান হাসপাতালে। হাসপাতালে পৌঁছেই সে লোকটা মরে যায়। এরা তখন তাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্যে ভিক্ষে করতে লাগল। তারপর খাট দড়ি এনে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে—

ঝিঁঝির গল্প মাঝপথেই থেমে গেল। কলেরার মড়া পুড়িয়ে এসেছে! ওরে বাপরে, কি সর্বনেশে ছেলে। [illegible] কেটে পড়ল। ভুমল [illegible] দিলে ঝিঁঝি, গরম জল চাই, সাবান চাই, ব্যাপারখানা ধুয়ে ফেলতে হবে [illegible], কেউ যেন স্নান না করে ঘরে ঢুকতে না পায়। সবাই গেলো [illegible] কর্পূর, কর্পূর এক ডেলা গিলে ফেলো না কি বলে। হলো [illegible] থাকে না।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল। বুঝতে পারলাম কে যেন আমার মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তারপর শুনলাম ফিস ফিস করে, কেউ কিছু বলছে যেন। কি বলছে? কান পেতে শুনলাম—

আর তোমার ছেলেকে নিয়ে ভাবব না ঠাকুর। মা কালী তোমার মুখ রক্ষা করেছেন। যদি ও না ফিরত আমি কি গলায় দড়ি [illegible]। এখন থেকে আমি নিজে ওর লেখা পড়ার ব্যবস্থা দেব। এক হাজার টাকা ওর জন্যে আমি আলাদা করে রেখেছি। বড় হবে ঐ টাকায় ও ব্যবসা করবে। তুমিও বামুন আমিও বামুন, পালটি ঘর। আমার মেয়ে অন্তত এক বছরের ছোট। যদি ভবিতব্য থাকে--

আমার ছেলেকে তো দিয়েই দিয়েছি তোমায় মিস্ত্রী। এ সব কথা তুলছ কেন। যা তোমার ইচ্ছে হয় করবে।

বুঝতে পারলাম, শেষের কথাগুলো আমার বাবা বললে।

•

পরদিন সকাল থেকে ঝিঁঝিকে এড়িয়ে চলতে লাগলাম। মানে ঐ ভবিতব্যে যদি থাকে—

ভবিতব্য নিয়ে হিজিবিজি কল্পনা করার বয়েস হয়েছে তখন। সেই রাতের ব্যাপারটা একটু অন্যমনস্ক হলেই মনে পড়ে যায়। অন্ধকারে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল ঝিঁঝিকে ওর বাবা, অন্ধকারে ঝিঁঝি আমাকে দু' হাতে জাপটে ধরেছিল। তারপর আমি ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দেখেছিলাম, সত্যি কিচ্ছু ছিল না। সেদিন আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। সেদিনকার সেই আগুন কবে জল হয়ে গেছে। সেই জল জমে এতদিন পরে বরফ হতে শুরু করল। বিয়ে হবে ঐ ঝিঁঝির সঙ্গে! কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

ব্যাপারটা যে কিসের জন্যে ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়েছিল তা বলা মুশকিল। মানে ঝিঁঝি আর ঝিঁঝির বাবা, ওদের দু'জনের সম্বন্ধে এত রকমের ব্যাপার আমার জানা হয়ে গেছে তখন যে ঝিঁঝি আমার বউ হচ্ছে এটা ভাবতেই পারলাম না। বউ মানে বউ, ঘোমটা ঢাকা ছোট্ট একটি মেয়ে, যার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। বউ মানে সোজা কথায় লজ্জা, লজ্জার একটি পুঁটলির নাম বউ, সেই লজ্জাটুকুই আসল বস্তু। লজ্জাটুকু যেদিন উবে যায় সেদিন বউ আর বউ থাকে না, মাগ হয়ে যায়। বউয়ের কাছে বরও আর সেদিন বর থাকে না ভাতারে পরিণত হয়। মাগ ভাতারে মিলে ছেলে-পুলে নিয়ে তখন সংসার করে, যেমন আমার বাপ মা করছে। কিন্তু আমি হব বর, ভাতার হবার বয়েস হয়নি আমার। বর হয়ে টোপর মাথায় দিয়ে যাকে বিয়ে করে আনব সে হবে আমার বউ,

মাগ বিয়ে করতে যাব না কি। ঝিঁঝির সঙ্গে বিয়ে হবে! মানে ঝিঁঝি মাথায় ঘোমটা দিয়ে আমার সঙ্গে—

দূর দূব, ঘোমটার আড়ালে কি লুকোবে ঝিঁঝি! কি আমাব জানতে বাকী আছে!

দস্তুরমত ঘাবড়ে গেলাম। ঘাবড়ে যাবার ফলে ঝিঁঝিকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলাম। উলটো ফল হল। খুঁজে খুজে ঝিঁঝি আমাকে পাকড়াও করতে লাগল। পাকডাও কবতে পাবলেই জেরা।

কি হয়েছে? কি আমি করেছি যে পালিয়ে বেড়াচ্ছ?

এমনি, মানে লেখাপড়া, সামনে এগজ্যামিন—

মিথ্যে কথা। কি হয়েছে আমি জানতে চাই। আমার বাবাব সঙ্গে গিয়ে বিপদে পড়েছিলে, তাই আমাব সঙ্গে—

আবে না না। ওসব কাজে ঝুঁকি আছেই। জেনে শুনেই তো আমি গিয়েছিলাম।

তাহলে! কি হয়েছে সত্যি করে বল

মানে-ইয়ে-মানেটা হল এখন আমবা বড় হচ্ছি তো। মানে লোকে কি ভাববে। মানে—

আর আমার কথা জোগাল না কিছু, ওব চোখেব দিকে তাকিয়ে থেমে গেলাম। আঁচলটা বুকের ওপর টেনে ঠিক করে নিয়ে ঝিঁঝি বলল—মানে সত্যি কথা তুমি কিছুতেই বলবে না। আচ্ছা বেশ—

আচ্ছা বেশ বলেও গোঁজ হয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল, রাগ করে চলে গেল না। বিপদ আর কাকে বলে। শব্দশূন্য কথার পাহাড় আমাদেব দু'জনের মাঝখানে দিন দিন মাথা উঁচু কবে দাঁড়াতে লাগল। শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা এমনই শোচনীয় হয়ে উঠল যে প্রকাশ্যে আমরা দু'জনে দু'জনের খুঁত খুঁজে বার করে নিন্দে করতে শুরু করলাম। নন্তীদের বাড়ি কেন যায় ঝিঁঝি তা আমাব জানা আছে। নন্তীর ছোট কাকা সেই গম্বুজটা দিনের বেলা বাড়িতে,

বসে কি করে? সেই গম্বুজের সঙ্গে ঝিঁঝি সিনেমায় গেছে সবাই দেখেছে। এই সবের উত্তরে ঝিঁঝি রটাতে লাগল যে লুকিয়ে-চুরিয়ে আমি বিড়ি খাই। শুধু বিড়ি খেলেও বা কথা ছিল, সাতকড়েদের সঙ্গে বসে আমি নাকি জুয়াও খেলি। স্রেফ জুয়া খেললেও কিছু এমন যায় আসে না কিন্তু জুয়া খেলার পয়সা জোটাবার জন্যে মায়ের বাক্স খুলে পয়সা সরানোটা কি সাংঘাতিক কাণ্ড। যে ছেলে মায়ের বাক্স থেকে টাকা পয়সা সরায় সে যে দু'দিন বাদে গাঁট কেটে বেড়াবে না তা কি কেউ বলতে পাবে।

চাপান ওতরান সমানে চলতে লাগল। এমন সময় সর্ব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল অদ্ভুতভাবে। গাড়ি চাপা পড়ে ঝিঁঝির বাবা হঠাৎ পটল তুললে। ঝিঁঝির মা আর মামারা এসে ঝিঁঝিকে নিয়ে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আমার বাবা কিন্তু বেশ মুশকিলে পড়ে গেল। কয়ালি করে যা জোটে তাতে সংসার চালিয়ে ছেলেকে পড়ানো চলে না। আমার পড়ার খরচা বাদেও যে ঝিঁঝিব বাবা বেশ কিছু সাহায্য করত আমাদের সংসাবে, এটা বুঝতে পারলাম। ঠিক করে ফেললাম রামনারায়ণ কাকার সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে। কাজ তো আমিও শিখেছি, মাঝে মধ্যে যদি একটা দুটো কাজ পাওয়া যায়, তা'লে—

জেগে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। এক গোছা নোট এনে মায়ের হাতে দিচ্ছি। মায়ের চোখ মুখ জ্বলজ্বল করছে। ভাইবোনগুলো দুধ দিয়ে ভাত মেখে খাচ্ছে। রাতে বাবাকে শুকনো রুটি চিবুতে হচ্ছে না, একাদশীর দিন যেমন লুচি খায় বাবা তেমনি রোজ রাতে লুচি খাচ্ছে। আর আমিও একটা রিস্টওয়াচ পরে পরীক্ষা দিতে গেছি। স্বপ্ন দেখতে দেখতে সত্যি একদিন রামনারায়ণ কাকার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। রামনারায়ণ কাকা পেট ভরে লুচি

হালুয়া খাওয়ালেন। নোটও কয়েকখানা হাতে দিলেন। বললেন, কাজ যদি রামজীর কৃপায় জোটে, নিশ্চয়ই তিনি আমাকে খবর দেবেন।

কয়েকটা যন্ত্রপাতি কেনা চাই। লোহা কাটা করাত চাই, উকো চাই চার পাঁচ সাইজের, ছেনি হাতুড়ি চাই, লোহা ছেদা করার যন্ত্র চাই। আর চাই নানা মাপের একগাদা চাবি। ঘুরে ঘুরে মনের মতো সব যন্ত্র কিনে ফেললাম। চল্লিশ টাকার মতো লাগল। তখনও খানকয়েক নোট হাতে আছে। গোটা আষ্টেক টাকা খরচা করে আম আর রসগোল্লা কিনে নিয়ে বাড়ি এলাম। বাকী পাঁচখানা নোট মায়ের হাতে দিতেই মায়ের মুখখানা জ্বলজ্বল করার বদলে ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

কোথায় পেলি? গলা কেঁপে গেল মায়ের।

বললাম—ভয় পাচ্ছ কেন। আগে কাজ করেছিলাম, পাওনা ছিল, আজ দিয়ে দিলে।

আর কিছু না বলে পেঁটরা খুলে নোট ক'খানা মা তুলে রাখলে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বাবা ডেকে তুলে বললেন—আমার আর তোর মায়ের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর যে কোনো দিন ওদের কাছে যাবি না। কোনও রকমে যে চিনতিস তাদের ভুলে যাবি। ওরা কি করেছে জানিস, [illegible] বাবাকে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে। এই রকমই ওরা করে, কিছু দিন একটা লোকের কাছে কাজ নেয়, যেদিন বুঝতে পারে লোকটা ওদের কাণ্ড জেনে ফেলেছে ওদের, সেদিন তাকে সরিয়ে দেয়। মানে একেবারে জন্মের শোধ তার মুখ বন্ধ করে দেয়।

ঘাবড়ে গিয়ে বাবা মায়ের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম। না, জীবনে আর কোনদিন রামনারায়ণ কাকার কাছে যাব না। তবে যন্ত্রপাতিগুলো যখন কেনা হয়ে গেছে তখন একটু আধটু ঐ কাজ করব। যা পাওয়া যায় ক্ষতি কি। স্কুলের মাইনেটা যদি হয়ে যায়।

সিন্দুক কোথায় !

ধনকেষ্ট বাবু সেই খাটের মাথার দিক দিয়ে নিয়ে গেলেন আমাকে খাটের ওধারে। দেওয়াল ঘেঁযে দুটো লোহার সিন্দুক বসানো রয়েছে বটে, খাটখানার জন্যে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নজর পড়েনি। এ হল পুরনো আমলের ডালা তোলা সিন্দুক। ডালা এত ভারী যে দু-তিনজন লোক লাগবে ওপরে তুলে খাড়া করতে। দেখেই বুঝলাম ও-জাতের সিন্দুক খোলা সহজ কাজ নয়।

কাজে লাগতে হল তৎক্ষণাৎ। ধনকেষ্ট বাবুর তাড়া ছিল। খুলতে কতক্ষণ সময় লাগবে জানতে চাইলেন।

জবাব দিলাম না। প্রকাণ্ড দুটো চাবি বার করে উকো দিয়ে ঘষতে বসলাম। বারকতক চেষ্টা করার পব চাবি ঘুরল। ডালার ওপরের ছোট্ট একটা ঢাকনা সরে গেল। বেরোল সেই আসল কল, যে কল সিন্দুকের ডালা আটকে রেখেছে। এই কলটা নাড়াতে পারলে হাতল ঘোরানো যাবে।

আর একটা চাবি নিয়ে কাজ শুরু করলাম। ধনকেষ্ট বাবু তাড়া দিতে লাগলেন—তাড়াতাড়ি করে হাত চালাও, জরুরী কাজ আছে আমার, এখনই বেরুতে হবে।

ঘস ঘস ঘস ঘস উকো চালাচ্ছি, উকো চালানো বন্ধ করে তালায় চাবি ঢুকিয়ে দেখে নিচ্ছি, ঠিক লাগল কি না। লোহা কাটা করাত চালিয়ে চাবির মাথাটা একটু ছোট করতে হল। শেয পর্যন্ত চাবি পাক খেল, খটাস করে একটা শব্দ হল। একটা হাতল ধরে জোরসে মোচড় দিলাম। ঘড় ঘড় ঘড়াং আওয়াজ হল। ধনকেষ্ট চাপা গলায় বলে উঠলেন—কেল্লা ফতে। বাবাকে আসতে বললেন সিন্দুকের কাছে। তিনজনকেই হাত লাগাতে হবে, নয়তো সেই জগদ্দল প্রমাণ ডালাটকে খাড়া করা যাবে না।

তিনজনের প্রাণান্ত চেষ্টায় ডালা উঠল শেষ পর্যন্ত। পেছনে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা হল ডালাটাকে। ধনকেষ্ট আর

একমুহূর্ত অপেক্ষা করলেন না। সিন্দুকের মধ্যে নেমে কি যেন হাঁটকাতে লাগলেন। খানিকক্ষণ ঘেঁটে চাপা হুংকার ছাড়লেন। কি যে বললেন ঠিক বোঝা গেল না।

হি হি হি হি হি—

আঁতকে উঠলাম আমরা দু'জনে। কে হাসছে ও রকম করে!

প্রকাণ্ড ঘব, একটা বাল্‌ব জ্বলছে সিন্দুক দুটোর পেছনে দেওয়ালের গায়ে, তাতে ঘরেব সিকি ভাগও আলো হয়নি। এধারে ওধারে তাকিয়ে দেখলাম। কই, কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না!

সিন্দুকের ভেতর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছেন তখন ধনকেষ্ট। আমার দিকে তাকিয়ে আর একটা হুংকাব ছাড়লেন—দাঁড়িয়ে আছ যে। খোল, খোল শিগ্‌গিব ঐ সিন্দুকটা। জলদি কব, হাত লাগাও।

ভয়ে পেয়ে গেলাম। লোকটা খেপে উঠেছে না কি!

সেই প্রেতেব হাসি বন্ধ হয়েছে তখন। খাটের ওপর তাকিয়ে দেখলাম চাদর ঢাকা মানুষটা ঠিক তেমনই পড়ে আছে।

বাবা হঠাৎ বেঁকে বসল—না আব নয়। এখনই চলে যাব। চল রে, যন্ত্রপাতি সব গুছিয়ে নে।

তার মানে? ধনকেষ্ট খেঁকী কুত্তাব মতো দাঁত বের করে তেড়ে উঠলেন—তার মানে কি? কাজ না করেই চলে যাবে? কেন আমি কি টাকা দোব না?

টাকা আমবা চাই না। বাবা সাফ জবাব দিলে।

দর বাড়াচ্ছ? ঠিক হায়, এক শ' দু'শ পাঁচ শ' যা চাও দোব। খুলতে বল তোমার ছেলেকে ঐ সিন্দুকটা। জলদি জলদি, জলদি কর বলছি, নয়তো ভাল হবে না।

এবার আমি জবাব দিলাম—চোখ রাঙাচ্ছেন? কাজ যদি না করতে চাই জোর করে করাবেন না কি?

তবে রে—বলে ধনকেষ্ট লাফ মেরে উঠলেন সিন্দুকের ভেতর

থেকে বাইরে নামবার জন্যে। পরমুহূর্তে এক বুকফাটা চিৎকার—বাবা গো!

চোখ বুজে ফেললাম আমি। কি একটা বলে বাবা চেঁচাতে লাগল। সেই পৈশাচিক হাসি আবার শুরু হয়ে গেল—হি হি হি হি হি হি।

দুপদাপ দুপধাপ শব্দ চারিদিকে। বিস্তর মানুষ ছুটে আসছে। আমরা দু'জনে তখন সিন্দুকের ডালাটা দু' দিক থেকে ওপরে তোলবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছি।

চাকর দরোয়ান আরও দু' চারজন ঢুকল ঘরে। ডালা তুলে হরেকেষ্ট বাবুকে বার করে ঘরের মেঝেয় শোয়ানো হল। মরে গেছেন না বেঁচে আছেন বোঝা গেল না। কোমরের নিচে থেকে অর্ধেকটা শরীর ছিল সিন্দুকের ভেতরে, বাকীটা ছিল বাইরে। যদিও বাঁচেন, কোমর সোজা করে উঠতে পারবেন না কোনদিন।

নিচে গাড়ি থামার শব্দ হল। একটু পরে সাহেবী পোষাক পরা দুই ভদ্রলোক ঢুকলেন ঘরে। ঘরের কোণে আমরা গলা-ধরা দু'জন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

ভদ্রলোক দু'জন কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন খাটের পাশে। একজন চাদর ঢাকা লোকটার ওপর একটু ঝুঁকে দু'হাত বিছানার ওপর দিয়ে কি যেন শোনবার চেষ্টা করছেন মনে হল। ঘরেতে আর যারা ছিল তারা দম আটকে তাকিয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত পরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোকটি চাদরখানার এক-দিক সরিয়ে দিলেন। মাথা মুখ গলা পর্যন্ত দেখা গেল। একটি বুড়ো মানুষ শান্তিতে ঘুমিয়ে রয়েছেন।

হরেকেষ্ট—আড়াল থেকে কে যেন ডাক দিল। বোঝা গেল মেয়েমানুষের গলা।

যে ভদ্রলোকটি চাদর সরিয়ে ছিলেন মরা মানুষটির মুখের ওপর থেকে তিনি সাড়া দিলেন—ছোট মা! কোথায় তুমি?

লুকিয়ে বসে আছি ছোট ঘরে, নয়তো এতক্ষণ খুন হতাম। খুব

সময় মতো এসে পড়েছিল বাবা। চাকর দরোয়ানদের নিচে যেতে বল। আর ঐ মিস্ত্রী দু'জনকে বিদেয় কর। শ' দুয়েক টাকা ওদের দিয়ে দিগে যা। আর একটা সিন্দুক খুলতে ওবা রাজী হল না বলেই সব বাঁচল। সবাইকে যেতে বল, নয়তো আমি বেরোতে পারছি না।

কথাগুলো আমরা প্রত্যেকেই শুনলাম। নিঃশব্দে সবাই বেরিয়ে গেলাম। আমার অত সাধের যন্ত্রপাতি সব সেখানেই পড়ে রইল।

সিঁড়ি দিয়ে নামছি, ছুটতে ছুটতে এসে হরেকেষ্ট বাবু বাবার হাতে এক গোছা নোট জোর করে গুঁজে দিলেন। বললেন—এখন আর কোনও কথা নয় কয়াল মশাই, আপনি আমাকে চেনেন আমিও আপনাকে চিনি। দেখবেন, আমাদের মুখে চূণকালি না পড়ে।

না ওঁদের মুখে চূনকালি পড়ল না। খুব ঘটা করে নরকেষ্ট সাহার শ্রাদ্ধ হল। বড় ছেলে ধনকেষ্ট বাবু বাপের মুখে আগুন দিতে পারল না। পড়ে গিয়ে বিষম চোট পেয়েছেন, শিরদাঁড়া বোধ হয় ভেঙে গেছে, প্লাস্টার করা হয়েছে, নার্সিং হোমে শুয়ে আছেন। বেশী বয়সে আর একটা বিয়ে করেছিলেন সাহা মশাই, সেই বউকে অর্ধেক সম্পত্তি লেখাপড়া করে দিয়ে গেছেন। শ্রাদ্ধ শান্তির পর ছোট বউ তাঁর ভাগের সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে বৃন্দাবন চলে গেলেন। বাকী জীবনটা তিনি বৈষ্ণব সেবা করে কাটাবেন।

তা কাটান গে। আমাদের দিন কিন্তু আর কাটতে চায় না। আমার মুখে চূনকালি পড়ল। প্রথম বার ম্যাট্রিক দিয়ে কুপোকাত হলাম। ওধারে বাবার কোমর বেয়াড়া চালে চলতে চলতে মাঝে মাঝে না জবাব দিতে লাগল। স্কুলে যাওয়া বন্ধ, খামোকা স্কুলের খরচা টেনে কি লাভ। ঠিক করেছি প্রাইভেট হয়ে পরীক্ষা দোব। কিন্তু রোজগার কিছু করতেই হবে। মাঝে মাঝেই বাড়িতে হাঁড়ি চড়ছে না। রোজগারের পন্থা খুঁজে বেড়াতে লাগলাম।

যে খায় চিনি তাকে জোগায় চিন্তামণি। আমার বাবা প্রায়ই

চিন্তামণির দোহাই পেড়ে ভাল মাছ ভাল আম কিনে এনে আমাদের খাওয়াত। সেই চিন্তামণিই দয়া করলেন আমাকে, আমি রিকশা টানতে শিখলাম।

চিন্তামণিরা আমাদের বস্তিতেই থাকত। আগে ওরা পালকি বইত। পালকির চল উঠে গেল, তখন ওরা রিকশা টানা ধরল। বেশ বুড়ো হয়েছিল চিন্তামণি, রিকশা টানা কিন্তু ছাড়েনি। কটক জেলার লোক ওরা, দেশে গিয়ে পনরোটা দিন থাকতে পারত না। দেশে গিয়ে ছেলে বউয়ের কাছে বসে থাকতে না কি ঘেন্না করে। পুরুষ মানুষ, রোজগার করতে হবে তো।

বৈশাখ মাস, পিচ গলে নবম হয়ে পড়েছে। মাথায় গামছা জড়িয়ে টুনটুন করতে করতে দিব্যি ছুটছে চিন্তামণি। রিকশায় দু' মণ মাল আব আস্ত একটা মানুষ, ভ্রূক্ষেপ নেই। পায়েব তলায় গলা পিচ, মাথাব ওপর আগুন ঝবে পড়ছে আকাশ থেকে, বাতাসও এমন তেতে উঠেছে যে শ্বাস টানা যাচ্ছে না। বড় বয়েই গেল। রিকশাওয়ালা হচ্ছে রিকশাওয়ালা। রাস্তার পিচ না গললে মাথার ওপর অগ্নিবৃষ্টি না হলে বা আকাশ ভেঙে জল না নামলে লোকে রিকশায় চড়বে কেন। সখ করে কি কেউ বিকশায় চাপে।

বিপাকে পড়লে অবশ্য চাপে। আসন্নপ্রসবা পবিবারকে নিয়ে রিকশায় চেপে অনেককে হাসপাতালে ছুটতে হয়। পয়সা থাকলে ট্যাক্সি, পয়সা না থাকলে রিকশা, বিপাক থেকে উদ্ধার পাওয়া চাই। কোনও রকমে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে পারলেই হল। নবজাতক বংশধরটিকে নিয়ে পরিবার হাসপাতাল থেকে ফিরবে কি না সে পরের কথা। না ফিরলেও বিশেষ দুঃখ নেই, দায় মুক্ত তো হওয়া গেল।

সেদিন চিন্তামণি আমাদের বস্তির একজনকে কথা দিয়েছিল যে তার পরিবারকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবে। কপালের ভোগ আর কাকে বলে, হঠাৎ চিন্তামণির গোদ টাটিয়ে জ্বর উঠে গেল। লোকটি

যখন চিন্তামণিকে ডাকতে এল তখন তার উত্থানশক্তি নেই। অন্য রিকশা ডাকতে গেলে চার গুণ খরচা। রিকশাওয়ালাদের ভাষায় আসন্নপ্রসবা মেয়েছেলে হচ্ছে ডিমওয়ালা ইলিশ। ডিমওয়ালা ইলিশকে কেউ রিকশায় তুলবে না, পথে যেতে যদি ডিম ছেড়ে দেয়। চিন্তামণি যেতে পারবে না শুনে লোকটি যা তা বলে গাল দিতে লাগল। হৈ চৈ হচ্ছে কেন জানবার জন্যে গিয়ে পড়লাম আমি। আমাকে দেখে চিন্তামণি ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললে। ওধারে সেই লোকটিরও তখন কাঁদো কাঁদো অবস্থা। দরদস্তুর করে অন্য রিকশা ঠিক করতে গেলে দেরি হয়ে যাবে।

আমার ভাইবোনগুলো হবার সময় মায়ের যন্ত্রণা ভোগ দেখেছি। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। কিছু করা চাই। এবং সেই করাটা তাড়াতাড়ি করতে হবে।

রিকশাখানা কোথায়?

হাফপ্যান্ট পরা ছিল। চিন্তামণি বলল, প্যান্টের নিচে একটা লেঙট পরে নিতে। লেঙট একটা শুকোতে দিয়েছিল কে। ভাবনা চিন্তার সময় কোথায় তখন। সেই লেঙটটাই পরে নিলাম। চিন্তামণির রিকশায় সেদিন আমার হাতেখড়ি হল। ওদের দু'জনকে নির্বিঘ্নে হাসপাতালে পৌঁছে দিলাম। একটি পয়সাও লাগল না বলে লোকটি আমায় প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করলে।

সেই আশীর্বাদের ফল ফলতে শুরু করল তৎক্ষণাৎ। গাড়ি নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরোচ্ছি, ফটকের সামনে আর একজন পাকড়াও করলে। তার বউ ছেলেকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিচ্ছে। তাদের নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।

কোথায় যেতে হবে জানতে চাইলাম না। জানতে চাইলাম কত মিলবে। লোকটি বললে পাঁচ সিকে। ভাড়া এক টাকা আর বকশিশ এক সিকি। ন্যায্য ভাড়া, ওর বেশী এক পয়সা চাইলে মিলবে না।

লোকটির চক্ষুলজ্জা আছে বলতে হবে। ন্যায্য ভাড়া দেবার সময় পুরো দুটো টাকাই আমার হাতে দিলে। বললে খুশি হয়ে আমাকে পুরো একটা টাকাই বকশিশ করে ফেলেছে।

অহো কি মহানুভব!

ঝাড়া আড়াই ঘণ্টা ধরে আমি পুত্র পরিবারসুদ্ধ সেই মহানু-ভবকে টেনে নিয়ে গেলাম। ন্যায্য ভাড়া দিতে হলে আরও অন্তত একটি টাকা তাঁর খসত।

সে যাক, রোজগার তো হল। খালি রিকশা নিয়ে উড়ে চলে এলাম চিন্তামণির কাছে। দুটো টাকা ওর কাঁথার ওপর রেখে শোনালাম রোজগারটা করলাম কেমন করে। আশ্চর্য ব্যাপার, দুটো টাকা চিন্তামণি কিছুতেই নিলে না। ওর আবার ন্যায্য অন্যায্য জ্ঞান অন্য জাতের। হাজার হোক ছোটলোক, বোকা উড়ে, পেটের দায়ে বুড়ো বয়েসে রিকশা টেনে মরছে, ও ব্যাটা ন্যায্য অন্যাযার বোঝে কি। বললে—দাদাবাবু, ও পয়সা নিলে প্রভু জগন্নাথ আমার ওপর গোসা করিব, ঐ পয়সা দিয়ে তুমি রসগোল্লা কিনি কিড়ি খাওগে।

রসগোল্লা কিনি কিড়ি না খেয়ে টাকা দুটো এনে মায়ের হাতে দিলাম। বললাম কি ভাবে রোজগার হল। মায়ের দু'চোখ ছলছল করে উঠল। রক্তের স্বাদ পেলাম আমি, টাকা তো তাহলে গতর খাটিয়ে রোজগার করা যায়। এইবার দেখাচ্ছি মজা।

চিন্তামণি একখানা গাড়ি ঠিক করে দিল। মালিককে মাত্তর বারো গণ্ডা পয়সা দিতে হবে। ফোটো তুলিয়ে লাইসেন্স করাতে হবে। কিন্তু, লাইসেন্স না থাকলে গাড়ি কেড়ে নিয়ে থানায় অটকে রাখবে।

পাঁচ টাকা ধার নিলাম চিন্তামণির কাছে। ফটো তোলানো লাইসেন্স করা দুটো লেঙট কেনা সব হয়ে গেল। টুনটুন টুনটুন ছুটতে লাগলাম পথে পথে। যত দৌড়তে পারব তত রোজগার

বাড়বে। মালিকের বারো আনা মিটিয়ে চার ছ' আনা চা বিস্কুট খেয়ে কোনও দিন তিন টাকা কোনও দিন চার টাকা মায়ের হাতে দিচ্ছি। আর চাই কি!

চাই অনেক। সেটা বুঝতে পারলাম বাবা বিছানায় শোবার পরে। সংসার চালাত বাবা,সেই চলমান সংসারে আমি রিক্‌শা টেনে যা পারতাম ঘুষ দিতাম। সংসারকে সচল রাখার দায়টা যখন নিজের কাঁধে এসে পড়ল তখন বুঝলাম ব্যাপারটা। মর্জি হল তো গাড়ি নিয়ে বেবোলাম নয়তো বিছানায় শুয়ে এগ্‌জামিনের পড়া পড়তে লাগলাম, এইভাবে চলছিল আমাব ফূর্তিসে রোজগার কবা। আমার ফুর্তিটুকু ঘুচে গেল, ঝড় জল দাঙ্গা যা ই হোক না কেন রিকশা নিয়ে বেরোতেই হবে। মর্জি অমর্জিব কথা ওঠেই না।

ঘুচে গেল বিকশা টানার নেশা। খিটখিটে হয়ে উঠলাম, খদ্দেরদের সঙ্গে দবদস্তুব নিযে খচাখচি বাধতে লাগল। রোজগারও কমে গেল। দিনে দিনে একটা হাড়হাবাতে চোয়াড় বিকশাওয়ালা ব'নে গেলাম। কাবও সঙ্গে ভালো কথা বলতে গেলেও সে মনে কবত আমি যেন তাকে মাবতে যাচ্ছি।

এ হেন যখন অবস্থা তখন একদিন রামনারায়ণ কাকা আমাকে পাকড়াও করলেন। রিকশা নিয়ে বসে আছি শিয়ালদা স্টেশনে, পাশে একখানা মোটর গাড়ি থামল। গাড়ি থেকে নেমে রাম-নারায়ণ কাকা কোনও কথা না বলে আমার রিকশায় চেপে বসলেন। বসে হুকুম করলেন, ধর্মতলা চল।

টুনটুন টুনটুন চললাম ধর্মতলার দিকে। ব্যাপার কি বুঝতে পাবলাম না। উনি কি আমাকে চিনতে পারেননি! মৌলালির মোড়েব কাছে পৌঁছবার পব হুকুম পেলাম সোজা যাবার। তারপর ডানদিকে ঘুরে ফুটপাথের ধাবে থামতে বলা হল। রামনারায়ণ কাকা নামলেন। পকেট থেকে একখানা পোস্টকার্ড বার করে ঠিকানা,

দেখে নিয়ে বললেন—এই গলিই বটে, এখন বাড়ির নম্বর খুঁজে পেলে হয়। যতক্ষণ না আমি আসছি এইখানেই থাকো তুমি। পালিও না যেন, পালালে আমি এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাব না।

বিপদ!

রামনারায়ণ কাকা একলা ঢুকলেন গলির ভেতরে। জেনে শুনেই গেলেন যে বিপদে পড়তে পারেন। কি জাতের বিপদ—কে জানে। বসে থাকতে হবেই আমাকে, রামনারায়ণ কাকাকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে যেতে পারি আমি। যদি দরকার হয় তাহলে—

তাহলে কি করব ভেবে পেলাম না। খানিকক্ষণ পরে রিকশা নিয়ে ঢুকব গলিতে, খুঁজে দেখতে হবে কোন্ বাড়িতে উনি গেছেন। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। মানে সোজা পুলিশ ডেকে আনব।

পুলিশ ডাকাটা কি ঠিক হবে।

রামনারায়ণ কাকার ব্যাপার কি না, কেঁচো খুঁড়তে যদি সাপ বেরিয়ে পড়ে।

মনে পড়ে গেল আমার বাবার সেই কথাগুলো। ঝিঁঝির বাপকে ওরা চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে।

ওরা মানে কারা। নিশ্চয়ই রামনারায়ণ কাকা সেই ওদের দলে নেই। ঝিঁঝির বাপ তো নানা রকমের লোকেদের সঙ্গে মিশত। রাত্রি বেলা যারা সোনার গহনার দোকানে তালা ভাঙতে যায় তাদের সঙ্গেও কাজকারবার ছিল ঝিঁঝির বাপের। রামনারায়ণ কাকার মতো মানুষ নিশ্চয় ঐ জাতের ক্যাচড়া কাজে হাত দেন না।

বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবছি। আর কতক্ষণ দেরি করা উচিৎ। ঢুকব না কি গলিতে।

ভয়ানক দুর্দিনে মিলিটারি গাড়ি চেপে আমরা রামনারায়ণ কাকার কাছে গিয়েছিলাম। দু'শ টাকা তখনই আমাদের হাতে দিয়ে দেন রামনারায়ণ কাকা। সেই টাকাটা না পেলে সেদিন আমাদের বস্তির অনেকের ঘরে হাঁড়ি চড়ত না।

ঝিঁঝি আমার ভাইবোনগুলোর কান্না সইতে না পেরে আমাকে নিয়ে মিলিটারির গুলি খেতে বেরিয়ে পড়েছিল। আমার জামা প্যান্ট পরেছিল ঝিঁঝি। অদ্ভুত মানিয়েছিল কিন্তু। ওর বাপ সেই টুঁটো টুঁটো ফ্রকগুলো যদি না কিনে দিত ওকে—

ডুবে গেলাম ঝিঁঝির ভাবনায়। কে জানে এখন কোথায় আছে। নিশ্চয়ই বিয়ে দিয়েছে ওর মামারা, শ্বশুর বাড়ি চলে গেছে। ভাগ্যে সেই ভয়ঙ্কর ভবিতব্যটা আমার ঘাড়ে চাপেনি।

চোখ বুজে বসে বিড়ি টানছিলাম আর ভাবছিলাম। টেরই পাইনি যে ভবিতব্য তখন আমার পাশে এসে খাড়া হয়েছে। রামনারায়ণ কাকার ডাকে চমকে উঠলাম। আপাদমস্তক গরদের চাদরে ঢাকা এক মহিলাকে নিয়ে উনি গাড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

তড়াক করে নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। ওঁরা উঠলেন। তুলে নিলাম গাড়ি, তৈরি হলাম ছোটবার জন্যে। সংক্ষিপ্ত হুকুমটি পেলাম পেছন থেকে—আমার বাড়িতে চল।

ফাঁদে পা দেবার জন্যে ফাঁদটিকেই টানতে টানতে নিয়ে চললাম।

এখন আমি যা শোনাতে যাচ্ছি সেটা পড়ে অনেকেই মুখ বেঁকিয়ে বলবেন, জলজ্যান্ত নেকাপনা। নর নারীর যৌন সম্পর্ক নিয়ে যারা মাথা ঘামান তাঁরা আরও চড়া ভাষায় কড়া মন্তব্য প্রকাশ করবেন। বলবেন, রিকশা টানতে টানতে চিনু লাহিড়ী ছোঁড়াটার সেক্স শুকিয়ে গিয়েছিল। আর যারা হৃদয়বান তাঁরা হায় হায় করতে থাকবেন এই ভেবে যে নিদারুণ গরীব ছিল বলেই চিনু লাহিড়ী অর্ধেক রাজত্ব আর আধখানা রাজকন্যের লোভ সামলাতে পেরেছিল। হ্যাঁ, আসল কথাটাই ঐ। রাজকন্যেটির আধখানা দখল করতে ঘেন্না হয়েছিল আমার, ঐটুকুই আসল কথা। পুরোটা পাওয়ার ভরসা থাকলে কি করতাম সেদিন তা কি বলতে পারি।

মানে ঐ রামনারায়ণ কাকা। রামনারায়ণ কাকারা ঝিঁঝির বাপকে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছিল। রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে গিয়ে আমি আর ঝিঁঝির বাবা এক মানী মানুষের ঘরের তালা খুলে লোহার আলমারি চিচিং-ফাঁক করেছিলাম। একশখানা দশটাকার নোট আর একটা সোনার আংটি এক রাতের রোজগার। রোজগারটা অবশ্য রামনারায়ণ কাকার হাতেই তুলে দিয়েছিল ঝিঁঝির বাপ। ঐ কাজের ঐ রকমই দস্তুর। রামনারায়ণ কাকার মতো বড় দরের মানুষ মাঝখানে না থাকলে কে আমাদের বিশ্বাস করে কাজ দিত।

ঝিঁঝি রামনারায়ণ কাকার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই টাকা পেত। আমিও পেয়েছি। কিন্তু—

রামনারায়ণ কাকা বুঝিয়ে বলতে লাগলেন—কিন্তু-টিন্তু চলবে না। ওর বাবা আমার কাছে এক হাজাব টাকা রেখে গেছে। বিয়ের পর টাকাটা তুমি পাবে। কারণ টাকাটা তোমার। তাছাড়া ওর বিয়েতে আমি তিন চার হাজার টাকা খরচ করব। করতে বাধ্য আমি, একদিন মেয়ের বিয়ে দিতে হবে বলে তার পাওনা টাকার অনেকটাই সে আমার কাছ থেকে নেয়নি। তোমার বাবাও কথা দিয়েছিল তুমি ঐ মেয়েকে বিয়ে করবে। ওর মামারা অন্য জায়গায় ওর বিয়েব ঠিক করেছিল, ও পালিয়ে এসেছে। ও বলতে চায়, তোমার সঙ্গে তো ওর বিয়ে হয়েই গেছে। যে বিয়ে ওর বাবা ঠিক করে মরে গেছে, সেই বিয়েই বিয়ে। আবার আর এক জায়গায় ওব বিয়ে হবে কেন? ও বলছে, হিঁদুর মেয়ের কি দু'বার বিয়ে হয়!

রামনারায়ণ কাকা উঠে পড়লেন। বললেন—আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যা বলার তুমিই বল। মনে রেখ, তোমার জন্যে ও ওর মা আর মামাদের আশ্রয় ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। আবার কি ও ফিরে যাবে! ফিরবে কেমন করে! যাক সে কথা, আমি যত দিন বেঁচে আছি ঐ মেয়ে থাকবে আমার কাছে। মরে যাবার

আগে আমি একটা ব্যবস্থা করে যেতে পারব। কিন্তু দায় তোমার, তোমার বাবা আর ওর বাবা যা ঠিক করেছিল সেটা মানবে কি না তুমিই জানো। জোর জবরদস্তি করার ব্যাপার নয় এটা। যদি তুমি এড়িয়ে যেতে চাও—

মাথা হেঁট করে রইলাম। রামনারায়ণ কাকা চলে গেলেন।

একটু পরে যখন আওয়াজ কানে গেল বুঝতে পারলাম ঘরের ভেতর কেউ একজন এসেছে। মুখ তুলতে পারলাম না।

উঃ, কি রোগা হয়ে গেছ তুমি। কি রকম চেহারা হয়েছে তা আয়নায় দেখেছ কোনও দিন? মা গো! রিক্শা চেপে আসার সময় যদি টের পেতাম যে তুমি টেনে আনছ—

মুখ তুলে তাকিয়ে সত্যিই হকচকিয়ে গেলাম।

ঐ ঝিঁঝি!

ঝিঁঝিও বোধহয় একটু লজ্জা পেল। দামী সিল্কের শাড়ি পরেছে, আঁচলটা অবাধ্য, ঠিক জায়গায় থাকতে চাইছে না। আমার চোখ দুটোও অবাধ্য। হেংলার মতো তাকিয়ে আছি। সেই চাউনিকে সমীহ না করে ঝিঁঝি নিজের কথাই বলে গেল- ফের যদি রিক্শা টানো আমি গলায় দড়ি দোব বলে দিলাম। কেন ঐ উঞ্ছবৃত্তি করা। তোমার কি টাকা নেই? বাবা যা রেখে গেছে আমাদের জন্যে—

আমাদের জন্যে নয় শুধু তোমার জন্যে। অনেক কষ্টে ঐটুকু আমি বলতে পারলাম।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল ঝিঁঝি—এক কথাই হল। যে টাকা রেখে গেছে বাবা তা দিয়ে একটা দোকান খোলা যাবে। তুমি রিক্শা টানবে আমি মামাদের বাড়িতে বাসন মাজব এই জন্যেই কি টাকা-গুলো রয়েছে। মনে করেছিলাম, কোনও দিন আর তোমার সামনে আসব না। হয় তুমি নিজে গিয়ে আমাকে আনবে নয়তো আমি চিরকাল বাসন মেজে ঝি গিরি করে বেঁচে থাকব। তাই থাকতাম,

তাতেও তারা বাদ সাধল। খোল ভূষির দোকানী এক মেড়ুয়ার কাছ থেকে দু'শ টাকা নিয়ে মামারা বিয়ে দেবার নাম করে আমাকে বেচে দিচ্ছিল। এক কাপড়ে পালিয়ে এসেছি। উঠেছিলাম বাবার এক বন্ধুর বাড়িতে। সেখান থেকে রামনারায়ণ কাকার কাছে খবর পাঠাই। রামনারায়ণ কাকা আজ গিয়ে উপস্থিত। তা প্রতিজ্ঞাটা আমার ঠিকই রইল, তুমি নিজে গিয়ে নিয়ে এলে। তাও আবার বয়ে নিয়ে আসা, সহজ কথা না কি। নাও, ওঠ এখন, স্নান করে আগে ঐ লক্ষ্মীছাড়া সাজ ফেলে দাও। হ্যাঁ প্যান্টটা কি কাপড়ের? এমন পাতলা যে ভেতরের লেঙট পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, মা গো মা, ঐ সব পরতে লজ্জা করে না!

গা হাত পা শিরশির করতে লাগল, নেশা লেগে এল যেন। বুঁদ খেয়ে বসে রইলাম।

হঠাৎ ঝিঁঝি এক তাজ্জব কাজ করে ফেললো। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে আমার সামনে মেঝেয় হাটু গেড়ে বসে পড়ল। হাত দু'খানি আমার হাঁটুর ওপর আলতো ভাবে রেখে ফিসফিস করে বলল—কত অন্যায় করেছি, আজেবাজে কথা বলেছি তোমার নামে, তখন আমরা ছোট ছিলাম, আমার মাথা ঠিক ছিল না। বাবা কি রকম মারত মনে আছে তো তোমার। তোমার জন্য আমি বেঁচেছি। সেই ঢিল যদি তুমি না মারতে—। যাক গে ও সব কথা। আমাকে মাফ কর, আমি অনেক অন্যায় করেছি।

ওর নরম হাত দু'খানির দিকে তাকিয়ে দম আটকে বসে রইলাম। রিক্শাওয়ালার কালশিটে পড়া হাঁটুর ওপর সেই হাত দু'খানি বিশ্রী বেমানান দেখাচ্ছে। ওর হাতের তেলো অত নরম। মামার বাড়ি বাসন মাজত না!

ঘরের বাইরে কিসের শব্দ হল। টুপ করে উঠে পিছিয়ে গেল ঝিঁঝি। আমিও মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে টানটান হয়ে বসলাম। রামনারায়ণ কাকা দরজার বাইরে থেকে বললেন—'এখন ওকে স্নান

করাও ঝিঁঝি মা। কথা কইবার অনেক সময় পাবে। আগে স্নান করে খেয়ে দেয়ে নিক। জামা কাপড় তেল সাবান সব স্নানের ঘরে আছে।

উঠে দাঁড়ালাম।

ঝিঁঝি বলল—চল, এই দিকে ওদিকে নয়।

না, ও দিকে নয়, যে দরজা দিয়ে ঢুকেছি সেই দরজা দিয়েই যাচ্ছি।

মানে!

মানেটা খুবই সোজা। জীবনে আমি বিয়ে করব না।

বিয়ে—ঝিঁঝির দুই চোখ ফেটে বেরোবার উপক্রম।

হেসে ফেলে হালকাভাবে বললাম—ঐ পাট কর্ম এ জীবনে করব না আমি। তার কারণ ওটা আমার কপালে নেই। কপনি খেঁচে যে রিক্শা টেনে বেড়ায়, বিয়ের সখ তার থাকতে নেই। টাকার লোভ আমায় দেখিও না দিদি। তোমার বাবার কাছে যে বিদ্যে শিখেছি সেই বিদ্যের জোরে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করতে পারি। মা বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি ও কাজ আমি জীবনে করব না। তোমার বাবাকে ওরা গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে। কেন মেরেছে জানো? ঋণের শোধ তোমার বাবার মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিল। তোমার বাবা ওদের অনেক ভেতরের খবর জেনে ফেলেছিল, এই হল তোমার বাবার অপরাধ। টাকাকড়ি থাকাটা কি সাংঘাতিক ব্যাপার শুনবে? নবকেষ্ট সাহার অনেক টাকা। নবকেষ্ট মরে পড়ে আছে খাটের ওপর। তার বড় ছেলে বনকেষ্ট তখন সিন্দুক খোলবার জন্যে ওর মাকে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর সিন্দুকের ডালা চাপা পড়ে—

নিঃশব্দে রামনারায়ণ কাকা এসে দাঁড়ালেন ঘরের মাঝখানে। চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—ওর বাবাকে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরেছে কারা?

নির্বাক হয়ে রইলাম।

কে বলেছে তোমাকে যে ওব বাবাকে গাড়ি চাপা দিয়ে মাবা হয়েছে ?

আমাব বাবা বলেছে। জবাব দিতে বাধ্য হলাম।

ঐ বকমেব একটা কথা আমাব কানেও উঠেছে। তোমাব বাবাও ঐ কথা বলেছেন। তাহলে তো দেখতে হচ্ছে ব্যাপাবটা। খুবই অন্যমনস্ক হয়ে পডলেন বামনাবায়ণ কাকা। অন্যমনস্কভাবেই ঘব থেকে বেবিয়ে গেলেন আবাব। বলতে বলতে গেলেন—মেয়েটা তো বেঁচে বযেছে, মেয়েটা প্রতিশোধ নেবে, ছেড়ে দেবে কেন ?

প্রায় মিনিটখানেক চুপচাপ কাটল। তাবপব আমি পা বাড়ালাম।

সামনে সবে এসে পথ আগলে দাঁডাল ঝিঁঝি। জিজ্ঞাসা করল—কি কবব আমি এখন ?

জবাব দিতে পাবলাম না। ওকে পাশ কাটিযে দবজাব সামনে পৌঁছলাম। পেছন থেকে ডাক শোনা গেল— শোন।

পা দু'খানা থেমে পডল। তাবপব এই ক'টি কথা শুনতে পেলাম—আমাবও প্রতিজ্ঞা, একদিন আমি তোমাকে ঐ কপনি ছাডাবই। তোমাব জিনিস, এইভাবে তুমি ফেলে যাচ্ছ। বলেও গেলে না, কি কবব আমি এখন। আচ্ছা—

টুনটুন টুনটুন বিক্‌শা টেনে বেডাতে লাগলাম।

তাবপব কপাল ফাটল। সাহেবেব মতো সাহেব ব্র্যাণ্ড সাহেবেব কৃপা লাভ কবলাম। আত্মাবাম হযে গেলাম পুরোপুরি। সাহেবেব হুকুমে বিয়ে কবলাম। সেই বিয়েব বিড়ম্বনা থেকে পবিত্রাণ দেবার জন্যে সাহেব আমাব বিযে করা বৌটিকে আর তাব মাকে নিয়ে জাহাজে চেপে ভেসে গেলেন। আমার নামে এমন সব দামী কথা লিখে রেখে গেলেন আফিসের কাগজ পত্রে যে সড়সড় করে সিঁড়ি বেয়ে ওপব দিকে উঠতে কোনও কষ্ট হল না।

রিক্‌শা টানা কিন্তু ছাড়লাম না। রিক্‌শা থেকেই আমার উন্নতি। সন্ধ্যার পর রিক্‌শা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। খদ্দের জোটে ভাল না জোটে ক্ষতি নেই। হাওয়া তো খাওয়া হয়।

আসল চীনে রিক্‌শা, বসিয়ে রাখলে যে নষ্ট হয়ে যাবে।

ব্যস, ঐ পর্যন্তই। ঐখানেই চিনু দাঁড়ি টেনে দিয়েছে। পরের পাতাগুলো সাদা পড়ে আছে। এ আবার কি দুর্ভোগ দেখ! প্যাঁচে ফেলে দিলে দেখছি।

চিনু আসতে তেড়ে উঠলাম—লিখতে লিখতে থেমে গেলি যে? তারপর কি হল লিখবি তো। সব না লিখলে আত্মকথা সম্পূর্ণ হবে কেমন করে। এ কি রহস্য গল্প যে পাঠকদের ঝুলিয়ে রেখে যেখানে খুশি দাঁড়ি টানবি।

আর যে কিছু বলবার নেই। মাইরি বলছি, আর কিছু লিখতে হলে বানিয়ে বানিয়ে লিখতে হবে। আত্মকথার সঙ্গে মিথ্যে কথার ভেজাল দোব না কি। কি যে বলিস—

বানিয়ে বানিয়ে লিখবি কেন। কিন্তু আসল কথাটা বলবি তো। মানে ঝিঁঝির কি হল শেষ পর্যন্ত সেটা তো বলবি। হতভাগী মেয়েটা যদি তোর মতো গাড়োলের পাল্লায় না পড়ত—

তাই বল। ঝিঁঝির কি হল জানাতে হবে। কেন? এটা কি ঝিঁঝির আত্মকথা? এ হল আমার আত্মকথা, যেখানে শেষ হওয়া উচিত শেষ হল। লেঠা চুকে গেল। ঝিঁঝিরও তাই হল, লেঠা চুকে গেল। পর পর তিনটে মেয়ে বিয়োল। মেয়েদের জামাই খোঁজবার জন্যে হন্যে হয়ে উঠল। তারপর ছুঁচিবাই হল। এখন আবার এক নতুন বাই চাগাড় দিয়েছে, সব সময় ভাবছে যে তার ধিনি-কার্তিক পতিদেবতাটিকে দেখে মাগীরা মুচ্ছো যাচ্ছে। জান কয়লা হয়ে গেল মাইরি। বল, এর পরও কি আত্মকথা লেখার কিছু থাকে?

মানলাম, থাকা অন্তত উচিত নয়।

৫

উচিত অনুচিতের কথা নয়। কথাটা হল, ঐ ভাবে অনবরত খেই হারিয়ে ফেলার দরুণ আমার উপন্যাসখানা মাঠে মারা যেতে বসেছে। সারা জীবনটা একখানা উপন্যাস, জীবনের প্রত্যেকটি দিন এই উপন্যাসের এক এক একখানি পাতা। এ পর্যন্ত যতগুলো পাতা পার করে ফেলেছি সব উলটে পালটে দেখছি। ঐ এক দোষ, প্রতিটি চরিত্র যাকে বলে গুবলেট তাই হয়েছে। একটাও পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। উঠতে দিই কবে। সবাই থেমে পড়ে। থামতে যারা জানে না তারা ফুরিয়ে যায়। থেমেই পড়ুক বা ফুরিয়েই যাক ফল ঐ এক, খেই হারিয়ে যায়।

সুনামগঞ্জের পীর সাহেব দিনে রাতে কম সে কম পঞ্চাশ বার চেঁচিয়ে উঠতেন- 'মলাম মলাম হারিয়ে গেলাম।' দিব্যি বসে আছেন বাদশাহী চালে, চিবোচ্ছেন পান জর্দা, দুই কশ বেয়ে লাল রস গড়িয়ে নামছে, জামা জোব্বা ভিজছে সেই রসে। আগরবাতি জ্বলছে সামনে, মাঝে মাঝে ভক্তরা [illegible] বোতল গোলাপ জল ছিটোচ্ছেন। বড় বড় বাসনে [illegible] সাজানো রয়েছে চার পাশে। মাঝখানে মখমলে মোড়া বিরাট তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে আছেন পীরসাহেব। চারিদিক নিস্তব্ধ, টুঁ শব্দ করছে না কেউ, স্রেফ দু' চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছে পীরসাহেবের মুখ পানে। হঠাৎ ঐ চিৎকার—মলাম মলাম, হারিয়ে গেলাম।

ভক্তরা সন্তুষ্ট। তখনই আবার গোলাপ জল ছিটোবার ব্যবস্থা হল। পীরসাহেব কৃপা করছেন।

ঐ কৃপাটি কি!

পীরসাহেবের বেগম সাহেবাকে আমি মা বলে ডাকতাম। খোবানি মিছরি পেস্তা বাদাম এলাচদানা পেট ভরে খাওয়াত বুড়ি আমাকে। ধরে বসলাম একদিন, ঐ 'মলাম মলাম, হারিয়ে গেলাম' কথাটার কি-মানে আমাকে বলতেই হবে। পীরসাহেবের মুখ থেকে ঐ কথাটা বেরোলেই ভক্তরা মনে করেন পীরসাহেবের কৃপা হল। এরই বা কি মানে? বুড়ি বললে, যখন ঐ চিৎকারটা করেন তখন পীরসাহেব ফিরে আসেন। ফিরে এসে কোনও কোনও ভক্তের-মনোস্কামনা পূর্ণ করেন। মনোস্কামনা পূর্ণ করতে গিয়ে দেখেন প্যাঁচে পড়ে গেছেন। কে যে কি চাইছে, কত জাতের কামনা বাসনা জট পাকিয়ে ফুঁসে উঠছে এক এক জনের মনে, কার সাধ্য বুঝতে পারে। সেই ভয়ঙ্কর দয়ে পড়ে গিয়ে চিৎকার করে ওঠেন পীর-সাহেব—মলাম মলাম, হারিয়ে গেলাম। ভক্তরা বুঝতে পারে, কিছুক্ষণ পীরসাহেব ফিরে এসেছিলেন, কিছু ভক্তের মনোস্কামনা পূর্ণ হবেই। 'মলাম মলাম, হারিয়ে গেলাম' বলেই আবার চলে গেলেন।

কোথা থেকে আসেন, যানই বা কোথায়?

ঐ প্রশ্নটি করলেই বুড়ি চটে যেত। অষ্টপ্রহর যিনি বসে আছেন চোখের সামনে—সমানে চিবিয়ে চলেছেন পান জর্দা, দিনে রাতে একটি বারের জন্যেও গদি ছেড়ে ওঠেন না, তার আবার যাওয়া আসা কি!

যাক গে, মহাপুরুষদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। আমরা সাধারণ জীব, আমাদের মনে কামনা আছেই। কামনা বাসনার দয়ে পড়ে হাবুডুবু খেয়ে মরছি আমরা, মহাপুরুষদের টেনে ঐ দয়ে নামাবার চেষ্টা না করাই উচিত। উচিত অনুচিতের কথা হচ্ছে না, কথাটা হল আমাদের মনে অমন সাংঘাতিক দ কেন?

কি জাতের মনওয়ালা চরিত্রদের নিয়ে আমার এই জীবন উপন্যাস ফেঁদে বসেছি? সব চরিত্রদের মনেই কামনা বাসনাগুলো

জট পাকিয়ে যাচ্ছে, সেই জট খুলতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলেই সুনামগঞ্জের পীর সাহেবের মতো চেঁচিয়ে উঠছি, মলাম মলাম, হারিয়ে গেলাম। আসল কথাটাই হচ্ছে ঐ, নিজেই আমি হারিয়ে গেছি। আমার এই জীবন উপন্যাসের চরিত্রদের মনের দয়ে মজে গেছি আমি, কে আমায় উদ্ধাব করবে!

আমার কাছেই আবার কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে—বলতে পারো উদ্ধার পাব কিসে?

বটুকনাথের বোন অনিমা সরু কালো পাড়ের ধুতি পরে। মাথায় তেল দেয় না, সারা অঙ্গে কোথাও গহনার বালাই নেই। দেখলেই মনে হবে হতভাগীব কপাল পুড়েছে। সেদিন এসে বলে ফেলল—কি করলে উদ্ধার পাব বলতে পারেন?

মারাত্মক ভুল কবে ফেলেছিলাম আর একটু হলে। বিধবাদের সুপবিত্র জীবন নিয়ে কয়েকটি মূল্যবান কথা ঠোঁটেব ডগায় এসে পড়েছিল। সামলে গেলাম, টপ করে মনে পড়ে গেল, অনিমাব এখনও বিয়েই হয়নি। বিয়ে দেবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিল বটুকনাথ, দেখতেও নাকি এসেছিল পাত্রপক্ষরা। অনিমার মুখের দিকে তাকিয়ে সবাই পিছিয়ে গেছে। কারণটা কি! দেখতে শুনতে তো অনিমা মন্দ নয়।

তা নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকালেই মনে হয় এই সংসারটা যেন স্রেফ ছারখার হবার জন্যেই তৈরি হয়ে আছে। নিরবচ্ছিন্ন হাহাকার ছাড়া এ সংসারে আর কিছুই নেই। সংসারে কখনও ভোরের আলো ফুটে ওঠে না, পাখিরা গান গায় না, ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে বাতাস ছুটে বেড়ায় না। এ সংসারে একটানা কাঠফাটা রোদ, ছায়া নেই আশ্রয় নেই, তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলেও কোথাও এক বিন্দু জল নেই। শুধুই দুপুর দিয়ে সংসারটা গড়ে উঠেছে। দুপুরের পর বিকেল বিকেলের পর সন্ধ্যা সন্ধ্যার পরে

রহস্যময় অন্ধকার রাত্রি, যে রাত্রি স্বপ্ন দিয়ে গড়া, এই সব উলটো পালটা ব্যাপার এ সংসারে একদম ঘটে না। ছিটেফোঁটা আশা করবার স্বপ্ন দেখবার ভুলে থাকবার কিছুই নেই সংসারে, আছে শুধু এক দুর্জয় অভিমান। সেই অভিমানটি হল নিজের ওপর, সেই অভিমানের ভাষাটি হচ্ছে, কেন মরতে এই নচ্ছার সংসারে জ্বলে পুড়ে মরতে এসেছি। ঐ নিদারুণ প্রশ্নটির জলজ্যান্ত রূপ বটুকনাথের বোন অনিমা। কার এমন দুর্জয় বুকের পাটা যে ওকে বিয়ে করতে যাবে!

বটুকনাথকে যতদিন চিনি ওর বোনকেও ততদিন চিনি। বটুকনাথের সঙ্গে যখন পরিচয় হয় অনিমা তখন ফ্রক পরে স্কুলে যেত। ফ্রক ছেড়ে শাড়া ধরলে, স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকল, সবক'টা পরীক্ষায় পাশ করে অধ্যাপিকা হয়ে জব্বলপুরে না কোথায় চাকরি করতে গেল। ঐ পর্যন্তই জানতাম। মাঝে মাঝে বটুকনাথ এসে আক্ষেপ করত বোনটার বিয়ে দিতে পারল না বলে। আজকাল বহু মেয়ে বিয়ে না করেও দিব্যি চাকরি-বাকরি করে খাচ্ছে। বিয়ে হলেই একজনের সম্পত্তি হয়ে যাবে এই ভয়ে বহু মেয়ে বিয়ে করে না। বিয়ে না করে যদি কেউ শান্তিতে জীবন কাটাতে পারে—

শান্তির কথাটা মোটে শুনতে পারে না বটুকনাথ। বলে—শান্তির কথা মুখেও এন না। শান্তি কি জিনিস তা ও জানেই না। সামনেই ওর কলেজ বন্ধ হচ্ছে, বাড়ি এলে পাঠাব তোমার কাছে। দেখলেই বুঝবে কি রকম হয়ে গেছে অনিমা। ওর দিকে তাকালে বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। ভালো ভালো ঘর থেকে সম্বন্ধ করতে এল। একটিবার দেখেই পিছিয়ে গেল। কি যে হয়েছে ওর!

কি হয়েছে অনিমার আমিও জানতে চাই। ছোটবেলায় কেমন ফুটফুটে দুরন্ত ছিল, ছুটত লাফাত সাইকেল চেপে স্কুলে যেত, ইউনিভার্সিটিতে বোমা ছোড়ার জন্যে একবার ওকে জেলেও যেতে হয়েছিল। কি এমন এক ব্যাধি হল তার যে মুখ দেখলেই সকলের পিলে চমকে ওঠে।

পিলে চমকে ওঠে না বুক শুকিয়ে যায়। সত্যিই আমার বুক শুকিয়ে গেল অনিমাকে দেখে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে চুপচাপ খানিকক্ষণ বসে রইল সামনে। হঠাৎ ঐ প্রশ্নটি করে বসল—কি করে উদ্ধার পাব বলতে পারেন?

ভাগ্যে মনে পড়ে গেল যে ও বিধবা নয়। যা বলতে যাচ্ছিলাম গিলে ফেলতে হল। বলতে হবেই একটা কিছু। বলে ফেললাম যা মুখে এল—কিসের থেকে উদ্ধার?

বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকবার পর জবাব দিলে—তাও তো জানি না।

খাঁটি উত্তর, নির্ভেজাল যাকে বলে। সত্যিই আমরা কেউ জানি না কিসের থেকে উদ্ধার পেতে চাই। অথচ উদ্ধার পেতেই হবে।

সেই কথাটাই ওকে বললাম—ঐ দশা আমারও, ঠিক তোমার দশা। উদ্ধার পাবার জন্য হেদিয়ে বসে আছি। অথচ জানি না কি থেকে উদ্ধার পাব। জ্ঞানী গুণী যারা তারা দামী দামী কথা বলেন, মায়া থেকে উদ্ধার মোহ থেকে উদ্ধার জন্ম মৃত্যুর এই জাঁতা কল থেকে উদ্ধার—। ঐ সমস্ত প্যাঁচে পড়ে গিয়ে অনেকে সাধন ভজন জুড়ে দেয়। আমি বাপু ও সব বড় ব্যাপার বুঝি না অথচ উদ্ধার পেতে চাই। কি থেকে উদ্ধার পেতে হবে এইটুকু যদি কেউ বলে দিত।

অনিমা মাথা ঘামাতে লাগল। বেশ কিছক্ষণ মাথা ঘামিয়ে বলল—আপনার মতো কিছু একটা নিয়ে যদি ভুলে থাকতে পারতাম আমি, তাহলে বাচতাম। কোনও অবলম্বন নেই, একটা কিছু আঁকড়ে ধরে বাচতে হবে তো।

কি নিয়ে ভুলে আছি! খুব আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলাম।

লেখা নিয়ে। মুখের ওপর থেকে রুক্ষ চুলগুলোকে এক হাতে ঠেলে দিয়ে অনিমা বললে—লেখা নিয়ে, মানে জীবন নিয়ে। আপনি হলেন জীবনশিল্পী, মনের মতো করে জীবন গড়ছেন, মর্জি মতো

সেই জীবনকে সাজাচ্ছেন, আপনার গড়া জীবন হাসছে কাঁদছে কথা বলছে। আপনার নিজের সৃষ্টি নিয়ে আপনি মেতে আছেন। আর কি চাই? আপনি যাদের গড়েন তাদের সুখ তাদের হতাশা তাদের আশা-আকাঙ্খা বাসনা-বঞ্চনা আপনাকে টলাতে পারে না। বুকফাটা কান্নাকে ঠিক বুকফাটা কান্নার রূপ দিতে পারলেন কি না তাই নিয়ে আপনি মাথা ঘামান। যে জীবন হতাশায় আর হাহাকারে শুকিয়ে গেল, সেই জীবনের হতাশা হাহাকারকে সার্থক রূপ দিতে পারলেই আপনি পরম সন্তুষ্ট। শয়তানকে আপনি গড়েন বুকের সবটুকু দরদ ঢেলে, আপনার মানস-সন্তান শয়তানের শয়তানিতে যেন খুঁত না থাকে, সে জন্যে আপনি প্রাণপণে চেষ্টা করেন। শিব গড়তে বাঁদর না হয় এই হল আপনার একমাত্র চিন্তা। ভুলে থাকবার জন্যেই আপনি জন্মেছেন। আপনার পেশাই আপনার সবচেয়ে বড় অবলম্বন। ঠিক বিধাতা পুরুষের মতো। বিধাতা পুরুষ যাদের গড়েন তাদের সুখ-দুঃখ কান্না-হাসির ডালা নিখুঁত ভাবে সাজিয়ে দেন।

বোবা হয়ে গেলাম। সময়ে সময়ে দু'চারটে গল্প লিখি। পত্রিকাওয়ালারা দয়া করে যা দেন তাতে বিড়ির পয়সাটা ওঠে। জানতাম না যে গল্প লিখি বলে আমি একদম বিধাতা পুরুষ বনে গেছি। বেকায়দায় পড়ে গিয়ে বলে ফেললাম—যদি উদ্ধার পেতাম এই লেখার দায় থেকে। কিছু একটা যদি মিলত যা নিয়ে ভুলে থাকতে পারতাম, তাহলে এই জীবন গড়ার ফ্যাসাদ থেকে নিষ্কৃতি পেতাম।

পারবেন না। নির্জলা নির্লিপ্ততা বজায় রেখে অনিমা বলল—কিছুতেই পারবেন না। আমিও চেষ্টা করেছিলাম, কিছুতেই জড়াব না নিজেকে, জীবন গড়ে তুলব। আপনার মতো কাগজ কলম দিয়ে নয়, রক্তে মাংসে গড়া জীবন নিয়ে আমি সাধনা শুরু করেছিলাম। কি লাভ হল? নিজে জড়িয়ে পড়লাম। আপনারও

তাই হয়েছে, আপনার গড়া জীবনগুলোর ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়িয়ে ফেলেছেন। অনবরত ভাবছেন যা গড়তে চেয়েছিলেন তা গড়া হয়নি। যা বলতে চেয়েছিলেন তা বলতে পারেননি। সত্যিকারের ব্যাপারটা হচ্ছে, আপনি যা গড়তে চেষ্টা করেন তার মারফত আপনি নিজেকে প্রকাশ করতে চান। চিরে চিরে বিচাব বিশ্লেষণ করেন নিজেকে, বিচার বিশ্লেষণ করে যা পান সেই মাল-মশলা দিয়ে গড়ে তোলেন আপনার চরিত্রদের। গড়বার পর দেখেন অনেক অনেক ফাঁক পড়ে গেছে। ফাঁক আর ফাঁকি থেকে জন্মায় হতাশা। যতদিন পর্যন্ত নিজেকে চিরে চিরে বিশ্লেষণ কবার চেষ্টা করবেন ততদিন আপনি আপনাব মানস-সন্তানদেব গড়তে চেষ্টা করবেনই। নিজের সম্বন্ধে যে অন্ধ সেই হতভাগ্যই জীবন জিজ্ঞাসাব হাত থেকে রেহাই পেতে পাবে।

মাথা-ফাতা গুলিয়ে উঠল। কি বিপদে পড়লাম রে বাবা।

বটুকনাথের বোন অনিমা, এই সেদিন ফ্রক পবে স্কুলে যেতু। কলেজে ঢুকে পার্টি কবত, বোমা ছুঁড়েছিল বলে জেলও খেটেছে। ঝপাঝপ্ কতকগুলো পরীক্ষা দিয়ে এমনই বোলচাল ঝাড়ছে যে চোখে অন্ধকাব দেখছি। বিপদ আর কাকে বলে!

থতমত খেয়ে বলে বসলাম—কতটুকুই বা দেখেছি কতটুকুই বা বুঝেছি। জীবন বিচিত্র। মানুষ আজ অন্য গ্রহে জীব আছে কি নেই তাই জানবার জন্যে মরীয়া হয়ে লেগে গেছে। কিন্তু এই গ্রহটায় যে জীবগুলো মানুষ হয়ে জন্মেছে বলে জ্বলে পুড়ে মরছে তাদের সম্বন্ধে কতটুকু আমরা জানি। মানুষকেই মানুষ আবিষ্কার করতে পারল না আজও, মঙ্গল গ্রহে যারা আছে তাদের আবিষ্কার করতে চলেছে। তাছাড়া কাজটাও খুব সহজ নয়। মানুষ মানুষের কাছে সব কিছুই লুকিয়ে রাখতে চায়। বাইরে থেকে দেখে কতটুকুই বা বোঝা যাবে।

অনিমা একটু যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার পাথুরে চোখ

ছটো চকচক করে উঠল। একটু নড়ে চড়ে বসে জিজ্ঞাসা করল—উলঙ্গ জীবন আপনি দেখতে চান? সাহস আছে আপনার?

চট করে জবাব জোগালো না মুখে। গুম মেরে বসে রইলাম।

. .

লোকটা বোধহয় সাত ফুট লম্বা, আমার চেয়ে এক হাতের বেশী উঁচু। মুখখানা যে কেমন ছিল বোঝবার উপায় নেই। নাক মুখ চোখ কান সমস্ত দলা পাকিয়ে গেছে। তবে শখ আছে বটে। চুনট্ কবা আদ্দির পাঞ্জাবি আর জরি পেড়ে ধুতি পরেছে। যে ক'টি চুল আছে মাথায় তা দিয়ে যতটা সম্ভব বাহার তুলেছে চাঁদিতে, পেছনটা চেঁচে ছুলে সাফ করে ফেলেছে। দু'হাতে গোটা পাঁচেক আংটি, আংটিগুলোয় বড় বড় পাথর বসানো। যে সব পাথর বসানো আংটি পরলে গ্রহ নক্ষত্রদের শায়েস্তা করা যায় সেই সব পাথর ধারণ কবেছে। তাব মানে হীবে মাণিক কেনবার সামর্থ্য রাখে। ঝুয়ে পড়ে মাথা বাঁচিয়ে ঘরে ঢুকল। পরিচয় করিয়ে দিল অনিমা—ইনিই রজতদ্যুতি সামন্ত। এব কথাই বলেছিলাম আপনাকে। অনেক কষ্টে রাজী কবিয়েছি। কাজেব মানুষ, সময় নেই। আপনার নাম শুনে এলেন।

রজতদ্যুতি তাঁব সেই বীভৎস মুখখানাকে যতটা সম্ভব হাস্য-সঙ্কুল কববার চেষ্টা কবে বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার নাম শুনে এলাম। অনিমার সঙ্গে পড়তাম ইউনিভার্সিটিতে—আমাদের একই সাবজেক্ট ছিল। ও পাশ করে প্রফেসারী নিলে। আমি সেই যে তিমিরে সেই তিমিরে। ছুটকো ছাটকা কনট্রাক্টরী করি, কোনও রকমে দিন চলে যায়।

বেশীর ভাগ রোজগারটা কি থেকে হয় সেটাও বল একে। সব না বললে তোমার রোগটা ইনি ধরবেন কেমন করে? তান্ত্রিক ক্রিয়া যদি কিছু করাতে চাও তাহলে খুলে বলা উচিত। বলে অনিমা একখানা কবিতার বই তুলে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল।

একটু আধটু অন্য কাজ কারবারও আছে আমার। তবে সেটা —বলতে বলতে রজতদ্যুতি আটকে গেলেন।

কথা বলতে বাধ্য হলাম আমি—যদি আপত্তি থাকে তাহলে বলবেন না।

না না, আপত্তি-টাপত্তি নয়। মানে ব্যাপারটা খুবই ডেলিকেট কি না, মানে আমি একটু আধটু রাজনীতি করি। বলে রজতদ্যুতি পকেট থেকে সিগারেটের কেস বার করলেন।

রাজনীতি করেন! রাজনীতি করাটা ডেলিকেট ব্যাপার!

একদম বোকা বনে গেলাম। অনিমা আমায় উদ্ধার করলে। কবিতার বইতে চোখ রেখেই বললে—প্রত্যক্ষ রাজনীতি নয়, পরোক্ষ রাজনীতি করে রজত। বড় বড় নেতারা টাকা ঢেলে কাজ নেয়।

তার মানে আজকাল কনট্রাক্টর দিয়ে দেশের কাজ করাতে হচ্ছে! চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল আমার। রজতদ্যুতি বাবু তাঁর সিগারেট কেসে চাপ দিলেন। খট্ করে একটু আওয়াজ হল। খোলা কেসটা আমার সামনে বাড়িয়ে ধরে বললেন—নিন একটা। ঘাড় নাড়লাম। উনি একটা ধরালেন, গল গল করে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—দেশের কাজ সমস্তই তো ঠিকাদার দিয়ে করানো হচ্ছে। যেমন ধরুন রাস্তা বানানো পুল বানানো হাসপাতাল স্কুল বানানো জলের কল বসানো। আমাদের মিলিটারিরা যা খায় তাও ঠিকাদারেরা জোগায়। ঠিকাদার ছাড়া দেশের কোন্ কাজটা হচ্ছে। আমার কাজটা একটু অন্য রকমের। আমাকে প্রাইভেট্ ডিটেক্টিভও বলতে পারেন। বড় বড় নেতারা দু'পাঁচটা প্রাইভেট্ কাজ দেন। যেমন ধরুন, একজনকে একটু টাইট্ দিতে হবে কিংবা কোনও নেতার একটা বদখত ছবি আছে যা প্রকাশ হয়ে পড়লে মারাত্মক ব্যাপার হতে পারে, সেই ছবিটা সম্বন্ধে সবকিছু জেনে নিয়ে তাঁকে ব্ল্যাক্মেল্ করতে হবে, এই সমস্ত আর কি। রাজনীতি বড় নোংরা ব্যাপার স্যার। এ সমস্ত ব্যাপার যত না জানা যায় ততই ভালো।

অনিন্দ্য সেইরকম বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে নির্লিপ্তভাবে বলল—যাক গে ও সব কথা। এখন বল তোমার ট্রাবল। ঢেকে-ঢুকে বলবার দরকার নেই, সবকিছু খোলাখুলি বল। আমার দাদার বন্ধু ইনি। মস্ত বড় তান্ত্রিক সাধু। ওঁর কাছে আমরা কিছুই লুকোই না।

বলা শুরু হল। ব্যাপারটা এমনই সাংঘাতিক রকম ডেলিকেট যে বলবার আগে ছোট্ট একটি রূপোর ফ্লাস্ক বার করে দু'তিন ঢোক ওষুধ গিলে নিলেন রজতদ্যুতি। নিয়ে ফ্লাস্কটিকে যথাস্থানে রেখে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে শুরু করলেন—যাঁর বিষয়ে আমি বলব তিনি এখন মস্ত বড় নেতা।

হঠাৎ সেই নেতাটি হন্যে হয়ে উঠলেন। হাতে ক্ষমতা ছিল, লাঠি গুলি টিয়ার গ্যাস দিয়ে ঠাণ্ডা বানাতে লেগে গেলেন দেশসুদ্ধ মানুষকে। ডাক লে . ল অন্যসব নেতাদের। কস্মিনকালে অমন হি স্র তো উনি ছিলেন না। এই বয়সে খেপে গেল না কি লোকটা!

ডাক পড়ল আমার। আমি এনগেজড হলাম। একটু আধটু নাড়াচাড়া করতেই বেরিয়ে পড়ল ভেতরের সংবাদ। নেতা লোকটা কিছুই করছেন না। যা করবার করছে আরেকজন আড়াল থেকে। তারই হুকুমে সেই মানুষরূপ নেতা দেশের মানুষের রক্তে দেশের রাজপথ ভিজিয়ে ছাড়ছেন।

রজতদ্যুতি আর একবার সেই রূপোর ফ্লাস্ক বার করে যেটুকু বাকী ছিল গলায় ঢালতে ঢালতে গড়গড় করে বলে গেলেন তাঁর কাহিনী। কাহিনী নয় রাজনৈতিক কেচ্ছা।

শুরু করলেন রজতদ্যুতি—এটা হোল সাব ভোল পাল্টাবার যুগ। এখন সবাই বহুরূপী। কোনটি যে কার আসল চেহারা বোঝবার জো নেই। যেন তেন প্রকারেণ গদিতে চড়তে পারলেই হোল। গদিতে চড়বার জন্যে জন্মদাতা বাপের নামটাও পালটাতে পারে

মানুষ। আজ যিনি পরমহংস, মাছি মারতে দেখলেও কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছেন, কাল তিনি রক্তরাঙা ঝাণ্ডা ঘাড়ে নিয়ে মুখ দিয়ে আগুন ওগরাতে লাগলেন। বাহাত্তুরে, ভীমরতি ধরেছে, জিব লকলক করছে, তবু দেশের কাজ করতেই হবে, শ্মশানে পৌছনো পর্যন্ত দেশের কাজ করা চাই। দেশের কাজ করতে না পেলে যে মজা লোটা সম্ভব নয়। গদিতে চড়ে বসতে পাবলে হরদম প্লেনে চেপে ঘোরা যায়, বড় বড় জায়গায় নেমন্তন্ন পাওয়া যায়, পূজা পাওয়ার কথাটা ছেড়েই দিচ্ছি। দেশটাকে যাঁরা খেটেখুটে স্বাধীন করেছেন পূজা তো তাঁরা পাবেনই। বছর বছর জন্মতিথি হবে, দেশসুদ্ধ চোর, জোচ্চর ঘুষ দেনেওয়ালা আর ঘুষ লেনেওয়ালারা ফুল মালা সন্দেশের সঙ্গে দুনিয়ার যত ভাল মন্দ জিনিস পূজা দেবে, খবরের কাগজে দেশ উদ্ধারকারীর ছবি ছাপা হবে। সেই সঙ্গে বেরুবে তাঁর কীর্তি-কাহিনী। দেশের জন্যে কি পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন তিনি, জানবে দেশেব লোক। ত্যাগী ব্রহ্মচাবী, দেশের কাজ করার গরজে বিয়ে থা করে সংসারী পর্যন্ত হোতে পারলেন না, ওহো হো, ত্যাগের কি মহিমা! এই মহিমার আড়ালে—

বাধা দিলাম। ও সমস্ত জানা কথা। দেশসুদ্ধ মানুষ নেতাদের ভাল করে চেনে। ঐ নোংরা কারবার, এ দেশে যার নাম রাজনীতি করা, ও আর আমি শুনতে চাই না। ওঁর মুশকিলটা হচ্ছে কোথায় সেইটুকু বললেই হবে।

রজতবাবু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন—এ ব্যাপারটা খুবই ডেলিকেট। মানে এ ব্যাপারটার সঙ্গে আবার অনিমা জড়িয়ে আছে। অনিমা চাচ্ছে এই সব কাজকর্ম ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে আমি ওর সঙ্গে চলে যাই। রিস্কটা ও বুঝতে চাইছে না। যতদিন ফীল্ডে আছি ভয় নেই। হয় এ নেতা নয় তো আর কোন নেতা, কেউ না কেউ পেছনে আছেন। ফীল্ড ছেড়ে দিলে সবাই দুশমন হয়ে দাঁড়াবে।

এখানে ঢোকবার রাস্তা আছে বেরুবার পথ নেই ; আমার মতো অনেকেই কাজ করছে এই ফাঁন্দে। তাদের কাউকে লাগালে—

বাকীটা আর মুখে বললেন না। ডান হাত মুঠো করে ছোরা চালাবার কায়দাটা দেখালেন।

তাছাড়া তিনি তো রয়েছেন। নেতার পেছনে তাঁর সেই সাধের ছায়াটি। বাগে পেলে তিনি রজতকে রেহাই দেবেন না। যত নষ্টের গোড়ায় কলকাঠি কে নেড়েছে তা সে ভালো করেই জানে কি না। তাই, এবার আমি ঠিক করে এসেছি, হয় রজত যাবে আমার সঙ্গে নয়তো আমিও ওর সঙ্গে ওর ফাঁন্দে নেমে পড়ব। একদিন একসঙ্গে ছু'জনে বোমা ছুঁড়েছি, এক সঙ্গে ছু'জনে বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছি, আশুতোষ বিল্ডিং-এ যেদিন ওর মুখের ওপব টিয়ার গ্যাসেব শেল্‌টা ফাটল—

এক নিঃশ্বাসে বলতে লাগল অনিমা। আমি দেখলাম পালটে গেছে। আমি দেখলাম সেই ছুষ্টু মেয়েটাকে, বটুকনাথের সেই বোনটি, যে সাইকেল চেপে স্কুলে যেত, সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে ঝাঁপিট করত, স্কুলের স্পোর্টসে পাঁই পাঁই করে দৌড়ত, লাফ দিয়ে এতটা জায়গা পাব হত যে কোনও ছেলে ওর সঙ্গে পেরে উঠত না। কোথায় গেল জলজ্যান্ত হাহাকারেব প্রতিমূর্তি অধ্যাপিকা অনিমা মুস্তাফী ! উলঙ্গ জীবন দেখবার সাহস আছে কি না জানতে চেয়েছিল অনিমা। এই কি উলঙ্গ জীবন ! এ আমি কি দেখছি ! হাড়হাভাতে চোয়াড় নচ্ছার গুণ্ডা রজতছ্যুতি, যার মুখখানার দিকে তাকালে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়, সেই রজতছ্যুতি রজতশুভ্র আলো জ্বালাল বটুকনাথের অনেক পাশ করা বোনটির চোখে মুখে সর্বাঙ্গে। সত্যিই ওর রজতছ্যুতি নামটা সার্থক।

ফ্লাস্ক বার করে ঝাঁকি দিয়ে দেখলেন রজতছ্যুতি। অভ্যাসের দোষ আর কি। তারপর আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন—একটা কবচ-টবচ বা স্টোন্‌ যাতে শত্রুরা কিছু করতে না পারে

ব্যবস্থা করে দিন। আমারও আর ভালো লাগে না নবকে পচে মরতে। তাছাড়া অনিমা পড়ে রইল কোথায় গিয়ে। ভয়ঙ্কর জেদী তো, আমার রোজগার এক পয়সা ছোবে না। ঠিক আছে, ও যখন চাকরি ছাড়তে রাজী আমিও কাজ কারবার গুটিয়ে ফেলছি। পাসপোর্ট বাগাতে হবে, চলে যাব দু'জনে দেশ ছেড়ে, কি করে পেট চলবে ভগবানই জানেন। কিন্তু আপনি একটু দেখুন যদি কোনও কবচ বা স্টোন্ ধারণ করলে শত্রু দমন হয়—

অনিমা বলল—শত্রুদের নাম দিলে যদি আপনার কাজের সুবিধে হয়, শুনেছি শত্রুদের দমন করতে হলে শত্রুর নামও লাগে।

রজতবাবু বললেন—এখন সবচেয়ে সাংঘাতিক শত্রু মানুষের নেতার সেই ছায়াটি। কলেজে যখন পড়ত তখন অনেক বড়লোকের ছেলের মাথা খেয়েছে। সাংঘাতিক চালু মাল ছিল, লেগে গিয়েছিল আমার পেছনে। অনিমার জন্যে সুবিধে করতে পারেনি। সেই থেকে অনিমার ওপর ওর রাগ। অনিমা আবার একদিন ওকে আচ্ছা করে চটি দিয়ে পিটিয়েছিল কি না।

রাজী হয়ে গেলাম। নিশ্চয়ই করে দোব কবচ। এমন কবচ বানিয়ে দোব যে শত্রুর ঝাড় ধ্বংস হবে। দু'জনকে দুটি কবচ করে দোব। তবে একটা কথা, কবচ ধারণের নিয়ম তো পালন করা চাই। এ কবচ স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে ধারণ করতে পারে। তন্ত্রমতে স্ত্রী হল স্বামীর শক্তি। সশক্তি এই কবচ ধারণ করতে হয়।

উঠে দাঁড়ালেন রজতদ্যুতি। দরাজ গলায় বললেন—আজই আমরা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে যাচ্ছি। শুনেছি পনেরো দিন না এক মাস আগে দরখাস্ত দিতে হয়। কিন্তু প্রথমেই বটুকনাথবাবুর কাছে যেতে হবে আমাকে। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে যাব। আমাদের বিয়েতে আপনিও কিন্তু একজন সাক্ষী হবেন।

যাবার সময় আমার পায়ে হাত দিয়ে দু'জনে প্রণাম করল।

আশীর্বাদ নয়, চোখ বুজে মন প্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করলাম বিশ্বমানবের হৃদয় দেবতার কাছে, ওদের এই মিলন যেন সার্থক হয়।

আমার জীবন উপন্যাসের এই পাতাগুলোকে যদি আমি ছিঁড়ে ফেলতে পারতাম।

যদি ভুলতে পারতাম বটুকনাথের বোন অনিমাকে আর বজ্রতত্ত্ব্যতিকে।

অনিমা আমায় বলেছিল—পারবেন না, কিছুতেই পারবেন না। আপনার গড়া জীবন গুলোর সঙ্গে আপনি নিজের ভাগ্য জড়িয়ে ফেলেছেন। অনবরত ভাঙছেন যা গড়তে চেয়েছিলেন তা গড়া হয়নি, যা বলতে চেয়েছিলেন তা বলতে পারেননি।

মানছি, অকপটে মানছি, অনিমা আমাকে খাঁটি কথাই শুনিয়ে গিয়েছিল।

জীবন গড়ার কারিগর আমি। নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে জীবনকে রূপ দিতে চাই। হায়, জীবনের উলঙ্গ রূপটিকে আজও দেখতে পেলাম না।

পাব কেমন করে।

নেপথ্যে আমার চেয়ে অনেক বড় এক কারিগর বসে কলকাঠি নাড়ছেন। জীবন তাঁর মর্জিমত গড়ছে ভাঙছে, মহাকালের জ্বলন্ত ক্ষুধাগ্নিতে পুড়ে ভস্ম হচ্ছে সব। অদেখা আখরে যা লেখা আছে মহাকালের জীবন-উপন্যাসে তা আমি দেখতে পাই না।

আমি জীবনজিজ্ঞাসার দায় থেকে মুক্তি পেতে চাই, আমি অন্ধ হয়ে থাকতে চাই। অন্ধ হয়েই তো আছি। দেখতে তো পাচ্ছি না আগামী কালকে। আজ যেটা আমার কাছে জীবনজিজ্ঞাসা, কাল সেটা ফুরিয়ে যেতে পারে। জীবনজিজ্ঞাসার চরম সমাধান ঐ ফুরিয়ে যাওয়া। ফুরিয়ে যাবার পর জীবন নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হয় না।

কবচ আমাকে বানিয়ে দিতে হয়নি। তিন দিন পরে সংবাদ পত্রে উঠল—প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক কর্মী শ্রীরজতদ্যুতি সামন্তর মৃতদেহ ব্যাণ্ডেল চার্চের সামনে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ওঁকে খুন করা হয়েছে। দুর্বৃত্তরা দেহ থেকে ওঁর হাত দুটি বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। মৃতদেহের সঙ্গে হাত দু'খানি পাওয়া যায়নি।

বটুকনাথ আর আমার কাছে আসে না। বোনকে রাঁচীর হাসপাতালে ভরতি করে দিয়েছে।

আর আমি আজও বসে বসে আমার জীবন উপন্যাসের খেই খুঁজে মরছি।

৬

অযোধ্যায় এক মন্দিরের দরজায় বসে এক অন্ধ একঘেয়ে সুরে ডুগডুগি বাজিয়ে গান গাইত—

ক্যা কহুঁ রঘুবরজী—মায় নে কি কিয়া চোরি—
ওহি বন্‌শমে জনম লিয়া হায় বেদিয়া খিঁচে ডোরি।

মহারাজ সুগ্রীবের এক বংশধর রঘুবরজীর কাছে আবেদন করছে—কি আর বলব তোমায় রঘুবরজী, আমি কি চুরি করেছি! সেই বংশে জন্মেছি যে বংশ তোমার সীতা উদ্ধারের জন্যে সাগর বন্ধন কবেছিল, কিন্তু আজ বেদিয়া আমার কোমরে দড়ি বেঁধে নাচাচ্ছে।

আমারও হয়েছে ঐ দশা। একদা বিশ্বমানবের হিতার্থে যাঁরা লিখতেন সেই সব পুণ্যশ্লোক ঋষিদের কাজই আমি করছি। বই লিখছি। লিখছি কিন্তু পেটের দায়ে, পাঠকদের মনোরঞ্জন কামনায়, বই বিক্রির গরজে। বাল্মীকি ব্যাস কালিদাস একদা যা করেছিলেন—

যাক গে ওঁদের কথা। ওঁদের কালে ছাপাখানা ছিল না, প্রকাশক ছিল না, পত্র-পত্রিকা ছিল না। বই লিখে এক লাখ বিক্রি করার কথা ওঁরা ভাবতেও পারতেন না।

মস্ত বড় এক ইট-চুন-বালি-সুরকির আড়তের সামনে আমি বাস করি। চোখের সামনে দেখছি পাঁজা পাঁজা ইট লরিতে আর গরুর গাড়িতে বোঝাই হয়ে আড়ত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, ইটওয়ালা শ্রীমান বটকৃষ্ণ ভাণ্ডারীর মুখ পানে তাকিয়ে ভাবি, আহা! আমি যদি ওর মত পরম পরিতৃপ্তির হাসি হাসতে পারতাম! কিন্তু বই তো পাঁজা পাঁজা বিক্রি হয় না।

হয়ও। থান ইট প্রমাণ বই লিখেছেন, সেই বই ঝাঁকা বোঝাই হয়ে এসে নামছে প্রকাশকের দোকানে, সঙ্গে সঙ্গে সাবাড় হয়ে যাচ্ছে, এমন সৌভাগ্যবান লেখককেও দেখেছি। কিন্তু তাঁর চোখে মুখে সর্বাঙ্গে বিষাদের ছাপ, শ্রীমান ভাণ্ডারীর মত খুশির আলোয় ঝলমল করছেন না তিনি, উলটো ব্যাপারটাই যেন ঘটেছে। দাঁছড়ে বই বিক্রি হচ্ছে দেখে যেন তিনি মরমে মরে যাচ্ছেন।

কেন!

ইটওয়ালার সঙ্গে বইওয়ালার তফাৎটা কোথায় তা বোধহয় আমি ধরতে পেরেছি। বইওয়ালা বলতে আমি বইয়ের লেখককেই বুঝি। ব্যাপারটা কিন্তু বাস্তবিকই তাই, যিনি বই লেখেন তিনিই বিক্রি করেন। প্রকাশক লেখকের তরফ থেকে ঢাক পেটান, সে জন্যে লাভের সিংহ ভাগ গ্রহণ করেন। মানে নিজের ঢাক নিজে পেটাতে লেখকের লজ্জা করে। কিসের জন্যে ঐ লজ্জা! ইটওয়ালা তো বুক বাজিয়ে বলতে পারছে যে আমার তুল্য ইট পোড়াতে কেউ পারে না। ঐ কথাটা লেখক বলতে পারেন না কেন? পারেন না যেহেতু লেখক তাঁর নিজের সৃষ্টি নিয়ে কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না। প্রতিটি লেখা শেষ করে লেখক দেখেন হল না, যা গড়তে চেয়েছিলেন তা গড়ে ওঠেনি। আগুনের খামখেয়ালে তিন ভাগের এক ভাগ কাঁচা থেকে গেছে।

কবি গাইতে পারেন— 'যাবার বেলায় শেষ কথাটি যাই বলে।' লেখক ওটা আওড়াতে পারেন না। শেষ কথার পরেও অনেক অশেষ কথা থেকে যায়। রাম না জন্মাতেই রামায়ণ লিখে শেষ করেছিলেন মহাকবি বাল্মীকি। ভাগ্যবান রামচন্দ্রকে ভাগ্যের অঙ্গুলি সংকেতে অন্ধের মত জীবন যাপন করতে হয়নি। জীবন-চরিত লেখক বাল্মীকির মর্জি মাফিক পর পর সব কাজগুলো শেষ করে ফেলে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। আজকের লেখক ঐ সুবিধেটা পান না। আজকের রামচন্দ্ররা ঐ সুগ্রীবের বংশধরদের মত জীবন

যাপন করছেন। অন্তরীক্ষে বসে বেদিয়া আজকের রামচন্দ্রদের কোমরে দড়ি খিঁচে নাচাচ্ছে। নাচাতে নাচাতে মারলে এক হেঁচকা টান, মুখ থুবড়ে পড়লেন রামচন্দ্র, সেই সঙ্গে আজকের দিনের লেখকের কাজটাও অসমাপ্ত থেকে গেল। বিড়ম্বনা আর কাকে বলে!

এই বিড়ম্বনার কথাটাই সেদিন শোনাতে এল উমা। বললে—'কি যে ছাইপাঁশ লিখছ। একটা লেখাও যদি ভাল ভাবে শেষ করতে পারতে। এ পর্যন্ত যা কিছু লিখেছ সবই ফাঁকি। ফাঁকি যে দিচ্ছ এটা বোঝার ক্ষমতাও বোধহয় তোমার নেই।

মুখ টিপে রইলাম। আমার বই ও কিনে পড়ে না, বই বেরুলেই ওকে একখানা দিতে হয়। না দিলে বাড়ি বয়ে এসে দশ কথা শুনিয়ে যায়। বই যখন ও কিনে পড়ে না তখন ওর মতামত নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি। খদ্দের তো নয় যে ওর মন যুগিয়ে চলতে হবে।

'কি? কিছু বলছ না যে বড়। বই লেখ বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করছ বুঝি?' বলে আঁচলের একটা খুঁট কোমরে গুজে নিলে। অর্থাৎ ঝগড়া করবেই, মুখ টিপে থাকলেও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অগত্যা কিছু বলতে হল। বললাম—'ভাবছি কোনটে ভাল করে শেষ করতে পারিনি। সব গল্পই বেশ গড় গড় করে এগিয়ে গিয়ে থামবার জায়গায় থেমে গেছে। তবে সাস্‌পেন্স কিছুটা থাকবেই, ঐ সাস্‌পেন্সটুকুই লেখকের মূলধন। ওটা না থাকলে কেমন যেন জোলো জোলো হয়ে যায় লেখাটা। একটা কি হয় কি হয় গোছের ভাব শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে না পারলে—

'তাই বুঝি?' ওর ডাগর চোখ দুটোকে যতটা সম্ভব ছোট করে বললে—'সেই জন্যেই জাহ্নবীকে না মেরে একেবারে নিরুদ্দেশ করে ছাড়লে। যারা ওই গল্প পড়বে তারা ভেবে মরুক জাহ্নবীর কি হল। আচ্ছা ছ্যাঁচড়া মানুষ তো!'

নিতান্ত ভাল মানুষের মত জিজ্ঞাসা করলাম—'তাহলে কি ভাবে শেষ করা উচিত ছিল? বলই না শুনি তোমার আইডিয়াটা। এরপর যা লিখব—'

'কেন লিখবে?' সত্যিই ওর স্বরটা ভারী হয়ে উঠল। একটা খুব গুরুতর পরামর্শ দিচ্ছে এই ভাবে বলতে লাগল—'কেন ওই সমস্ত ছাইপাঁশ লিখতে যাবে? তোমার ঐ জাহ্নবী যদি বেঁচে থাকে এখনও তাহলে ঐ লেখা পড়ে কি ভাববে সে? কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে, বেশ মজা পাও বুঝি? আর একখানা বই লিখে তোমার ঐ বইখানার জবাব দেবার উপায় থাকত যদি জাহ্নবীর—'

থতমত খেয়ে বলে উঠলাম—'তার মানে! তুমি কি মনে করেছ জাহ্নবী বলে সত্যিই কেউ ছিল। কি আপদ দেখ, জাহ্নবী হচ্ছে আমার মনগড়া চরিত্র, রক্তে মাংসে গড়া জাহ্নবীকে কোথাও খুঁজে পাবে না।'

'পাব না?' সত্যিই ফণা ধরল উমা। আর একবার জিজ্ঞাসা করল—'পাব না?'

ঘাবড়ে গেলাম দস্তুরমত। অন্যমনস্ক হয়ে কোনও জ্যান্ত জীবকে নিয়েই গল্প লিখে ফেলেছি নাকি!

নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—'লেখক হলে যে মানুষ নিজেকেই সব চেয়ে বেশি ঠকায় এটা জানতাম না।'

ঠিকই তাই।

উমার কাছে আমি ধরা পড়েছি কারণ উমা জাহ্নবীকে চিনত। ও ধরে ফেলেছিল জাহ্নবী নাম দিয়ে কার চরিত্র আমি আঁকতে চেষ্টা করেছি। জাহ্নবীর সঙ্গে উমা লেখাপড়া করেছে, এক ঘরে দরজায় খিল এটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুজ গুজ ফুস ফুস করেছে, একই বাথরুমে এক সঙ্গে দুজনে স্নান করেছে। পাশাপাশি দুটো ফ্ল্যাটে

ওরা থাকত। উমার বাবা ছিলেন উকিল, জাহ্নবীর বাবা পেশকারি করতেন। ঐ পাড়াতেই আমার মামার বাড়ি। নামজাদা পরিচালক ছিলেন সত্যপ্রিয়বাবু, তাঁর কোনও ছবিতে চান্স পাবার জন্যে আমার মত অনেকেই তাঁর উমেদার ছিল। ঘটনাচক্রে উমার বাবা হৃষীকেশবাবুর নজর পড়ল আমার ওপর, কপাল খুলে গেল। ধাঁ করে এক সিনেমা হলে টিকিট বেচার চাকরি পেয়ে গেলাম। কদর বেড়ে গেল আমাব, উমা উমার বন্ধু জাহ্নবী আরও অনেকে বিনা পয়সায় সিনেমা দেখতে লাগল। নতুন বই এলে আর রক্ষে নেই, প্রথম দিনে না হোক দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে উমাদের দেখাতেই হবে। না দেখাতে পারলে শুনতে হবে চেটাং চেটাং বুলি। হৃষীকেশবাবুব কন্যাটিব মুখে মধু না দিয়ে ভুল কবে খাঁটি সরষের তেল দেওয়া হয়েছিল নাকি নাড়ী কাটবার সময়! সেই তেলের ঝাঁজটা এক ভাবে আগাগোড়া বেকচ্ছে মুখ দিয়ে। ভাল কথা বললেও গায়ে বিষ ছড়িয়ে দেয়।

সাত তাড়াতাড়ি এক উঠতি উকিলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন মেয়ের হৃষীকেশবাবু। জাহ্নবী বেচাবী একা পড়ে গেল। মাঝে মধ্যে সিনেমার পাশ নিয়ে ওকে সাধতে যেতাম আমি, আমল দিত না। পেশকার বাপেব পয়সার অভাব নেই, উঁচু দরের টিকিট কিনে মায়ের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যেত। নিজের ওজন বুঝে চলতে শিখেছি তখন। সিনেমায় টিকিট বেচি বলে সবাই কি চোখে দেখে আমাকে জানতে পেরে গেছি। সামলে গেলাম, সবাই হৃষীকেশবাবু নয়। হৃষীকেশবাবুব মেয়ে উমা চেটাং চেটাং বোলচাল ছাড়ত বটে কিন্তু টিকিটওয়ালা ছোড়া বলে মনে কবত না। তার কারণও অবশ্য একটা ছিল। এক বেটা ঘাগী চোরকে ধবে দিয়ে আমি হৃষীকেশবাবুব নজরে পড়ে গিয়েছিলাম।

তাহলে সেই চোরের কাহিনীটাই আগে বলি।

খুবই বিখ্যাত এক গিনি সোনার দোকান। আয়না-লাগান

কাঁচের আলমারিতে রাশি রাশি গিনি সোনার গহনা ঝকমক করছে। সন্ধ্যার একটু আগে ঢাউস এক মোটর গাড়ি এসে সেই দোকানের সামনে দাঁড়াল। নামলেন এক বিরাট বপু ভদ্রলোক। দোকানদার তটস্থ হোয়ে উঠল। শুরু হোয়ে গেল গহনা পছন্দ করা। ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করেও মহামান্য খদ্দেরটি কিছুই পছন্দ করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হোয়ে বললেন, চলুক কেউ তার সঙ্গে কয়েক ছড়া হার আর কয়েক জোড়া দুল নিয়ে। পছন্দ করাটা মেয়েদের কর্ম, যেগুলো পছন্দ হবে রেখে দেবে। কোথায় যেতে হবে জানতে চাইল দোকানদার। ভদ্রলোক নাম ঠিকানা দিয়ে দিলেন। হৃষীকেশ উকিলকে ও অঞ্চলের সবাই চেনে। দোকানদারও চিনত। এক কর্মচারীর হাতে কয়েকছড়া হার আর কয়েক জোড়া দুল দিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে।

বিখ্যাত উকিল হৃষীকেশবাবুর বাড়ির সামনে পৌঁছে গাড়ি থামল। প্রকাণ্ড বাড়ি, একতলা দোতলা তেতলায় ছটা ফ্ল্যাট। নিচের তলার একটা ফ্ল্যাটে হৃষীকেশবাবু থাকতেন। রাস্তার ধারেই পাশাপাশি দুখানা ঘর। উকিলবাবুর মক্কেলরা সকাল সন্ধ্যে দুখানা ঘর জুড়ে বসে থাকেন। সেই ঘর দুখানার পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। সিঁড়ির তলায় যে দরজা সেই দরজা দিয়ে ভেতরে যাওয়া যায়।

নামলেন সেই ভদ্রলোক গাড়ি থেকে, দোকানের কর্মচারীটিও গহনার বাক্স হাতে নিয়ে নামল। একখানা ঘরে হৃষীকেশবাবুকে ঘিরে বসে আছেন কয়েকজন মক্কেল আর জুনিয়র উকিলরা, আর একখানা ঘরে দুজন মুহুরী বসে মকদ্দমার কাগজপত্র লিখছেন। তাঁদের চার পাশেও কয়েকজন ভদ্রলোক বসে আছেন। কর্মচারী-টিকে নিয়ে সেই ভদ্রলোক ঐ মুহুরীদের ঘরে ঢুকলেন। এধার ওধার তাকিয়ে দরাজ গলায় বললেন—'বসুন ঐ চেয়ারে। দিন আপনার বাক্সটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।'

আধ ঘণ্টা পার হোল, কর্ম্মচারীটি উসখুস করছে তখন। বড়-লোকের বাড়ি কিছু বলতেও পারছে না। আরও পনেরো মিনিট গেল। শেষ পর্যন্ত সাহস করে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে একজন মুহুরীকে কর্মচারীটি বলতে গেল। যা বলতে গেল তা আর বলা হোল না। কিছু শোনার সময় নেই মুহুরীর, কাগজের ওপর থেকে নজর না সরিয়েই তিনি খিঁচিয়ে উঠলেন—'বসুন তো মশাই ওধারে, দেখছেন কাজ করছি।' আরও পনেরো মিনিট কাটল। শেষ পর্যন্ত গোলমাল শুরু হোল। কয়েকজন ভদ্রলোক কর্মচারীটির কথায় কান দিলেন। তৎক্ষণাৎ হৃষীকেশবাবুর কানে ব্যাপারটা তোলা হোল। খোঁজ খোঁজ, শিগগির দেখ গহনার বাক্স নিয়ে কে বাড়ির ভেতর ঢুকেছে।

পাওয়া গেল ভেলভেটে মোড়া খালি একটা গহনার বাক্স। সেটা সিঁড়ির তলায় পড়েছিল। একটা কানের দুলও পাওয়া গেল সেই বাক্সের কোনে, তাড়াতাড়িতে সেটা বাক্সের সঙ্গে আটকে থেকে গেছে। বড়ব বড় তাবড় সব সাহেবরা ছুটে এলেন তদন্ত করতে, অনেক রাত্রি পর্যন্ত পাড়াসুদ্ধ মানুষ জেগে রইল। গহনার দোকানের মালিক এসে কপাল চাপড়াতে লাগল।

চুপচাপ সব দেখে গেলাম আমি, সেই বিরাট হট্টগোলের মধ্যে একটি কথা বললাম না। সব চুকেবুকে গেলে হৃষীকেশবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম।

মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন একলা, চুরিটার জন্যে নিজেকেই দায়ী মনে করেছেন। উমাও তখন বসেছিল বাবার সামনে, বোধ-হয় কিছু খাওয়াবার জন্যে সাধাসাধি করছিল। আমি গিয়ে দাঁড়াতে হৃষীকেশবাবু মুখ তুলে তাকালেন।

'আপনার কাছে একটা কথা বলতে এসেছি।' কোনও রকমে ঐটুকু বলতে পারলাম।

'বস ঐ চেয়ারে।' বলে উনি আবার মুখ নিচু করলেন।

তেড়ে উঠল উমা—'এখন কোনও কথাটতা চলবে না। রাত একটায় কথা বলতে এসেছে। যদি কিছু বলার থাকে কাল সকালে—'

ওকে বাধা দিয়ে বললাম—'তুমি যদি বেবিয়ে যাও একটু এখনই আমি বলতে পাবি। হু'মিনিট লাগবে। খুবই দবকারি কথা কিনা।'

মুখ তুললেন আবার হৃষীকেশবাবু, মেয়েকে বললেন বাড়ির ভেতর যেতে। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'তুমি অমুকবাবুর ভাগ্নে না? বস একটু, পাড়াব ছেলে তুমি, তোমাকে কি ফেরাতে পাবি। তবে মনেব অবস্থা তো বুঝছ, কি মুশকিলেই যে পড়ে গেলাম।'

জোব দিয়ে বললাম—'একটুও মুশকিলে পড়েন নি। এখনই চলুন আমাব সঙ্গে, কোথায সেই গহনা গিয়ে পৌঁছেছে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

চাঙ্গা হয়ে উঠলেন হৃষীকেশবাবু। সংক্ষেপে জানালাম তাঁকে ব্যাপাবটা। যে গাড়িতে চেপে চোব এসেছিল সেই জাতেব একখানা গাড়ি আছে বিখ্যাত এক চিত্র-তাবকাব। গাড়ি দেখে আমি গাড়ির পাশে গিযে দাঁড়িয়ে ড্রাইভাবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অমুক স্টাব উকিলবাবুব বাড়িতে এলেন কেন। ড্রাইভাবটি অতি সদালাপী মানুষ। বললে, স্টাব কেউ আসেনি, এসেছেন অমুকচন্দ্র অমুক-কুমাব সাহেব, উকিলবাবু কুমাব সাহেবেব আত্মীয় হন। বলেই সে এক চাল চালল। তাড়াতাড়ি পকেটে হাত পুবে একখানা নোট বার করে বলল—'একটা উপকার করবে ভাই, এক প্যাকেট সিগারেট এনে দেবে? অনেকক্ষণ সিগাবেট খাইনি। গাড়ি ছেড়ে যেতেও পাবি না। ভয়ানক কড়া মনিব, যদি এসে দেখেন গাড়িতে নেই, তাহলে—' বলতে বলতে নোটখানা আমার বুক পকেটে গুঁজে দিলে জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে। অগত্যা সিগারেট কিনতে যেতে

হোল। সিগারেট কিনে দাম দিতে গিয়ে দেখি নোটের সঙ্গে আর একখানা কাগজও এসে গেছে। সিগারেট নিয়ে এসে দেখলাম, গাড়ি উধাও। মনটা খারাপ হোয়ে গেল। বেচারা-ড্রাইভারের টাকা ক'টা ফিরিয়ে দেওয়া হোল না। বড় মানুষের চাকর দশটা টাকার জন্যে কেয়ার করে না হয়তো। তা না করুক, আমিই বা খামকা টাকা ক'টা রাখতে যাব কেন। ঠিকানা তো আমার কাছে রয়েছে। ভাগ্যে নোটের সঙ্গে কাগজখানা ভুলে দিয়ে ফেলেছে আমাকে। তৎক্ষণাৎ চললাম সেই ঠিকানায়। যাওয়া আসার বাস ভাড়াটা ড্রাইভার বন্ধুর টাকা থেকে কেটে রেখে বাকীটা তাকে দিয়ে আসব। সেখানে পৌঁছে তাজ্জব বনে গেলাম। অতবড় কুমার সাহেবের ড্রাইভাব ঐ রকম নোঙরা জায়গায় থাকে। বস্তির ভেতর ঢুকে খোঁজ করতে হবে। বস্তির নাম রাণীর বাগান। রাত প্রায় ন'টা তখন, রাণীর বাগানের ভেতর মাতালেব হল্লা শোনা যাচ্ছে। ভাবছি হুট কবে বাত ন'টায় রাণীব বাগানে ঢোকাটা ঠিক হবে কিনা। ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন, রাণীর বাগানে আর ঢুকতে হোল না। দেখলাম একখানা ট্যাক্সি এসে বস্তির সামনে থামল। বিপুল বপু কুমার সাহেব তাঁর ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে নামলেন ট্যাক্সি থেকে। প্রভুভৃত্য গলা জড়াজড়ি করে টলতে টলতে ঢুকে পড়লেন বস্তিতে। দুএকটা কথা কানে গেল। প্রভুভৃত্য পরস্পরকে শালা বলে সম্বোধন করছেন। নোঙরা মেয়েমানুষ কয়েকটা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল গলিব মুখে। কুমার সাহেব আর তাঁর ড্রাইভার তাদের কয়েকজনকে জাপটে ধরে ঠেলে নিয়ে গেলেন অন্ধকারের মধ্যে। আর কিছু দেখতে পাওয়া গেল না। দরকারও ছিল না, কুমার সাহেবের আসল পরিচয় তো পেয়েই গেলাম।

ফিরে এসে দেখলাম বড় বড় সাহেবরা এসে তদন্ত করছেন। একে ওকে তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম ব্যাপারটা। চুপ করে রইলাম সমস্ত চুকে গেলে আগে সব কিছু বলব

হৃষীকেশবাবুকে। হৃষীকেশবাবু যদি মনে করেন—

'মানে অতগুলো মানুষের সামনে এই সমস্ত বলে আমি অপ্রস্তুত হতে চইনি। যদি আপনি মনে করেন কিছু করা উচিত তো করুন। সেই কুমার সাহেব আর ড্রাইভার এখনও হয়তো সেই বস্তিতেই আছে। রাতারাতি ধরতে পারলে—'

'সেই কাগজখানা আছে তোমার কাছে? দাও তো দেখি।' বলে হৃষীকেশ বাবু হাত পাতলেন।

পকেট থেকে বার করে দিলাম কাগজখানা। বিশেষ কিছুই লেখা নেই তাতে। একজন ছোটেলাল রাণী বাগান বস্তির বেচু মিস্তিরকে লিখছে শ' আড়াই টাকা যেন যোগাড় করে রাখে, মাল তৈরী, টাকা দিয়ে খালাস করে নিতে হবে।

উল্টে পাল্টে বার বার কাগজখানা দেখলেন হৃষীকেশবাবু। একটা চুমকুড়ি দিয়ে বললেন—'হজম করতে পারল না। চালটা খুবই ভাল হয়েছিল, কেঁচে গেল। ওদের গুষ্টিশুদ্ধ সবাইকে এই রাত্রেই হাজতে আটকানো যায়। কিন্তু তাতে লাভটা কি দাঁড়াবে? মাল ওরা ফেরত দেবে না। তা ছাড়া মক্কেল বলে কথা। কোনও কারণেই নিজের মক্কেলকে হাজতে পুরতে পারি না। যাকগে, মালটা এখন ফেরত পেলেই হয়। এত রাত্রে কি ট্যাক্সি মিলবে?'

সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'যাবেন নাকি এখন সেই রাণীর বাগানে?'

'না, অতদূর আমায় যেতে হবে না। আমার দু'চারজন ভাল ভাল মক্কেলকে সব ব্যাপারটা জানাব। যা ব্যবস্থা করাব তারাই করবে। আচ্ছা, তুমি এখন বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়গে। যে উপকার করলে আজ তুমি। ঠিক আছে, তোমাকে আমি ভুলব না।'

বলতে বলতে উঠে পড়লেন হৃষীকেশবাবু। মেয়েকে ডেকে দরজা বন্ধ করতে বলে তখনই বেরিয়ে পড়লেন। ওঁর সঙ্গে খানিকটা

এগিয়ে গিয়ে একখানা ট্যাক্সি ধরে দিলাম।

ফৌজদারি আদালতে সবচেয়ে নাম-করা উকিল হৃষীকেশবাবুর সম্মান রক্ষা হোল। গহনাগুলো চোরেরা ফেরত দিলে। একজনও ধরা পড়ল না। ভাগ্যে আমি বড় বড় সাহেবদের সামনে কিছু বলিনি।

আমার বেকারত্বও ঘুচল। হৃষীকেশবাবু তাঁর এক সিনেমা-ওয়ালা মক্কেলকে ধরে সিনেমায় টিকিট বেচার চাকরি করে দিলেন। শুরু হল উমার তম্বি, চাকরিটা যখন তার বাবা করে দিয়েছেন তখন তার তম্বি মানব না কেন। সে তম্বিতে কিন্তু বিষ ছিল না। টিকিট-ওয়ালা ছোড়া মনে করত না আমাকে উমা। অন্য কিছু মনে করত। কি মনে করত তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতাম না। তারপর তো সাত তাড়াতাড়ি ওর বিয়েই হোয়ে গেল। জাহ্নবী বেচারী একলা পড়ে গেল।

সত্যি কথাটাই উমা বললে, লেখক হোলে মানুষ নিজেকেই সব চেয়ে বেশী ঠকায়। জাহ্নবী নাম দিয়ে যার চরিত্র আমি গড়ে তুলেছি তাকে উমা খুবই ভাল ভাবে চিনত। এক সঙ্গে থেকেছে, এক সঙ্গে স্নানের ঘরে ঢুকে স্নান করেছে, একসঙ্গে দু'জনে দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে গুজ গুজ ফুস-ফুস করেছে। জাহ্নবীকে চিনতে উমার এক মুহূর্ত দেরি হয়নি। জাহ্নবীর মত মেয়ে নিরুদ্দেশ হোতে পারে না, সোজা গলায় দড়ি দিয়ে বা বিষ-খেয়ে বা গায়ে আগুন লাগিয়ে মরতে পারে। জাহ্নবীকে নিরুদ্দেশে পাঠিয়ে কতবড় অন্যায় করেছি, তাই আমাকে বোঝাতে এসেছিল উমা। মানে স্রেফ ফাঁকি দিয়েছি। জাহ্নবীকে নিরুদ্দেশে না পাঠালে ওর হাত থেকে আমার পরিত্রাণ ছিল না। একটা জুতসই পরিণতি তো দেখাতেই হবে। কোথাও কিছু নেই, দুম করে একটা চরিত্র শেষ হয়ে গেল, এরকমটা হতেই পারে না। কোনও লেখকই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রকে মাঝপথে ফেলে রেখে পালিয়ে যান না। যখন আর কোনও উপায়

না থাকে তখন লেখক নিজেকে ঠকান, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রকেও ঠকান। মেরে দিয়েই হোক বা নিরুদ্দেশে পাঠিয়েই হোক, একটা চরম পরিণতি দেখিয়ে চরিত্রটির হাত থেকে নিস্তার পান।

আমিও তাই করেছি। জাহ্নবীকে নিরুদ্দেশে না পাঠালে উপায় ছিল না। সবায়ের মুখ রক্ষা হোল। বীরেশ্বরকে জেল খাটাতে হল না, মালতীকে স্বামী পুত্র ছেড়ে পথে দাঁড়াতে হল না, জাহ্নবীর পেশকার বাবা যথা পূর্বং দু'হাতে উপরি কামাতে লাগলেন। কারও কোনও ক্ষতি হোল না। স্রেফ জাহ্নবী নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। এর চেয়ে চমৎকার পরিণতি আর কি হতে পারে।

রুপোর কৌটো খুলে দু'খিলি পান মুখে পুরল উমা, আর একটা কৌটো থেকে একটুখানি কিমাম উঠিয়ে নিয়ে ডেলা পাকিয়ে আলগোছে হাঁয়ের ভেতর ফেলল। তারপর কাপড় চোপড় গুছিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল—'শেষ পর্যন্ত কি হোল তোমার জাহ্নবীর?'

বেশ গিন্নীবান্নী গোছের দেখাচ্ছে ওকে। গায়ে গতরে একটু ভারী হয়েছে, তলপেটে বেশ চর্বি জমেছে, রাশীকৃত গহনা না পরে শুধু দু'গাছা মোটা মোটা বালা আর দু' আঙুল চওড়া একছড়া হার পরেছে বলে চমৎকার মানিয়েছে। যখনই ও আসে আধ হাত চওড়া পাড় কোরা তাঁতের শাড়ি পরে আসে। মানে উকিলবাবুটি হরদম পরিবারকে নতুন কাপড় কিনে দেন। দেবেন না কেন, পরিবারের দৌলতে উন্নতি। হৃষীকেশবাবু জামাইকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছেন।

ওর পানে তাকালে মনে হয়, দুনিয়ায় সত্যিই কোন দুঃখ-কষ্ট ঝামেলা নেই। দুনিয়া সুদ্ধ লোকের পরিবাররাই ওর মত চওড়া পাড়ের কোরা তাঁতের শাড়ি পরে পান বোঝাই রুপোর কৌটো হাতে নিয়ে গল্প করার জন্যে সকাল-সন্ধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। বড় হয়ে গেছে, ছেলে চলে গেছে

কানাডায়। মেয়ে কলেজে পড়ছে। ওদিক থেকেও নিশ্চিন্ত সুতরাং চেনা-জানা মানুষকে প্যাঁচে ফেলার জন্যে হরদম ঘুরে বেড়াও। কে আটকাচ্ছে।

আমার কাছ থেকে কোনও জবাব না পেয়ে অন্য কথা পাড়ল। কথার পিঠে কথা এগিয়ে চলল।

'ভাল কথা, সিনেমায় আলো নিভে গেলেও সব দেখা যায়?'

'তা যায়। পর্দার ওপর যে আলো পড়ে তাতেই সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়।'

'তা'হলে সিনেমা দেখতে গিয়ে আমরা কিছু দেখতে পাই না কেন?'

'যারা সিনেমা দেখতে বসেছে তাদের নজর থাকে পর্দার ওপর। ছবি দেখতে বসে ছবির ঘটনার মধ্যেই সবাই তলিয়ে যায়। আশে পাশে নজর দিতে পারে না।'

'তুমি যদি এখনও কোনও সিনেমায় চাকরি করতে তা'হলে খুব মজা হোত। তোমার সঙ্গে গিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখতাম সিনেমা দেখতে এসে কে কি করছে।'

'সে তুমি এখনও দেখতে পার। একটা ছবি দু'দিন দেখতে গেলেই হোল। আগের দিন ছবিটা দেখলে, পরদিন নজর রাখলে দর্শকদের ওপর। তবে সুবিধে মত জায়গায় বসতে হয়। এমন জায়গায় বসে আছ, যার আশে-পাশে চতুর্দিকে শুধু একগাদা বুড়ো-বুড়ি বসেছে। সব মাটি হয়ে গেল, কোনও মজাই দেখতে পেলে না। পয়সা খরচা করে অনর্থক ভুগে মলে। টিকিট ঘরের সামনে একটু ঘোরাঘুরি করতে হয়, তেমন একজোড়া ইয়ে টিকিট কিনতে এলে ঠিক তাদের পেছনের সীটু দখল করতে হয়। তা' ছাড়া সব সিনেমাতেই এমন কতকগুলো সীট থাকে যেগুলো একটু আড়ালে পড়ে। পাশে একটা থাম রয়েছে বা একেবারে দেওয়ালের ধারে এক কোনায় দুটো সীট রয়েছে। ওরা সব ঐ ধরনের সীটগুলোই

নেয়। তার পেছনে জুতসই জায়গায় বসতে পারলেই হল।'

'তোমার কিন্তু অনেক বেশী সুবিধে ছিল। সিনেমার কর্মচারী, অন্ধকারে এক কোনে দাঁড়িয়ে থাকলেই হল। কেউ তো মানা করতে যাবে না।'

'তা ছিল বটে। কিন্তু যে টিকিট বেচছে সে হরদম হলের মধ্যে যাবে কেমন করে। যারা সীট দেখিয়ে দেয় তারা ঐ সুবিধেটা ভোগ করে।'

'তা'হলে তুমি ওদের কাণ্ডকারখানা দেখতে কেমন করে?'

'সব কি দেখতে হয়, অনেক কিছু শোনাও যায়। সিনেমা শেষ হলে এমন অবস্থায় বেরিয়ে আসত ওরা যে আর কিছু দেখার দরকার হত না। তোমার বন্ধুর কাপড় চোপড়ের অবস্থা, মুখ মাথা চুল সগৌরবে ঘোষণা করত কি জাতের ঝড় ঝাপটা বয়ে গেছে তার শরীরের ওপর দিয়ে। তা ছাড়া '

লাগাম কষলাম, মুখটাকে আর ছুটতে দেওয়া উচিত নয়। সম্ভ্রান্ত এক উকিলের পরিবার সামনে বসে আছেন। উকিলের পরিবারটি ছাড়নেওয়ালী পাত্রী নন। নির্বিকার চিত্তে জেরা শুরু করলেন।

'তা ছাড়া কি? বলতে বলতে থেমে গেলে যে?'

'কি লাভ হবে আমাদের ও সব আলোচনা করে বলতে পার? শুধু শুধু ঘোঁট পাকানো কেন?'

'ঘোঁট তুমিই পাকিয়েছিলে। মনে করেছ আমি কিছু জানি না? এখন সাধু সেজে এক গল্প লিখে তাকে নিরুদ্দেশে পাঠিয়ে নিজের ঘাড় থেকে দোষটা নামাচ্ছ। তোমার জাহ্নবী তোমার কাছে গিয়ে বলেনি যে বাঁচাতে হবে তাকে? কি বলেছিলে তাকে তুমি? বাঁচাবার চেষ্টা না করে মালতীর বরকে ফাঁসাবার চেষ্টা করেছিলে। কেন দুশমনি করতে গিয়েছিলে বীরেশ্বরের সঙ্গে? সে কি তোমার বাড়া ভাতে ছাই ঢেলে দিতে গিয়েছিল।'

শুরু হয়ে গেল ঝগড়া। উমার সঙ্গে দেখা হোলেই ঝগড়া

বাধবে। ওর স্বামী বিমলবাবু বলেন, আমরা দু'জনে এক বাড়িতে বা এক পাড়ায় থাকলে নাকি মাসে তেত্রিশটা করে ফৌজদারী মামলা হোত। ভাগ্যে ন' মাসে ছ' মাসে এক আধ বার দেখা সাক্ষাৎ হয়।

ঝগড়ার মাধ্যমেই আমার সঙ্গে ওর পরিচয় হয়। গায়ে পড়ে ঝগড়া করাটা ওর ধাতস্থ। সবে তখন এসেছি মামার বাড়িতে কাজকর্ম খোঁজবার জন্যে, দু-একটি নতুন বন্ধু হয়েছে, হঠাৎ লেগে গেল ধুন্ধুমার কাণ্ড। আমার বন্ধু দেবরঞ্জনের সঙ্গে হৃষীকেশ উকিলের মেয়ে উমার। দেবরঞ্জন বেচারা আর্ট স্কুলে পড়ত, সাত চড়েও রা কাড়ত না। পূজার পরেই সেই মণ্ডপেই আর্ট এগ্‌জিবিশন হোল, পাড়ার আর্টিস্ট দেবুর কয়েকখানা ছবি টাঙানো হল। এগ্‌জিবি-শনের ভেতরেই যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে ছাড়লে উমা। বহু লোকের সামনে দেবুকে যা তা বলে গালমন্দ দিয়ে গেল। অপরাধ, দেবুর একখানা পোর্টরেটে হুবহু উমার আদল এসে গেছে। লজ্জায় অপমানে মর-মর হয়ে দেবু বেচারা মুখ দেখানো বন্ধ করলে।

ব্যাপারটা শুনে পিত্তি জ্বলে উঠল আমার। সটান গিয়ে হাজির হোলাম ওদের বাড়িতে। হৃষীকেশবাবু আদালতে ছিলেন। একটা চাকর এসে জানাল উকিলবাবু নেই। প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠলাম তাকে—'চোপরাও উল্লুক, বাবু বাড়ি নেই আমি জানি। বাবুর মেয়েকে ডাক জলদি। শিখিয়ে দিয়ে যাব তাকে অপমান করা কাকে বলে।'

'কি! কি বললে তুমি?' তেড়ে বেরিয়ে এল উমা।

আর যাবে কোথায়। প্রাণপণে চেঁচাতে লাগলাম দু'জনে। পাড়াসুদ্ধ মানুষ জমা হয়ে গেল। একেবারে আকাশফাটা কাণ্ড-কারখানা কিনা। সম্ভ্রান্ত উকিল হৃষীকেশবাবুর কলেজ-পড়া মেয়ে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করছে। ছোটলোক ইতর যা মুখে এল বলে ফেললাম দু'জনে। আমার বন্ধুরা আমাকে

টেনে নিয়ে গেল। ভয় পেয়ে গেলেন আমার মামারা, হৃষীকেশবাবু হুঁদে উকিল, নিশ্চয়ই ফ্যাসাদে ফেলবেন আমাকে। অপরাধ তো একটা নয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়ি চড়াও হয়ে তাঁর অবিবাহিতা কন্যাকে গালমন্দ দিয়ে এসেছি। গুণ্ডামী, সমাজ বিরোধিতা, কন্যার সম্ভ্রম নষ্ট, আস্ত পেনাল কোড্খানা আমার মাথায় ঝাড়বেন হৃষীকেশবাবু, এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাস্তি।

তাজ্জব ব্যাপার ঘটল সন্ধ্যের পরে। স্বয়ং হৃষীকেশবাবুই এসে উপস্থিত হলেন মামার বাসায়। বড় মামাকে বলে গেলেন, আমি যেন রাত্রে তাঁর ওখানে খেতে যাই। অমন ঝগড়া ভাই-বোনে কত হয়, রাত্রে খাবার সময় ঝগড়া তিনি মিটিয়ে দেবেন। মেয়ে তাঁর ভয়ঙ্কর দজ্জাল। মা নেই কে শাসন করবে। এতদিন পরে তবু একটা ভাই পেল, এবাব বোধ হয় ভায়েব শাসনে খানিকটা ঢিট হবে।

খেয়ে এসেছিলাম হৃষীকেশবাবুব পাশে বসে। উমা পরিবেশন করেছিল। তারপব পোর্টরেটখানা দেবুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ওকে দিয়ে এলাম। সত্যিই বির্দকুটে কাণ্ড করেছিল দেবু, পাতলা কাপড় পরে পুকুর থেকে স্নান করে উঠছে একটা মেয়ে, ভিজে কাপড় লেপটে বসেছে গায়ে, এই রকম নোংরা ছবি এঁকেছিল। নোংরামিটা আগে ধরতে পারিনি। সেই রাত্রে খেতে খেতে পারলাম। সত্যিই তো, আমার বোন উমার আদল এসে গেছে যে ছবিতে সে ছবি অমন বিশ্রী হবে কেন। গোল্লায় যাক আর্ট।

সে যাত্রা শান্তি স্থাপন হোল বটে, ঝগড়া করার অভ্যাসটা কিন্তু আমাদের ঘুচল না। ছুতোনাতা একটা পেলেই হল, তার মানে বোনকে আমি ঢিট করতে পারি নি। ভালভাবে বোঝালেও বুঝবে না কিছুতেই, অগত্যা নিজমূর্তি ধারণ করলাম।

'কে বলেছে আমি বীরেশ্বরের সঙ্গে দুশমনি করেছি? বীরেশ্বর একটা বীষ্ট, আস্ত একটা রামছাগল, মালতীকে ডিভোর্স করার তালে

ছিল, ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে মালতীকে খেদিয়ে দিত। মতলবটা কি করেছিল জান? মালতী দুশ্চরিত্রা প্রমাণ করে ছাড়ত। আর এধারে জাহ্নবীকে নিয়ে ফুর্তি চালাচ্ছে। আমি নিজে তোমার বন্ধুকে সাবধান করতে গিয়েছিলাম। তিনি আমায় চোখ রাঙিয়েছিলেন।. সিনেমার টিকিট বিক্রি করি আমি। এতবড় স্পর্ধা আমার যে মহামান্য পেশকারের কন্যাকে সাবধান করতে যাই।'

যতদূর সম্ভব গলা খাটো করে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে উমা—'ও সমস্ত বাজে কথা ছাড়। আমি জানতে চাই তোমার সঙ্গে দেখা করে জাহ্নবী বলেছিল কি না যে তাকে বাঁচাতে হবে। চক্রান্তটা তখন সে টের পেয়ে গেছে। তার সেই পেশকার বাপটা তাকে টোপ ফেলে বীরেশ্বরকে গেঁথে তুলতে চাচ্ছে এটা জানতে পেরে তোমার কাছে ছুটে গিয়েছিল কিনা জাহ্নবী? কি বলেছিলে তাকে তুমি?'

'কি বলেছিলাম শুনতে চাও? বলেছিলাম আমি একটা হতভাগা সিনেমার টিকিটওয়ালা, আমার কাছে এলে কেন, সেই বড়লোকের পাঁঠা বীরেশ্বরের কাছে যাও।'

'কিন্তু তার আগেই এমন ব্যবস্থা করে রেখেছিলে যে বীরেশ্বরকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছে। বীরেশ্বর তখন কোথায় যে জাহ্নবী তার কাছে যাবে? কি ভয়ানক মানুষ তুমি। একটা মেয়ে ছুটে গিয়েছিল তোমার কাছে তার সর্বনাশ হবে বুঝতে পেরে, তুমি তাকে কুকুরের মত খেদিয়ে দিলে। ভগবান তোমাকে সবই দিয়েছেন শুধু একটু হৃদয় দিতে ভুল করেছেন। চিরকালটা এক ভাবে গেল, এখন লেখক হয়ে বই লিখে নিজের কাছে নিজে সাফাই গাইছ। জাহ্নবী নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, তোমার বই শেষ হল। চমৎকার, ভাগ্যবান লেখক একেই বলে। জানতে ইচ্ছে করে না একবার কি হল সেই হতভাগীর?'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো শেষ করে কৌটো খুলে আর এক জোড়া পান মুখে পুরে দিল উমা।

জানতে আমার সত্যিই ইচ্ছে করে না।

সব কিছু জেনে ফেললে গল্প লেখার পেশাটাকেই ত্যাগ করতে হয়।

জাহ্নবী আমার কাছে একটা চরিত্র, বীরেশ্বর আর এক চরিত্র। বীরেশ্বরের বউ মালতী, জাহ্নবীর সেই পেশকার বাবা সবাই এক একটা চরিত্র। হ্যাঁ, আমি মানছি আমার লেখাতে অনেক জ্যান্ত মানুষের ছাপ এসে যায়। যাদের আমি দেখেছি, একটু আধটু চিনতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি তাদেরই আমি আমদানি করে ফেলি আমার গল্প উপন্যাসে। মন গড়া চরিত্র বলতে কি বোঝায় তা আমি জানিও না। মনগড়া চরিত্র দিয়ে গল্প লিখতে গেলে ভূতের গল্প লিখতে হয় কিংবা পৃথিবী নামক এই গ্রহটাকে বাদ দিয়ে অন্য গ্রহের জীবদের নিয়ে গল্প ফাঁদতে হয়। আমি আজকের যুগের লেখক, আমার সঙ্গে যারা এই দুনিয়ায় বিচরণ করছে, তাদের জীবন নিয়ে আমার কারবার। জীবন কথাটার অর্থ হল প্রশ্ন। জীবন আজিকের যুগে একটা জ্যান্ত সমস্যা। সেই সমস্যাকে জীবন্ত করে সবাইয়ের সামনে তুলে ধরতে পারলেই হল, সমস্যার সমাধানটা কি হবে বা হওয়া উচিত তা নিয়ে মাথা ঘামানো আমার কর্ম নয়। সেই চেষ্টা করতে গেলেই ক্ষুধার্ত জীবনের সবগ্রাসী হাঁয়ের মধ্যে ঢুকে পড়তে হবে। অর্থাৎ সেইখানেই ইতি হয়ে যাবে, লেখক এবং তার লেখার কবর। কবরে ঢুকে কি লেখা যায়?

জাহ্নবী আমাকে কবরে ঢোকবার সাদর আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিল। তাকে যদি তখন বাঁচাতে যেতাম তাহলে আমাকেও তার সঙ্গে কবরের তলায় আশ্রয় নিতে হত। সাহসের অভাব ছিল আমার মানছি। সাহসের অভাব আজও রয়েছে, জাহ্নবী চরিত্রের চরম পরিণতি কি হয়েছে তা আমি জানতে চাই না। জেনে ফেলতাম যদি তাহলে ওকে অবলম্বন করে আর গল্প লিখতে পারতাম না।

যাক গে, গল্প লেখা তো আগেই শেষ হয়ে গেছে। একই

চরিত্রকে দুবার দুটো গল্পে আনলে নিজের লেখা নিজে চুরি করা হয়। বেপরোয়া হয়ে উমার প্রশ্নের জবাব দিলাম—'জানতে ইচ্ছে হবে না কেন। সত্যিই কি এখনও বেঁচে আছে সে? কোথায় আছে করছে কি?'

'জেল খাটছে। জেল যখন খাটে না তখন সমাজের সঙ্গে দুশমনি করে। সমাজের সঙ্গে দুশমনি করার দরুণ আবার জেল হয়। এবার ওর মামলায়-- আমাদের বাড়ির কর্তা দাঁড়িয়েছেন, তাই ও এসেছিল। যেচে আলাপ করতে গেলাম, আমাকে মোটে চিনতেই পারল না। আশ্চর্য, মানুষ কি রকম বদলে যায়।'

উমাও বদলে গেল। অতি বদ মেজাজী, অতি ঝগড়াটে যে উমাকে আমি চিনি এ যেন সে উমা নয়। চোখে মুখে সর্বাঙ্গে এখন তার কোথাও এতটুকু ঝাঁজ নেই। একেবারে অন্য মানুষ, ছোটবেলার বান্ধবী চিনতে পারল না এই দুঃখে কেঁদেই বা ফেলে বুঝি।

খুবই অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। ও যে অমন নরম মানুষ তা জানতাম না। ঠিক করে ফেললাম ওর সঙ্গে আর কোনও কারণেই ঝগড়া করব না। ওকে চাঙ্গা করে তোলার জন্যে বললাম—'চল না একদিন আমিও দেখা করে আসি। চিনতে না পারল তো বয়েই গেল। চেষ্টা করে দেখা যাক যদি জেল খাটা থেকে বাঁচানো যায়। এক সময় ও তোমার বন্ধু ছিল। শুধু তোমার কেন আমারও বন্ধু ছিল বলা যায়। বন্ধু বলে মনে করতো বলেই তো এসেছিল আমার কাছে।'

'যাবে?' মিনিট খানেক উমা দম আটকে চোখ দুটোকে বিস্ফারিত করে তাকিয়ে রইল আমার পানে। তারপর একদম উঠে দাঁড়াল। এক পা এগিয়ে এসে বলল -'সত্যি যাবে! একটু পরেই উনি আসবেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। আদালত থেকে এখানে আসতে বলেছি। তাহলে তৈরী হয়ে নাও, আমাদের সঙ্গে চল। উনি জানেন কোথায় সে থাকে।'

তৈরী হলাম। আদালত থেকে উমার উনি সোজা এখানে আসছেন। চা জলখাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। বিমলবাবু আবার রসের মিষ্টি ভালবাসেন।

সর্বাগ্রে জানতে চাইলেন বিমলবাবু, 'কি হল? চুপচাপ যে? আপনারা ঝগড়া করছেন না?'

'ঝগড়া করতে করতে হয়রান হয়ে গিয়ে এখন আমরা বিশ্রাম করছি। শুনেছি আপনাদের আদালতেও তুপুরবেলা আধ ঘণ্টা ছুটি হয়। এখন আমাদের টিফিনের সময়। চা টা খেয়ে আবার কাজ আরম্ভ করব।'

'তাহলে ঠিক সময় এসে পড়েছি বলুন। একটু তাড়াতাড়িই আজ পালিয়ে এলাম! একটা ছ্যাঁচড়া মোকদ্দমায় ফেঁসে গিয়ে সারাটা দিন আমারও ঝগড়া করতে হয়েছে। কিছুতেই জামিন দেবে না হাকিম, আমিও ছাড়ব না। শেষ পর্যন্ত জামিন হল। পালিয়ে এলাম অন্য কাজকর্ম ফেলে রেখে। এই জাতের মামলায় না দাঁড়ানোই উচিত। একেবারে মার্কামারা মেয়েমানুষ, আদালত শুদ্ধ মানুষ চেনে, বার তিনেক জেলখাটা হয়ে গেছে, ওর পক্ষে দাঁড়িয়ে আমিও না ওর মত বিখ্যাত হয়ে যাই।' বলে আট আনা দামের একটা সাজোয়ান রসগোল্লা তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলেন বিমলবাবু। মুখ বন্ধ হল।

ফাঁক পেয়ে উমা বললে—'আজ বুঝি সেই—কি যেন নাম সেই মহিলাটির?'

রসগোল্লাটাকে গলার ওপারে পাঠিয়ে বিমলবাবু বললেন—'নাম তাঁর একশো ত্রিশটা। এখন যে নামটা সব চেয়ে বেশি চালু সেটা হচ্ছে বেলা ঘোষ। ঘোষ বোস মিত্তির চৌধুরী চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে সেন বাগচী গোটা দশেক পদবী এর আগে নেওয়া হয়ে গেছে। পটাপট বিয়ে করেছেন আর পদবী বদলেছেন। স্বামীরা কেউ পাগল হয়ে গেছে, কেউ প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেছে দেশ ছেড়ে,

একজন আত্মহত্যা করেছে, আর একজন নাকি তিন তলার ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল। এবারের স্বামীটিকে বিষ খাইয়ে মারবার চেষ্টা করেছিলেন। মিষ্টার ঘোষকে আজ কোর্টে দেখলাম, দুগ্ধপোষ্য শিশু বলা যায়। পরিবারের চেয়ে কম-সে-কম পনেরো বছরের ছোট। কি করে যে মহিলাটি ঐরকম কাঁচা ছোকরাগুলোর মস্তিষ্ক চর্বণ করেন!'

'এ মামলাতেও তাঁর জেল হবে নাকি?' যতটা সম্ভব নির্বিকার ভাবটা বজায় রেখে জিজ্ঞাসা করল উমা। বিমলবাবু ততক্ষণে আর একটা রসগোল্লাকে গোল্লায় পাঠাচ্ছেন, জবাব দিলেন না।

'অদ্ভুত চরিত্র বটে', আমি শুরু করলাম—'উকিল হতে পারলে বাজি মাত করতে পারতাম। ঐ সমস্ত চরিত্রদের নিয়ে গল্প উপন্যাস লিখতে পারলে—'

'লিখুন না, কে বারণ করতে যাচ্ছে। ওরকম এন্তার চরিত্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারি আমি।' বলে বিমলবাবু চায়ের কাপটা তুলে নিলেন। আমার সামনেও এক কাপ এগিয়ে দিয়ে উমা বললে—'এই মহিলার সঙ্গে আলাপ কর না কেন। একে নিয়েও তো একখানা বই লেখা যায়।'

বিমলবাবু বললেন—'রাজী থাকেন তো চলুন, পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এক নামজাদা হোটেলে তিনি থাকেন। ঠিকানা আছে আমার কাছে। আমারও দেখা করা দরকার। সাবধান করে দিয়ে আসব, জামিনে যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ যেন সাবধানে থাকেন। মদ গিলে বেলেল্লাপনা করলে জামিন নাকচ হয়ে যাবে।'

যাওয়াই ঠিক হল। উকিলবাবুর পরিবারটিও সঙ্গে চললেন। যাবেন নিশ্চয়ই, অমন সাংঘাতিক জাতের মেয়ে মানুষের কাছে যাচ্ছেন স্বামী, কোন্ সাধ্বী-স্ত্রী জেনে শুনে একলা ছেড়ে দেবে। হলই বা মক্কেল।

মক্কেল শ্রীমতী বেলা ঘোষ আস্তানাতেই ছিলেন। মস্ত বড় হোটেলের তিনতলার এক কোনে একখানি ছোট্ট কামরার সামনে পৌঁছে দিল আমাদের হোটেলের এক বয়। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বিমলবাবু আস্তে আস্তে টোকা দিলেন কপাটের গায়ে। ভেতর থেকে সাড়া মিলল। মিনিট দুয়েক দেরি হল দরজা খুলতে। সেই দু'মিনিটে অন্তত পক্ষে লাখ দুযেক বার নিজেকে নিজে বললাম —ভাল করছ না, এখনও ফের, তোমার একটা মারাত্মক ভুলের জন্যে যে আগুন জ্বলে উঠেছে সেই আগুনের তাপ সইতে পারবে না তুমি, সময় আছে, এখনও ফের।

ফেরা কিন্তু হল না। দম আটকে বন্ধ কপাট দুখানার পানে তাকিয়ে রইলাম। আমার পাশে দাঁড়িয়ে ওরা স্বামী-স্ত্রীতে তখন ফিসফিস করে কি যেন পরামর্শ করছে। সামান্য একটু শব্দ কানে গেল, খোলা হল দরজা, শ্রীমতী বেলা ঘোষ পর্দার আড়াল থেকে ডাক দিলেন—আসুন ভেতরে।' গলার আওয়াজটুকু শুনে ভয়ানক রকম চমকে উঠলাম।

ও কি রকম গলার আওয়াজ। মানুষের গলা থেকেই কি ঐ জাতের আওয়াজ বেরলো!

কেউ যেন তলিয়ে গেছে রসাতলে। বহু দূর থেকে মাটির অনেক নীচে থেকে ঐ ডাকটা দিলে। এক চুল নড়বার সামর্থ্য রইল না। বিমলবাবু দরজা পেরিয়ে গেলেন। উমা আমাকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল—'চল।'

কি যেন বলতে গেলাম ওকে। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরল না। একরকম ঠেলতে ঠেলতেই আমাকে পর্দার ওপাশে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালে উমা। কিছুই নজরে পড়ল না। গাঢ় সবুজ আলো জ্বলছে ঘরে, সবুজ রঙের ঘন কুয়াশায় ঘরটা বোঝাই হয়ে আছে যেন! কানে গেল বিমলবাবুর স্বর। কি বলছেন ধরতে পারলাম না।

আবার সেই রসাতলের ডাক শুনতে পেলাম—'আসুন আসুন,

পরম সৌভাগ্য যে আমার ঘরে আপনার মত মানুষের পায়ের ধূলো পড়ল! উকিলবাবুর স্ত্রীটি যখন সঙ্গে রয়েছেন তখন ভয় পাবার কিছু নেই।'

সাদা আলো জ্বলে উঠল, সবুজ আলো নিভল, চক্ষুলজ্জার বালাই আর রইল না। উলঙ্গ সত্যের দিকে একটিবার তাকিয়ে পাশের চেয়ারখানায় বসে পড়লাম।

চড়া সুরে উমা জিজ্ঞাসা করলে—'উকিলবাবুর স্ত্রী সঙ্গে না থাকলে ভয় পাবার কি ছিল? আমরা কি বাঘ সিংহীর-খাঁচায় ঢুকেছি নাকি? তাই যদি হয়, আমি সঙ্গে থেকেই বা এদের বাঁচাব কেমন করে?'

তৎক্ষণাৎ জবাব মিলল—'বাঘ সিংহীর চেয়ে ঢের সাংঘাতিক জীবের খাঁচা এটা। এখান থেকে ফিরে যাবার সময় যে বিষ উনি নিয়ে যেতেন, সেটা আর এখন ওর গায়ে লাগবে না। যেতে দিন ও সব কথা, এসেই যখন পড়েছেন, বসুন। সন্ধ্যেটা আজ গল্প করে কাটবে। কফি আনতে বলি।'

বিমলবাবু বললেন, 'কফি নয় চা, কফি এরা বানাতে জানে না। দুধ চিনির শ্রাদ্ধ করে খানিকটা গরম জল নিয়ে আসবে। মাদ্রাজীদের দোকান ছাড়া কফি কোথাও পাওয়া যায় না। কখনও মাদ্রাজী কফিখানায় কফি খেয়েছেন আপনি?'

'অনেক খেয়েছি, বছর দুয়েক মাদ্রাজে ছিলাম। আচ্ছা, চা দিতেই বলছি।' কলিং বেল টিপলেন বেলা ঘোষ। আধ মিনিটের মধ্যে দরজায় টোকা পড়ল। উঠে গিয়ে দরজা খুলে ফিস ফিস করে কি বলে এলেন উনি। শুধু চা দিতে বললেন না, চায়ের সঙ্গে আরও অনেক কিছু বলে এলেন নিশ্চয়। শুধু চা দেবার কথা বলতে অতটা সময় লাগে না।

উমা আমার পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। থমথম করছে ওর মুখ, খুব সম্ভব ভাবছে ওখানে যাওয়াটা অন্যায় হয়ে গেছে। বিমল-

বাবু একটা চুরুট ধরিয়ে টানতে লাগলেন। বিকট গন্ধে ঘরখানা বোঝাই হয়ে গেল। শ্রীমতী ঘোষ বসলেন খানিক তফাতে, তাঁর বিছানায়। একটা কিছু বলা নিশ্চয়ই উচিত আমার। গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করলাম—'আপনার জীবন সত্যিই খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ। জীবনকে নানা দিক থেকে দেখেছেন আপনি। বিমলবাবুর কাছে সামান্য একটু শুনে লোভ সামলাতে পারলাম না। এসে পড়লাম। যদি বিরক্ত না হন মাঝে মাঝে আসব।'

'তাই নাকি!' শ্রীমতী ঘোষ বিচিত্র সুরে হেসে উঠলেন। কতকগুলো মুনিয়া পাখি হঠাৎ ডেকে উঠে থেমে গেল যেন। তারপরই যেন ঘুমিয়ে পড়লেন শ্রীমতী। ঘুমন্ত মানুষ যে ভাবে জড়িয়ে কথা বলে সেই ভাবে বলতে লাগলেন—'লোভ, লোভ আর লোভ, এ পর্যন্ত কত জাতের লোভই যে দেখলাম। লোভ সামলাতে পারলাম না তাই এসে পডলাম। একেবারে যাকে বলে অকপটে কবুল করা, তাই। হ্যাঁ, জীবনকে আমি নানা ভাবে দেখেছি, শুধু দেখেছি কেন—চেখেছি, চুষেছি জীবনকে, চুষতে চুষতে একেবারে ছিবড়ে করে ছেড়েছি। তবু আমার কাছে মানুষ আসে। পিঁপড়ের ডানা গজালে আগুনে এসে ঝাঁপ দেবেই। বিরক্ত আমি কিছুতেই হই না, জেলে যখন থাকি তখনও বিরক্ত হই না। বিরক্ত হব কেন, জেলে যে পিঁপড়েরা আছে তাদেরও ডানা গজায়। কেউ আসেন আমার এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে, কেউ আসেন আমাকে উদ্ধার করতে। সব চেয়ে যাদের বয়েস কম তারা আসে অ্যাডভেঞ্চারের লোভে। যেমন এই বসন্ত। অ্যাডভেঞ্চার চাই অ্যাডভেঞ্চার চাই, হরদম ঐ ঘ্যানঘ্যানানি শুনতে শুনতে একদিন দুটো গেলাসে খানিকটা করে ভিনিগার ঢেলে তাতে মিশিয়ে দিলাম লবঙ্গর নির্যাস। বললাম, চরম অ্যাডভেঞ্চার আমি করতে যাচ্ছি, যদি ইচ্ছে হয় এস আমার সঙ্গে। এ জীবনে আর এক বিন্দু অ্যাডভেঞ্চারের রস নেই, মরণের পরে যে জীবন সেই জীবনে কি

অ্যাডভেঞ্চার মেলে দেখব। বলতে বলতে একটা গেলাস তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে গিলে ফেললাম। উৎকট ঝাল ঐ লবঙ্গর নির্যাস, মুখ দিয়ে লাল পড়তে লাগল, চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। কোনও রকমে কাঠ হয়ে পড়ে রইলাম। চোখ মেলে আছি, দেখতে পাচ্ছি সব। খানিকক্ষণ জড়ভরতের মত বসে রইল বসন্ত। তারপর চোরের মত চুপি চুপি উঠে নিঃশব্দে জামা কাপড় পরে পালিয়ে গেল। তখন উঠলাম, গেলাস দুটো সরিয়ে রেখে লেবুর রস দিয়ে বার কতক কুলকুচো করে ফেললাম। মুখের জ্বালা জুড়োল। ঘণ্টা খানেক পরেই যাঁরা আসবার তারা উপস্থিত। মরিনি দেখে সবাই তাজ্জব বনে গেলেন। বসন্তর বাবা পনরো বছর জেলরের চাকরি করেছেন। উদ্দেশ্যটা তিনি বুঝতে পারলেন আমার। নিজে মরিনি কারণ সত্যিকারের বিষটা নিজে খাইনি, তাঁর পুত্রটিকে কিন্তু আসল বিষ খাইয়ে সাবাড় করতে চেয়েছিলাম। অতএব শুরু হল আবার অ্যাডভেঞ্চার, রাত পোহাবার আগেই হাজতে ঢুকতে হল। সাংঘাতিক অপরাধ, বিয়ে করা স্বামীকে বিষ খাওয়াতে গিয়েছিলাম।'

দরজায় টোকা পড়ল, চা এসেছে, শ্রীমতী ঘোষ উঠে গেলেন।

চুরুটটা নিভে গিয়েছিল, বিমলবাবু সেটাকে ধরাতে ধরাতে বললেন—'বিসমিল্লায় গলদ! এসব ব্যাপার তো জানতাম না।'

উমা বললে—'চল এখন, আর শুনে কাজ নেই।'

আমি বললাম—'যাও তোমরা, আমি পরে যাচ্ছি।'

'তার মানে?' চোখ পাকিয়ে উমা তেড়ে উঠল—'আর বসতে হবে না এখানে, যথেষ্ট হয়েছে।'

শ্রীমতী ঘোষ চায়ের ট্রে নিয়ে ফিরে এলেন। লক্ষ্য করলাম, জড়তা তাঁর কেটে গেছে। উমার কথাগুলো কানে গিয়েছিল। ট্রে নামিয়ে বললেন—'মোটেই যথেষ্ট হয়নি। নিন, মুখ ধুয়ে আসবেন চলুন। পান জর্দায় মুখ বোঝাই হয়ে আছে। মুখ ধুয়ে একটু চা

খেয়ে নিন। এসে যখন পড়েছেন তখন সহজে ছাড়ছি না। আপনার ঐ পোষা লেখকটির সঙ্গে আমার কিছু বোঝাপড়া করার আছে। আগে চা খাওয়া হোক তারপর বলব। আর হয়তো ওঁর সঙ্গে দেখাই হবে না কখনও, ক'বছরের জন্যে আবার জেলে যাচ্ছি কে জানে!

'খুব সম্ভব' বিমলবাবু বেশ ধীরে সুস্থে গুছিয়ে বলতে লাগলেন —'খুব সম্ভব এবার আপনার জেল খাটার সাধটি পূর্ণ হচ্ছে না। বিমল উকিলকে লোকে চিনে জোঁক বলে। আমার পাল্লায় পড়েছেন যখন তখন সহজে ছাড়ছি না। মক্কেল যদি জেলেই ঢুকে বসে থাকে তাহলে দু-পয়সা কামাব কেমন করে।'

'কিন্তু মামলা তো লড়ব না আমি!' শ্রীমতী ঘোষ বেশ আশ্চয হয়ে গেলেন যেন। আমাদের প্রত্যেকেব মুখ পানে তাকিয়ে কি যেন বোঝবার চেষ্টা করলেন। তারপর উমাকে তাড়া দিলেন— 'আসুন আমার সঙ্গে, ঐ ওধাবে মুখ ধোবাব জায়গা। মুখ ধুয়ে এসে চা খান। চা খেতে খেতে কথাবার্তা হবে। ভারী গোলমাল হয়ে গেছে তো! বিমলবাবু মনে করেছেন আমি মামলা লড়ব। না না, সে সব কিছু নয়, আমাব দরকার আর কিছু দিন জামিনে খালাস থাকা। জরুরী কাজ আছে কিছু, সেগুলো শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে জেলে গিয়ে ঢুকব।'

'না' উমা তাঁব নিজস্ব স্টাইলে ঝাঁজিয়ে উঠল—'আবাব জেলে ঢুকতে হবে না। ও সমস্ত চলবে না আর। কেন—আমরা কি মবে গেছি নাকি? যা খুশি তাই করবেন উনি। দেখি এবার কি করে নিশ্চিন্ত হয়ে জেলে ঢুকে বসে থাকাটা ঘটে।'

প্রায় আধ মিনিট কেউ আমরা নড়তে পারলাম না। সর্বপ্রথম কথা বললেন বিমলবাবু। চুরুটটাকে মেঝেয় ফেলে জুতো দিয়ে চাপতে চাপতে বললেন—'ব্যাস চুকে গেল। যাও এখন, মুখ ধোবে তো, ধুযে এস। চা ঠাণ্ডা করে লাভ কি। মামলা হল মামলা,

আমার মক্কেল নির্দোষ বলে আমি জামিন নিয়েছি, শেষ পর্যন্ত লড়তেই হবে। আগে বলেননি কেন এ সব কথা? এই রকম মতলব আপনার জানলে দাঁড়াতাম না আমি। মক্কেলের মর্জি মাফিক চলতে হবে নাকি?'

শ্রীমতী ঘোষ জবাব দিলেন না। উমার একখানা হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন বিছানার ওধারে। ঘরের সঙ্গেই লাগোয়া বাথরুম আছে।

অতঃপর চা-পর্ব নির্বিঘ্নে সমাধা হল। গরম শিঙাড়া আর সন্দেশ পেট ভরে গিলতে হল চায়ের সঙ্গে। পাছে আবার জেল-ফেলের কথা উঠে পড়ে সে জন্যে আমরা সাবধান হলাম। শ্রীমতী ঘোষ কিছুই মুখে দিলেন না। কেন দিলেন না তা একটু পরেই বোঝা গেল। আর একবার দরজায় টোকা পড়ল, উনি উঠে গেলেন। ফিরে এলেন আরও খানিক জেল্লাদার হয়ে। মুখে চোখে রঙের ছোপ এসে গেছে। অল্প একটু বিজাতীয় গন্ধ পাওয়া গেল। উমা ধরতে পারল না। অষ্টপ্রহর পান জর্দা চিবলে সহজে অন্য জাতের গন্ধ নাকে যায় না। ব্যাপারটা ধরতে পারলেন বিমল-বাবু, কিন্তু সাবধান করতে গেলেন না। বোধহয় বুঝতে পেরেছেন তখন যে মক্কেলটি মদ গিলে বেলেল্লাপনা করার পাত্রী নন।

কৌটো খুলে উমা পান বার করল। শ্রীমতী ঘোষ হাত পাতলেন—'দিন একটা যদি বেশি থাকে। কত দিন পান মুখে দিইনি। আগে খুব পান খেতাম। একটা বিশ্রী ব্যাপারের জন্যে পান ছাড়তে হল।'

'বিশ্রী ব্যাপার আবার কি? পান খেলে কি কেউ বেহেড হয়?' বলতে বলতে উমা দু'খিলি পান দিল। পান মুখে দিয়ে চোখ বুজে চিবতে শুরু করলেন শ্রীমতী। চিবতে চিবতে গল্প শুরু করলেন—'এই পানের জন্যেই বছর দেড়েক সাজা হয় প্রথম বার। মাথার বালিশের তোয়ালেতে পানের পিক্ পড়েছিল। আমার থুতু নিয়ে

কি ভাবে যে মিলিয়ে দেখলে বুঝতে পারলাম না। প্রমাণ হল যে সেই রাত্রে আমি মতিলাল লাখোটিয়াব বিছানায় শুয়েছিলাম। তারপর অবশ্য সবই স্বীকার কবতে হল আমায়। টাকা গহনা কিছুই ফেরত পেল না মতিলাল। পাবে কি করে, আমার পতি দেবতাটি ততক্ষণে সর্বস্ব নিয়ে হাওয়াই জাহাজে চড়ে হাওয়া হয়ে গিয়েছেন। মাঝখান থেকে আমি দেড় বছর খেটে মলুম।'

বিমলবাবু বললেন—'দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনার সম্বন্ধে ওবা যা কিছু দাখিল করেছে কোর্টে সব আমি দেখেছি। কি যেন নাম সেই ভদ্রলোকের! গুণেন চ্যাটার্জী বোধহয়। আব একটা কেসে ফেঁসে গিয়ে বোম্বেতে ধরা পড়েন ভদ্রলোক। বছব খানেক বোধহয় জেল হয়েছিল। জেল থেকে বেবিয়ে পাগল হয়ে যান। একথাও লেখা আছে যে পাগল হবার আগে তিনি আপনাব সঙ্গে দেখা করে-ছিলেন। হঠাৎ পাগলই বা হলেন কেন?'

শ্রীমতী ঘোষ চিবনো বন্ধ কবে চোখ মেললেন। চোখ দুটো আরও লাল হয়ে উঠেছে। রক্তবর্ণ দৃষ্টিতে বিমলবাবুব পানে তাকিয়ে গাঢ় স্বরে বললেন—'গুণেন চাটুয্যে লোকটা ভাল লোক ছিল। বিয়ের আগে আমাকে ধাপ্পা দেয়নি। বলেছিল খাঁটি কথা, এক পয়সা নেই কোথাও, পয়সা রোজগাব করে, ওড়ায়। খুব ভাল কথা, দুজনে রোজগার করব, ওড়াব। বোহিনী চৌধুবীর ঘব করছি তখন, লোকটা ছিল হাড় কিপটে। তেলকল-ওয়ালা যেমন হয় তেমনি। সরষে টিপে তেল বার করে ভেজাল দিয়ে বড়মানুষ হয়েছিল। খুব খাও, খুব পর কিন্তু দরজার বাইবে পা বাড়াতে পাবে না। শাসনের ঠেলায় দম বন্ধ হয়ে মরছি তখন। চৌধুরীর এক ভাগ্নেকে হাঁতের মুঠোয় পেয়ে গেলাম। মামা যখন থাকত না তখন সে মামীর সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতে আসত। ভাগ্নেটিকে নিয়ে সরে পড়লাম। মামা ব্যভিচারের মামলা করলেন। আবার বিবাহ বিচ্ছেদ, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বছর খানেক পরে গুণেন চাটুজ্যের সঙ্গে বিয়ে

হল। ভালই চলল কিছুদিন, নানারকম মতলব করি দু'জনে, যা রোজগার হয় ফুর্তিসে ওড়াই। হঠাৎ ওর মাথায় খেয়াল চাপল রাতারাতি বড় মানুষ হবার, একটা মন্ত্রী বা ঐ জাতের কিছু হয়ে সমাজের মাথায় উঠে যাবে। টাকা চাই, বিস্তর টাকা চাই এক সঙ্গে, যাতে জীবনে আর ছ্যাঁচরামি না করতে হয়। মতিলাল লাখোটিয়া তখন আমার জালে পড়েছে। যা দিচ্ছিল লাখোটিয়া তাতে বেশ চলছিল দু'জনের। ঐ রাতারাতি বড় মানুষ হবার জন্যে এক রাত্রে লাখোটিয়ার ঘর থেকে সব সরিয়ে ফেললাম। কি করব, স্বামীর আদেশ।'

হঠাৎ আবার সেই বিচিত্র ধরনের হাসি, এক ঝাঁক মুনিয়া পাখি হঠাৎ ডেকে উঠে থেমে গেল যেন। হাসি থামবার পরে আবার সেই ঘুমিয়ে পড়া। ঘুমিয়ে পড়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগলেন—'হ্যাঁ, সে দেখা করে'ছিল আমার সঙ্গে। তার নাকি ভয়ানক অনুতাপ হয়েছিল আমার মত সতী-সাধ্বী স্ত্রীকে ঠকাবার দরুণ। আমি একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। মতিলাল লাখোটিয়ার হাতে তুলে দিয়েছিলাম তাকে। ওরা ওষুধ গিলিয়ে বেহুঁশ করে রাজস্থানে নিয়ে গিয়েছিল গুণেন চাটুয্যেকে। সেখান থেকে যখন ফিরে এল তখন একদম পাগল হয়ে গেছে। প্রায়শ্চিত্তটা ষোল আনা সুসম্পূর্ণ হয়েছে।'

শ্রীমতী ঘোষ ঢলে পড়লেন বিছানায়। ছুটে গেল উমা, শ্রীমতীকে ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে বলে উঠল—'জয়া এই জয়া, শুনছিস? কি হল তোর?'

বিমলবাবু ততক্ষণে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। ব্যাপারটা তিনি বুঝতেই পারছেন না, কি একটা বলতে গিয়ে হাঁ করে আছেন। ডাক দিলাম আমি উমাকে—'কিছুই হয়নি ওঁর। ঐ কলিং বেলটা টেপ। হোটেলের লোক আসবে। তাকে একটু ওষুধ আনতে বলব। খাওয়ালেই উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

তাই হল, হোটেলের লোকটি আসতে তাকে বলে দিলাম মেমসাহেব যা খাচ্ছেন তাই একটু আনবার জন্যে। তিন মিনিটের মধ্যে একটা গ্লাসে ছটাক খানেক তরল পদার্থ নিয়ে এল সে। বাকী কাজটা আমাকেই করতে হল। টেনে তুলে বসালাম, গেলাসটা ঠোঁটের ফাঁকে লাগিয়ে অল্প একটু ঢেলে দিলাম। ঘুম ভাঙতে লাগল। আস্তে আস্তে সবটুকু গিলে চোখ মেলে তাকালেন শ্রীমতী ঘোষ। তাকিয়ে একটু হকচকিয়ে গেলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম—'এই রকম নেশা করেন, জেলে থাকেন কি করে? সেখানে এ সমস্ত জোটে কি ভাবে?'

ঘাড় নেড়ে জবাব দিলেন—'মোটেই জোটে না। তা ছাড়া নেশা তো করি না আমি, কোথায় পাব যে খাব। বসন্তর এক বন্ধু আছে ম্যারীন্ এন্‌জিনীয়ার। সে এনে দিয়েছে একটা বোতল পোলাণ্ডের ভোদকা। আজ খাচ্ছি একটু একটু। ভয়ঙ্কর জিনিস, চড়াক করে মাথায় উঠে যায়।'

বিমলবাবু বললেন—'আবার তো সেই জিনিসই খেলেন, খেয়ে সুস্থ হয়ে উঠলেন, বেশি খেলে শেষ পর্যন্ত আর সেন্স ফিরবে না।'

'তা নয়, এ জিনিসের একদম উল্টো ফল। পেগ চারেক পেটে পুরতে পারলে আগুন জ্বলে ওঠে শরীরের মধ্যে। নেশা তো হয়ই না, দিন চার পাঁচ একদম না ঘুমিয়ে কাটে।' বলে শ্রীমতী ঘোষ উঠে পড়লেন। উমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'ঘুমিয়ে পড়িনি আমি, কি রকম একটা আচ্ছন্ন ভাব, সবই শুনছি বুঝতে পারছি, কিন্তু নড়তে পারছি না, চোখ মেলতে পারছি না, কথা বলতে পারছি না। যেন স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্নে শুনলাম কে আমাকে জয়া বলে ডাকল। জয়া অনেকদিন আগে নিরুদ্দেশ হোয়ে গেছে। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞাসা কর ঐ লেখক মশাইকে। জয়াকে জাহ্নবী বানিয়ে উনি নিরুদ্দেশে পাঠিয়ে ছেড়েছেন। আপদের শান্তি হোয়ে গেছে।'

ঠোঁট দুখানি নড়তে লাগল উমার, কথা বলতে পারল না। দুটি চোখ জলে ভরে উঠল।

হঠাৎ জয়া থুড়ি শ্রীমতী বেলা ঘোষ ব্যস্ত হোয়ে উঠলেন—'কটা বাজল ?'

বিমলবাবু ঘড়ি দেখে বললেন—'আটটা বেজে গেছে। আচ্ছা, আবার দেখা হবে। সাবধানে থাকুন। জামিনে আছেন তো। ছুতো পেলেই জামিন নাকচ করে দেবে! তবে মামলা আমরা লড়বই। ঐ বসন্ত ঘোষকে বিষ খাইয়ে মারবার বদনামটা নিয়ে এবার আপনি ঝুটমুট জেলে যেতে পারবেন না।'

ঝগড়া মিটে গেল। প্রমাণ করে ছাড়লে উমা যে সত্যিই আমি একটা লেখাও ভাল করে শেষ করতে পারি নি। জাহ্নবীকে নিরুদ্দেশে পাঠিয়ে আমি ফাঁকি দিয়েছিলাম। ফাঁকিটা আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সে।

ইটওয়ালার সঙ্গে লেখকের তফাতটা কোথায় স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। ইটওয়ালা জানে যে তার ইট দিয়ে ইমারত খাড়া হয়ে গেছে। সেই ইমারতটা মন্দির না মসজিদ না গির্জা তা নিয়ে তার মাথা ঘামাবার দরকার কি! কোন পাঁজার ইট দিয়ে কসাইখানা বানানো হল, কোন পাঁজার ইট দিয়ে বেশ্যালয় তৈরী হল, তাতে ইটওয়ালার কি আসে যায়।

লেখকের বরাত খারাপ। যে চরিত্রটিকে আদর্শ ব্রহ্মচারী বানিয়ে গল্প শেষ করলাম ভবিষ্যতে সে হয়তো ধরাধরি করে এক-খানি রেশনের দোকানের লাইসেন্স বাগিয়ে ধর্মপথে থেকে চাল-গমে পবিত্র পাথরকুচি মিশিয়ে গুছিয়ে নিতে লাগল। যাকে বানালাম দারুণ কড়া মেজাজের অধিকারী এক দারোগা, চাকরি করতে করতে সৎপথে থেকে যৎসামান্য কিছু উপার্জন করে, সেই চরিত্র, লাখ পাঁচেক টাকা খরচা করে খুলে দিলে এক অনাথা বিধবাদের আশ্রম। একুশ

বছর বয়সে বিধবা হয়ে যে মেয়ে সাতচল্লিশ বছর পর্যন্ত থান পরলেন নিরামিষ খেলেন একাদশীতে জল পর্যন্ত মুখে দিলেন না তাঁকে নিয়ে গল্প শুরু করেও নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। যেখানে শেষ করলাম গল্প সেখান থেকেই আবার শুরু করে দিলেন তিনি। দশ বছর পরে আর চেনবার উপায় নেই। ভোটে লড়ে উপমন্ত্রী হয়ে গেলেন, ফলে ভি. আই. পি. মহারাজদের সঙ্গে আস্ত আস্ত মুরগী সহযোগে ডিনার খেতে খেতে বেহুদা মোটা হয়ে বসলেন।

কথাটা হচ্ছে, লেখকের কারবার মানুষ নিয়ে, ইট নিয়ে নয়। বালি সিমেণ্ট দিয়ে ইট গেঁথে ফেলা যায়, মানুষ গাঁথবার মশলা আজও আবিষ্কৃত হয়নি। চলমান জীবন, কবি ভাবী মজার গান গেয়েছেন, এ কূল ভাঙে ওকূল গড়ে এই তো নদীর খেলা। জীবন নদীতে বাঁধ দেবে! হরদম তাব এ কূল ভাঙছে ও কূল গড়ে উঠছে।

ঝগড়াটে উমা আবাব যেদিন এল আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে সেদিন ওকে জীবন সম্বন্ধে দুটো দামী কথা বলতে গেলাম—'ব্যাপারটা কি জান, তুমি আমি তোমার আমার মত অনেক মানুষ খুঁটি আঁকড়ে ধবে বেঁচে আছে, জীবন-নদীব উত্তাল তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছে না। কিন্তু ওবা মানে ঐ জয়ারা থেমে থাকতে জানে না, ওরা ভেসে চলেছে। বহু গ্রাম বহু নগর বিস্তর আকাশ ওবা দেখবে। তাবপর একদিন সাগরে গিয়ে পড়বে। সত্যিকারের কথাটা হচ্ছে, ওদেব জন্মই সার্থক। আমাদের মত একটা খুঁটিতে বেঁধে গিয়ে ওরা পচে মরছে না। চোখের জল যদি খবচা করতে হয় আমাদেব মত অভাগা-অভাগীদের জন্যে করা উচিৎ। ওদের জন্যে চোখের জল ফেললে সেটা না হোক বাজে খবচা হবে।'

গম্ভীর ভাবে উমা বলল—'ঐ কথাটা জয়াও বললে। কোর্টে গিয়েছিলাম, আজ ওর মামলার রায় বেরল। তিনদিন ধরে মাথা কুটেছি পায়ে, তবে রাজী হয়েছেন উনি। নামজাদা উকিলের স্ত্রী

আমি, একটা খুনে মেয়েমানুষের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি আদালতে, স্বামীর মান-সম্ভ্রম জাহান্নমে যাবে। শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন। জয়ার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ সবই বলতে হল। রায় দেবার আগে জজসাহেব দেখা করতে দিলেন। একটি কথাও হল না, জয়া শুধু ঐ কথাটাই বললে—আমার জন্যে চোখের জল ফেলিস নে ভাই, আমি বেঁচে গেলাম, বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাতে পারব।'

'বাকি জীবনটা!' আঁতকে উঠলাম আমি—'বাকি জীবনটা মানে কি?'

'যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল কি না। মরবার আগে সেই ব্যবস্থাই করে গেছেন ওর সেই বাচ্চা স্বামীটি। ঘুমোচ্ছিল বেচারা হাঁ করে, জয়া তার মুখের মধ্যে অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছিল।'

'কি বললে! কোথায় পেল আবার তাকে জয়া?'

'লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি জয়ার কাছে আসতেন। ওধারে জেলর বাপ-ছেলেকে বিষ খাইয়ে মারতে চেষ্টা করার দরুণ মামলা জুড়েছেন। সেই যে বলেছিল জয়া, কয়েকটা জরুরী কাজ আছে তার, তাই সে জামিনে খালাস থাকতে চায়। সেই জরুরী কাজটা হোল ঐ। স্বামীটিকে পাশে শুইয়ে ঘুম পাড়ানো। তারপর তার মুখে অ্যাসিড ঢেলে দেওয়া। কাজটি শেষ করে খুব খুশী হয়ে জেলে গিয়ে ঢুকে পড়ল। বাকী জীবনটা শান্তিতে কাটাবে।'

'সেই ছোকরাটা কি ভূতের বাচ্চা নাকি? কেন সে লুকিয়ে লুকিয়ে যেত জয়ার কাছে?'

উমা জয়ার কথাটাই আবার আওড়াল—'পিঁপড়ের ডানা গজালে আগুনে এসে ঝাঁপ দেবেই।'

গল্পটা কি শেষ হল!

খুবই ইচ্ছে হল জিজ্ঞাসা করতে উমাকে, গল্পটা তার মনের মত হয়ে শেষ হল কিনা। খুবই অন্যায় করেছিলাম আমি জাহ্নবীকে

নিরুদ্দেশে পাঠিয়ে। উমা বলেছিল, লেখক হলে যে মানুষ নিজেকেই সব চেয়ে বেশী ঠকায়—এটা সে জানত না।

হ্যাঁ, ঠকিয়েছিলাম বইকি নিজেকে। আমার মনগড়া চরিত্র ছিল জাহ্নবী, জয়া তো মনগড়া চরিত্র নয়। জয়া রক্তে-মাংসে-গড়া আস্ত একটি নারী, যে নারী তার নারীত্বের সঙ্গে চরম দুশমনি করলে।

কেন করলে ?

এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে।

দুনিয়াটা লেখকের মর্জি মাফিক ঘুরপাক খাচ্ছে না। অন্তরীক্ষে বসে এক ছ্যাবলা বেদিয়া দুনিয়া সুদ্ধ সুগ্রীবের বংশধরদের কোমরে দড়ি খিঁচে নাচাচ্ছে। নাচাতে নাচাতে মারলে এক হেঁচকা টান, খেল খতম হয়ে গেল। লেখকের কাজও শেষ, রক্তে-মাংসে গড়া জীবদের নিয়ে লেখকের কারবার নয়। বাঁশ খড় দড়ি দিয়ে প্রতিমার কাঠামো বানিয়ে তার ওপর মাটি চাপিয়ে যে রূপ গড়ে তোলে কুম্ভকার সেই রূপটি জন্মায় তার মন থেকে। বাঁশ দড়ি খড়ের কাঠামো আর রক্তে-মাংসে-গড়া জীব দুইই সমান। লেখক রক্তে-মাংসে-গড়া কাঠামোর গায়ে যা চাপিয়ে রঙ ফলায় সেই জিনিসটিও তার মনের মধ্যে জন্মায়। ইচ্ছে হয়, বল তাকে মনের মাটি, ঠাণ্ডা নরম মাটি, ঐ মাটিকেই বোধ হয় বিজ্ঞ জনে মনের মাধুরী বলে থাকে।

জয়ার দরকার পড়েছিল প্রতিশোধ নেবার। নিজের নারীত্বের ওপর প্রতিশোধ নিলে সে।

কেন ?

মাস ছ'য়েক পরে কেন-র জবাবটি পেয়ে গেল উমা। চিঠিখানা হাতে করে স্বামী সহ আমার কাছে এল। জেল থেকে তার প্রাণের বান্ধবী জয়া চিঠিখানি তাকে লিখেছে। মাত্র পাঁচটি লাইন, যার প্রথম কথা হোল, লেখককে বিশ্বাস করবি না। লোকটা আস্ত ফাঁকিবাজ, জীবনকে পাশ কাটিয়ে বাঁচতে চায়। বীরেশ্বর তাকে

ঠকাতে পারেনি, ঠকিয়েছে ঐ লেখক। তখন অবশ্য লোকটা লেখক হয়নি, সিনেমার টিকিট বেচত। কিন্তু ভবিষ্যতে যে লেখক হবে তাই ফাঁকি দেওয়া কর্মটি তার ধাতস্থ ছিল। তাই সে জীবনকে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে বাঁচল। লেখককে কিছুতেই বিশ্বাস করবি না, জয়ার চিঠির শেষ কথাটাও ঐ।

বিমলবাবু জানতে চাইলেন কি হয়েছিল।

জবাব দিতে পারলাম না।

'গান শোনার নেশা আছে?' জিজ্ঞাসা করলেন বিমলবাবু।

মাথা নাড়লাম, অর্থাৎ নেই।

'চলুন আমার সঙ্গে আপনাকে ভাল গান শুনিয়ে আনিগে। টপ্পা শুনবেন, ঠুংরি শুনবেন, টপ্পা ঠুংরি শুনে মেজাজ শরিফ করে ফিরে আসবেন।'

'হঠাৎ টপ্পা ঠুংরি শুনতে যাব কেন?'

'ঐ চালেই তো আপনারা মানে লেখকরা চলেন। হালকা চালের গান টপ্পা ঠুংরি, তাই বলছিলাম—'

উমা এক ধমক দিয়ে স্বামীকে থামাল—'চুপ কর তো, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে হবে না।'

খেই হারিয়ে গেল।

জয়াকে আর খুঁজে পাবার উপায় নেই, জাহ্নবীকেও নয়। খেই হারিয়ে গেল।

এই ভাবেই আমার সব গল্পের খেই হারিয়ে যায়। লেখক জীবনের ঐ খেই হারানোই হচ্ছে সব থেকে মারাত্মক বিড়ম্বনা।

রাত এখন অনেক। ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখের পাতা। পাশের বাড়িতে একটি বউ চাপা গলায় গাইছে—

স্বপন না ভাঙে যদি শিয়রে জাগিয়া রব।
গোপন কথাটি মম নয়ন সলিলে কব॥

হিমানী আর সিধু ক্ষেত্র চাটুজ্যের পাল্লায় পড়ল কেমন করে! জেনে আমার লাভটা কি হবে!

ধ্রুবজ্যোতি সারকে মনে পড়ছে, বারবার সাবধান করে দিতেন, খবরদার গোঁজামিল দিসনে, গোঁজামিল দেবার চেষ্টা করেছিস কি মরেছিস। হিসেব মিললেও প্রবলেম সল্‌ভ হবে না।

গোঁজামিল দিতে নিষেধ করেছিল আর একজনও। সে সান্নুদি। শ্রীকুন্দন কিষণজীর স্ত্রীর ওজন একশ' পঞ্চাশ কিলো আর সান্নুদির ওজন ছিল মোটে চল্লিশ। দুটোকে মেলাতে গেলে একটা বড় রকমের গোঁজামিল দিতে হয়। অতোটা গোঁজামিল কি দেওয়া সম্ভব!

নিশিকান্তদা খুনী না নিজেই খুন হয়েছেন! যদি খুন না হয়ে থাকেন তবে বিলিতি খবরের কাগজে যে খবরটা বেরিয়েছিল তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে নাকি তার! ব্যারিষ্টার মিসেস মিত্র তার যোগীগুরুর পায়ের কাছে বসে আছেন এমন একটা ছোট ছবিও ছাপা হয়েছিল কাগজে। তাহলে সেই ছবিটাকে আমি ঠিক চিনে উঠতে পারলাম না কেন?

চিনু লাহিড়ী তার আত্মজীবনী লেখাবার জন্য আমারই কাছে এল কেন? আর এলোই যদি তাহলে শেষ পর্যন্ত ঝিঁঝির কি হল সেটুকু চাপা দেবার চেষ্টা করল কেন?

অনিমার অনুরোধে বজ্রজ্যোতিকে একটা কবচ দিতে রাজী হয়েছিলাম। সে কবচ আর দেওয়া হল না।

নায়ক মান্না আর হিমানী ওদের বিবাহ-বার্ষিকীতে নেমতন্ন করেছে আমাকে। বক্তৃতা দিতে হবে। বক্তৃতাটা গুছিয়ে লিখে নিয়ে গেলে কেমন হয়!

ঘুমের আবেশে আবার গানে মন দিলাম। বউটি গাইছে—

যদি আনমনে চলে যাও মোর গান নাহি গাও

বেদনা লুকায়ে রাখি রচিব দীপালি নব॥

ফুল হয়ে ছিনু যবে নিলে না চয়ন করি-
ও চরণ পাব বলে মলিন হইয়া ঝরি ॥

ঠিক। লুকিয়ে রাখতে হবে বেদনা। লুকিয়ে রাখতে না পারলে বেদনার মাধুর্যটুকু নষ্ট হয়ে যাবে।

মলিন হয়ে ঝরে যাচ্ছে ফুল, অভিমানে মলিন হয়ে ঝরে পড়ছে! কেউ চয়ন করে নিচ্ছে না বলে তার অভিমান।

ঝরে পড়ছে কিন্তু মস্ত বড একটা আশা নিয়ে। সেই আশাটি হল, যে তাকে চয়ন করে নিলে না সে তাকে মাড়িয়ে চলে যাবে। তোফা তোফা—

তোমার আকাশ মাঝে চাঁদ হতে চাহি না যে
শুকতারা আমি আজ— দিগন্তে ঠাঁই লব ॥

স্বপন না ভাঙে যদি---

ঘুমিয়ে পড়লাম।